[একাদশ খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

একাদশ খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
তিনশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0468-9

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 11)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 320.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিচিত্রা

মধুহীন করিনি তো মোরা মনঃ কোকনদে	১১
অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি	১৫
বিচিত্র ছলনাজাল	২৫
রামানন্দ-তর্পণ	২৯
অনাদিদেব! অনন্ত ভব! শতং জীব! সহস্রং জীব!!	৩১
মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগি	৩৪
পল্‌ডি	৩৭
উমেদারি	৩৯
এষাস্য পরমা গতি?	৪৪
গাঁধী-ঘাট	৪৫
হজরত সৈয়দ নিজাম উদ্‌-দীন চিশতি	৪৮
হ য ব র ল	৫২
ঘরে-বাইরে	৬৩

ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য

ঐতিহ্য	৬৭
'৪২—'৪৫	৬৮
একদা যাহার বিজয় সেনানী	৭২
জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ	৭৪
অটোপ্রমোশন	৭৬
নট গিলটি	৭৯
অবনীন্দ্রনাথ	৮৩
ভরত-নাট্যম	৮৬
নর্তকী	৮৭
নারীর অধিকার	১০১
ঘরে বাইরে শ্রমিক নীতি	১০৫

www.pathagar.com

আফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক ১০৭
বেলজেন, স্টেটস্‌মেন ১১১
মধ্যপ্রাচ্য ১১৭
মিশর ১২০
যবনিকান্তরালে ১২২
হিটলার মাহাত্ম্য ১২৪
ফ্রাঙ্কেন্‌স্টাইন ১২৭
মার্শাল-মার্গ ১২৯
আরব্য-রজনীর অরুণোদয় ১৩১
মরূদ্যান না মরীচিকা? ১৩৬
দেহলি প্রান্তে ১৩৯
The spirit of Tagore ১৫৩
A letter from India ১৫৬
What is in a name? ১৬০
Love and friendship ১৬৩
A personal experience ১৬৬
The Meeting ১৬৮
Friendship ১৭০

রায় পিথৌরার কলমে ১৭১

অপ্রকাশিত পত্রাবলি ২৪১

সংযোজন— অপ্রকাশিত গল্প
নেড়ে ২৮৩

পরিশিষ্ট
সৈয়দ মুজতবা আলীর বংশপরিচয় ও তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জি ২৮৭

www.pathagar.com

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিচিত্রা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মধুহীন করিনি তো মোরা মনঃ কোকনদে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঁচজনের সামনে কিছু বলতে গেলে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। সমস্যা তখন : কোনটা ছাড়ি, কোনটা বলি? প্রবাদে কয়, বাঁশবনে ডোম কানা। যে বাঁশটা দেখে, আহাম্মুখ ডোম সেইটেই কাটতে চায়। আখেরে আকছারই যা হয়, তাই ঘটে। একটা নিরেস বাঁশ কেটে বাড়ি ফেরে! রবীন্দ্রনাথের বেলা তবু খানিকটে বাঁচাওতা আছে, যে বাঁশই পেশ করিনে কেন, কেউ না কেউ সেটা পড়েছেন। তিনি 'বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের' মতো 'আহাহা বাহাবাহা' রবে সাধু! সাধু! রব ছাড়বেন।

মাইকেল শ্রীমধুসূদনকে নিয়ে সংকট উৎকটতর। আজ কেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই মাইকেল-কাব্য-নাট্য-পত্রাবলি বাবদে ওয়াকিফ্-হাল ছিলেন অল্পজনই, যাঁরা মাইকেল নির্মিত 'মধুচক্র' থেকে 'গৌড়জন যারা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' রসাস্বাদ করতেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাঙলা ক্লাস নেবার সময় কেউ যদি 'বলাকা'র কোনও অপেক্ষাকৃত বিরল শব্দের অর্থ বলতে না পারত তিনি তখন হরহামেশা শাসাতেন, 'দাঁড়া! তোদের তা হলে "মেঘনাদ" পড়াব, তখন বুঝবি কঠিন শব্দ কাকে বলে!' আমরা আতঙ্কে কুঁকড়ি সুকড়ি মেরে যেতুম।... আর আজ!! তবে একটি আশার বাণী আছে। বছর তিরিশেক পূর্বে মডার্ন কবিরা যখন বাঙলা শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন তখন একাধিক জন সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন যে অনাদৃত শ্রীমধু শতাধিক বৎসর পূর্বে ওই কর্মটি করেছিলেন তাঁর সর্বপ্রতিভা নিয়োগ করে অসীম উৎসাহে। এবং বিশেষ করে শ্রীমধু উল্লাসবোধ করতেন, আলঙ্কারিক— অর্থাৎ যাঁরা কাব্যরস কী, সে রসের উত্তম-অধম বিচার, উত্তম রসসৃষ্টির সময় কোন কোন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এঁদের সেসব আইন লঙ্ঘন করতে পারলে।

মাইকেলের আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহের জাতশত্রু জনৈক মহেশচন্দ্রকে অপদস্থ করার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটুবাক্য সর্বঅস্ত্র ঈশ্বরচন্দ্র এস্তেমাল তো করতেনই, মাঝে মধ্যে অশ্লীলতার গা যে ছুঁয়ে যেতেন না সেকথাও বলা যায় না। ওই সময় গোঁড়ার দল মহেশকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেয়। ঈশ্বর প্রতিবাদ করে লিখলেন, 'না, তাকে দেওয়া হয়েছে "কপি-রত্ন" খেতাব।' তার পর ঈশ্বর স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রাদি থেকে তাঁর 'কপি-রত্ন' সপ্রমাণ করার পর নিলেন অলঙ্কার। লিখলেন, সর্ব আলঙ্কারিক এক বাক্যে বলেন, 'ব' অক্ষরটি কর্কশ, 'প' অক্ষরটি মোলায়েম। উপাধি দেবার বেলা অবশ্যই

www.pathagar.com

মোলায়েম অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব কপিরত্ন। কাকতালীয় কি না, বলা সুকঠিন, কারণ শ্রীমধু ইতোপূর্বে অলঙ্কার শাস্ত্র গুলে খেয়ে পেটতল করে তৈরি ছিলেন। মনে মনে বললেন, 'বইট্টে! "ব" বুঝি কর্কশ। আমি নাগাড়ে "ব" এস্তেমাল করব। সামলাও দেখি ঠ্যালাডা।" সীতা-সরমায় সদম্ভে লিখলেন,

শুনিয়াছি বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে—

পরপর চারটে শব্দে চারটে 'ব'-এর অনুপ্রাস! এ অধম বহু বৎসর ধরে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেছে অলঙ্কার অধ্যয়নে। সে চিৎকারিল উচ্চৈঃস্বরে,

'ভো ভো গৌড়জন
সবে। কী মধু নিমিল মধু অবহেলে
বারম্বার 'ব' অক্ষর বিভাসিয়া। বলো
কবে কবি কেবা, বর্ণিল বরদা বরে
বঙ্গভূমে পিকবর-রব নব?'

('ব' এবং 'ভ' অনুপ্রাস সমধ্বনিসূচক)

এ তো অতি সামান্য একটি উদাহরণ মাত্র। শ্রীমধুর কাব্য-নাট্যাদি যেকোনো সৃষ্টিকর্মের যেখানে খুশি হাত দাও, পাবে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, পূর্বসূরিদের স্মরণান্তে ('নমি আমি কবিগুরু... বাল্মীকি/হে ভারতের শিরচূড়ামণি', 'কৃত্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার') তাঁদের ছাড়িয়ে যাবার সফল প্রচেষ্টা, অলঙ্কার নন্দনশাস্ত্র তুড়ি মেরে, সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে নব নব সংকটের পথে নব নব অভিযানে নিষ্ক্রমণ, সৃষ্টির পর সৃষ্টি, অভূতপূর্ব সৃজন, যার থেকে অনাগত যুগের নবীন আলঙ্কারিক অভিনব নব নব সূত্র নির্মাণ করে গোড়াপত্তন করবেন নবীন নন্দনশাস্ত্রের— সর্বোপরি বঙ্গভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ, বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অচল অটল বিশ্বাস, সে ভবিষ্যৎকে সফল করার জন্যে তাঁর সর্বব্যাপী প্রত্যাশা— এমনকি, কোনও সার্থক মুসলমান কবি কারবালা নিয়ে একদিন রচনা করবেন অনবদ্য সমুজ্জ্বল (magnificient) এপিক[১]— এবং এসব আশা-আকাঙ্ক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত বিদ্রোহ, দুর্বার সংগ্রাম।

১. 'মেঘনাধ' রচনার সময় শ্রীমধু সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, 'I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. (... ...) What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, Drama, Criticism. Romance— a man would bare a name behind him, above all Greek, above all Roman fame.' শুধু হিন্দু পুরাণাদিই না। অন্যত্র শ্রীমধু লিখছেন, 'We have just got over the noise of Mohurrum. I tell you what— if a great Poet were to rise among the

www.pathagar.com

আশ্চর্য! মাইকেল খ্রিস্টান। তিনি বাঙলা ভাষার বৈরীদের সঙ্গে করলেন আমৃত্যু সংগ্রাম। তিনি আহরণ করতেন অসংখ্য রতনরাজি বহুতর ভাষা থেকে কিন্তু কি ইংরেজি, কি সংস্কৃত তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার আসন দখল করে সেটা তিনি এক লহমার তরে বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর তিনশত বৎসর পূর্বে আরেক অহিন্দু— মুসলমান, তাঁরই মতো 'বাঙাল'— সৈয়দ সুলতান বহুবিচিত্র সম্পদ আহরণ করতেন আরবি-ফারসি থেকে, কিন্তু তাঁর সাধনার ধন বাঙলাকে যারা স্থানচ্যুত করতে চায় তাদের স্মরণে এনে দিচ্ছেন অপূর্ব সুভাষিত,

'যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সে-ই তার মাতৃভাষা, অমূল্য সে ধন ॥'

অথচ শ্রীমধু স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন ইংলন্ডের। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে অল-ওস্তাদ ড. মনিরুজ্জামান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থাবলিখানি আছে মাত্র। অর্থাৎ *ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ*, গয়রহ একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ নেই। অতএব তাবৎ কাব্য-উদ্ধৃতি আমার জরাজীর্ণ স্মৃতিদৌর্বল্যের ওপর নির্ভর করে এস্থলে লিখতে হচ্ছে— মায় সুলতানের সুভাষিত।

বিলেতের স্বপ্নে বিভোর শ্রীমধু তখন আকুল হৃদয়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখছেন (বয়স চোদ্দ/পনেরো, 'পৃথিবী', না 'প্রথিবী' কোনটা শুদ্ধ জানেন না; পরবর্তীকালে নিজেই বলছেন সে সময় কেউ 'শিব' না লিখে 'যীব' লিখলে সেটাকে তিনি উদ্ভট মনে করতেন না)—

I sing for the distant Albion shore
Its valley green its mountains high,
Though friends none reliations have I nor
In that far clime, yet oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave,
For glory or a nameless grave!

(উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই ভুল আছে)

অনেক বৎসর পরে কবিগুরু রবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেন :

দূর শ্বেতদ্বীপ তরে পড়ে মোর
আকুল নিঃশ্বাস,
যেথা শ্যামা উপত্যকা, উঠে গিরি
ভেদিয়া আকাশ।
নাহি সেথা আত্মজন, তবু লঙ্ঘি
অপার জলধি,
সাধ যায় লভিবারে যশ, কিংবা
অ-নামা সমাধি ॥

Mussulmans of India, he could write a mangnificient Epic on the death of Hossain and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such Suject.' (অর্থাৎ হিন্দু পুরাণাদিতে নেই।) ড. মনিরুজ্জামান, *নাট্যগ্রন্থাবলি*, পৃ. ৭৯৩, ৮১৬।

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন মধু। গিয়েছিলেন বলেই বিদেশি ভাষার প্রতি সমসাময়িক সর্বজনীন চিত্ত-দৌর্বল্যজনিত মোহ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন অতি সত্বর। বিদেশের প্রতি তাঁর কুহেলিকাচ্ছন্ন চক্ষুঃজ্যোতিও নিরাবিল হয়ে যায় যুগপৎ।

বস্তুত কলকাতায় ফিরে এসেও মধু সেই পরবাসীই থেকে গেলেন। শ্রীমধু চিরকালই খাঁটি যশোরে 'বাঙাল'। কলকাতার 'ঘটি'-রাজরা যখন তাঁকে তাঁর সরস তথা দার্ঢ্যগুণসম্পন্ন, সরল অপিচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব প্রকাশে পটিয়ান, মধুর অপরঞ্চ গুরুগম্ভীর, অকৃত্রিম বিদগ্ধ বঙ্গভাষার সর্বাধিকারাধার প্রতিভূরূপে নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন তখন অকস্মাৎ নয়া এক ভেল্কিবাজি দেখিয়েছিলেন যশোরের খাঁটি 'বাঙাল'। পশ্চিমবঙ্গের অকৃত্রিম ঘটির ভাষা পেরিয়ে মধু ছাড়লেন বাঙাল ভাষার রঙ বেরঙের আতশবাজি।

শ্রীমধু মাতৃভূমি সাগরদাঁড়ি ছাড়েন বাল্যে। কিন্তু এ কী তিলিস্‌মাৎ, কী অলৌকিক কাণ্ড! শুধু যে যশোরের হিন্দু ভদ্রলোকের ভাষা (ভক্তপ্রসাদের ভাষা) স্মরণে রেখেছেন তাই নয়, হিন্দু চাকরের ভাষা (রাম), বামুন পণ্ডিতের সংস্কৃতে ভেজা সপসপে ভাষা (বাচস্পতি), মুসলমান চাষার ভাষা (হানিফ), তার বউয়ের ভাষা (ফতেমার ভাষাতে বিদেশি-শব্দ হানিফের তুলনায় কম)— কে কতখানি সংস্কৃতে ভরা ভাষায় কথা বলবে, কে কোন পরিমাণে আরবি-ফারসি এস্তেমাল করবে তার ওজন করে শ্রীমধু চালাচ্ছেন একসঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয় মূলত যশোরি ভাষার ভিন্ন ভিন্ন আড় বা ঢং— যাদুকর যেরকম ছ টা বল নিয়ে খনে এক হাতে খনে দু হাতে নাচায়। এমনকি সদ্য কলকেতা ফের্তা কলেজের ছোকরাকেও দিব্য চেনা যাচ্ছে। বলছে, 'এমন ক্লেবর ছোকরা দুটি নেই।' ওদিকে ভক্তপ্রসাদ জমিদারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বরঞ্চ যাবনিক শব্দ দিব্য চেনেন। তাই ক্লেভার শব্দের দু দুটি প্রতিশব্দ 'সুচতুর' 'মেধাবী'ও তাঁর পছন্দ হল না। বললেন, ' "জহীন" কিংবা "চালাক" বললে বুঝতে পারি।'— আজ আর জহীন শব্দ কোনও বাঙলার লোকই বোঝে না। আরবি 'জেহ্‌ন্' দু একখানা কোষে পাওয়া যায়। বলা নিতান্তই বাহুল্য 'চালাক' ফারসি।

একাধিক লেখক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে একাধিক ভাষা নিয়ে কারচুপি দেখিয়েছেন কিন্তু শ্রীমধুর ন্যায় এরকম ভেল্কিবাজি, কেউই দেখাতে পারেননি।

কলকাতার বুকের উপর বসে তিনি নির্ভয়ে বাংলা দেশের 'বাঙাল' ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ শুধু যে পাঙ্‌ক্তেয় করে তুললেন তাই নয়, তারা সেদিন যেসব উচ্চাসনে বসেছিল সেসব আসন নিয়ে খাস কলকেত্তাই বা অন্য কোনও আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।

যদ্যপি শান্তিনিকেতনের গীতিরস-পরিবেশে আমার কৈশোর কেটেছে, তবু শ্রীমধু আমার বড়ই প্রিয় কবি। তাই এতখানি লেখার পরও দেখি কই, কিছুই তো বলা হল না? মনস্তাপ রয়ে গেল।

সেটা হালকা করার জন্য অবনী ঠাকুরের অনুকরণে গান জুড়ি

'শ্রীমধুরে ঠ্যাকায় কেডা
খুল্‌নে যশোর কইল্‌কেতা!'

বেতার বাংলা, জুন ১৯৭৩

www.pathagar.com

অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি

এই ক্ষুদ্র রচনাটির অবতরণিকাতেই আমার একটি সামান্য কৈফিয়ত নিবেদন করার আছে। যদিও বহু বৎসর ধরে আমার লেখা কেউ বড় একটা পড়ে না, তবুও 'বেতার বাংলার' সম্পাদকমণ্ডলীতে দু একজন নিতান্তই 'অকালবৃদ্ধ' সজ্জন, তথা তাঁদের বড় কর্তা আমার প্রতি নিতান্ত অকারণ সদয়। 'বেতার বাংলা'ই স্বাধীনতার পর এই অনারারি পেনশনপ্রাপ্ত অস্তমিত লেখকের কাছ থেকে সসম্মানে দাক্ষিণ্যসহ একটি রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমারও স্পর্ধা বেড়ে গেল। জীবনে যা কখনও করিনি, সেই নিবেদন জানালুম; আসছে শ্রাবণের ১০ তারিখ (২৯ জুলাই) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিবস। তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই। তাঁরা সম্মত হয়েছেন।

নিঃসঙ্কোচে বলব, চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর হিন্দু সমাজের ইনিই সর্বোত্তম মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ যেসব মহাত্মাদের জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক বিস্তীর্ণ স্থান দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রকে। তিনি বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।'

আমার সবিনয় নিবেদন, আমি গুরুর সঙ্গে একমত নই। অবশ্য 'আর দুই একজন' বলতে গিয়ে গুরু যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামমোহনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে থাকেন তা হলে সে অভিমত সম্বন্ধে আমার কোনও বক্তব্য নেই।

গত দুই শতাব্দীতে যেসব মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন— রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ— তাঁরা সকলেই হিন্দুধর্মের মূর্তমান প্রতীক। ঈশ্বরচন্দ্র তা নন। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান গত আড়াই শতাব্দীর কারও চাইতে কণামাত্র কম ছিল না। বরঞ্চ হিন্দুশাস্ত্রে আমার যে নগণ্য যৎসামান্য জ্ঞান আছে তার পথপ্রদর্শক ঈশ্বরচন্দ্র। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শাস্ত্রাধ্যয়ন-লব্ধ পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র অতুলনীয়। বঙ্গদেশ বাদ দিন, সব ভারতের হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের কেন্দ্রভূমি কাশীর শাস্ত্রীরা তাঁকে সমীহ করে চলতেন; ঈশ্বর যখন বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলে বিধান দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, কাশীর শাস্ত্রীরা মল্লভূমিতে নামতে সাহস পাননি।

অথচ, পাঠক বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র মানতেন না। তাঁর ঋজু, সত্যশীল, দৈনন্দিন আচার-আচরণ সর্বধর্ম, বিশ্ব ধর্মসম্মত ছিল— হিন্দু শাস্ত্রের বিধান তিনি সর্বজন সমক্ষে পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করেছেন— অথচ সে যুগের হিন্দু সমাজপতিরা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ বিধবা-বিবাহ বিরোধী সমাজপতিগণ তাঁকে সমাজচ্যুত করার দুরাশা স্বপ্নেও স্থান দেবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি তাঁর 'অন্নসত্রে ভোজনকারিণী মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈলাভাবে বিরূপ কেশগুলিতে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।' এস্থলে রবীন্দ্রনাথ ভাবোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে 'আত্মীয়-নির্বিশেষে' বাক্য প্রয়োগ করেননি— করেছেন— সজ্ঞানে সসম্মানে

www.pathagar.com

শব্দার্থে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ বিরোধী ছিলেন। তাঁর এক উপন্যাসে তিনি ওই নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুক করেছেন। অথচ ঠিক ওই সময়ই বঙ্কিমের অগ্রজ সদানন্দ, সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতামুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র অনুজ বঙ্কিমকে নিয়ে বর্ধমানে ঈশ্বর সকাশে উপস্থিত হয়ে কুশলাদির পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভোজনেচ্ছু হন। ঈশ্বরচন্দ্র মোগলাই পদ্ধতিতে উত্তম মাংসরন্ধনে সুপটু ছিলেন। সঞ্জীব আহারের সময় বিদ্যাসাগরের রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসা করে বলেন, তিনি যে বহুগুণধারী, সে তথ্য সঞ্জীব জানতেন, কিন্তু রন্ধনেও যে তিনি সুপটু সে তত্ত্ব তাঁকে বিস্মিত করেছে। বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ছলনাময়ী। তারই ওপর নির্ভর করে সঠিক বলতে পারছি না, বিদ্যাসাগর 'কিন্তু আপনার ভায়া তো ভাবেন, আমি— ' বলার পর 'মূর্খ' না ঠিক ঠিক কোন বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন। এর কিছুদিন পূর্বে বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তার সারমর্ম এই যে, 'আপনি শাস্ত্র-দ্বারা কেন প্রমাণ করতে গেলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করা উচিত!' ঈশ্বরচন্দ্র আত্মম্ভরী বা দম্ভী ছিলেন না, কিন্তু তিনি আত্মদ্রষ্টা ছিলেন, তাই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বঙ্কিম প্রভৃতি 'নব হিন্দুধর্মের' প্রবর্তকগণ কি ব্যক্তিগত জীবন যাপন পদ্ধতিতে, কি শাস্ত্রজ্ঞানে, কি প্রকৃত ধর্মতত্ত্বানুশীলনে তাঁর বহু বহু পশ্চাতে। ঈশ্বরচন্দ্র সে পত্রের উত্তর দিয়ে বঙ্কিমকে অহেতুক সম্মান দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু এর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ঈশ্বর ও বঙ্কিম উভয়ই যখন পরলোকে তখন রবীন্দ্রনাথ মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে লিখেছিলেন, 'অনেকে বলেন, তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাব নয়।' এ যে কী মোক্ষম সত্য আমার গুরু আপ্তবাক্যপ্রায় বলেছেন, সে আমার অক্ষম লেখনী কী করে প্রকাশ করবে! প্রকৃত গুণী, মোহমুক্ত সত্যদ্রষ্টাই শাস্ত্রের এই জটিল তর্কজাল ছিন্ন করে মানুষকে ইঙ্গিত দেন, শেষ সত্যের উৎসস্থল কোথায়? কবি বলছেন, 'তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেননি।' শাস্ত্র মানুষকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে, হয়তো-বা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে উপদেশ দেয়, কিন্তু শাস্ত্র কবে কোন মানুষের পাষাণ-হৃদয়কে করুণা ধারায় প্লাবিত করতে পেরেছে?

* * *

এতক্ষণ অবধি যাঁরা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরা হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। শাস্ত্র, তা-ও হিন্দুশাস্ত্র, সে-ও গত শতাব্দীর পুরনো এক সমস্যা নিয়ে এত কচকচানি শুনে কীই-বা এমন চরম মোক্ষ লাভ হবে? কিচ্ছুটি না। তবে শুধু স্মরণে এনে দিতে চাই, মাত্র দুটি বৎসর আগে স্বৈরাচারী নরঘাতক সম্প্রদায় আমাদের মুসলিম শাস্ত্র নিয়ে পেশাওয়ার থেকে সিলেট অবধি কী প্রতারণাই না করেছিল। আমাদের জনপ্রিয় নেতা, মুক্তি ফৌজের আত্মোৎসর্গ, জনপদবাসীর বিদ্রোহ এর সবই নাকি ছিল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ! আমরা ইংরেজি পঞ্জিকার ওপর নির্ভর করে দিবারাত্রির নামকরণ করাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে এখনও বলি ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটার সময় অভূতপূর্ব তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম পঞ্জিকানুযায়ী বৃহস্পতিবারের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল পবিত্র জুম্মাবার, শুক্রবারের রাত্রি। তার পর এল শুক্রবারের দিন। আল্লাতালার আদেশ :

'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, ইজা নুদিয়া লিস্‌সলাতি মিন্‌নি-ইয়োমিল জুমুয়া (তি), ফাস্ আ'ও ইলা জিক্‌রিল্লাহ (ই)'

www.pathagar.com

'হে ইমানদারগণ, যখন জুমার (সম্মিলন দিবসের) নমাজের জন্য তোমাদের প্রতি আহ্বান (আজান) ধ্বনিত হয় তখন আল্লাকে স্মরণ করার জন্য ধাবমান হও।'

শব্দার্থে 'ধাবমান' হয়েছিলেন আমার এক বন্ধুর পরহেজগার প্রতিবেশী ২৬ মার্চ জুমার নমাজের দিনে। তিনি জানতেন যে পুরোদিনের তরে কারফু। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বারবার মানা করেছিলেন। বাড়ির সামনের রাস্তা জনশূন্য। অপর ফুটের হাত পাঁচেক ডাইনে মসজিদ। তিনি বিবিকে বললেন, 'আমি এক দৌড়ে মসজিদে পৌঁছে যাব।' রাস্তা যখন প্রায় ক্রস্ করে ফেলেছেন তখন তীর বেগে এল মিলিটারি গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। আরেকটি শহীদ। ইনি অতিশয় উচ্চপর্যায়ের শহীদ। কারণ আল্লার আদেশ অনুযায়ী শব্দে শব্দে 'ধাবমান' হয়েছিলেন তিনি আল্লার নাম জিক্‌র করতে। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, আল্লার আদেশ পালন করতে যে বাধা দেয় (কারফু জারি করে), যে মানুষের আদেশে আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করে তাঁকে খুন করে সে মানুষ শহীদহন্তারূপে কী খেতাব পায়! এবং এই ইয়াহিয়াই ডিসেম্বর মাসে পরাজয় আসন্ন জেনে আপন শিয়া ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্নিদের মসজিদে গেলেন জুম্মার নমাজ পড়তে। সুন্নিদের ভিতর তখন গুঞ্জরণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, 'এই শিয়াটাই যত নষ্টের গোড়া' যেন হুজুররা অ্যাদিন ধরে জানতেন না ইয়াহিয়া খান পুরো পাক্কা কিজিল পাশ্ শিয়া।

বিশ্বধর্মে দীক্ষিত ঈশ্বরচন্দ্র আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন ছিলেন কিন্তু ধর্ম নিয়ে প্রতারণার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ঘৃণা। তাই একদা তিক্ত কণ্ঠে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন,

'প্রতারণাসমর্থে বিদ্যায়া কিং প্রয়োজনং?
প্রতারণাসমর্থে বিদ্যায়া কিং প্রয়োজনং?'

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, দুটি ছত্রই হুবহু একই বানানে লেখা, কিন্তু অর্থে আসমান-জমিন ফারাক, এবং দুই ছত্রে মিলে একই সত্য নির্ধারণ করে।

প্রতারণা-সমর্থ জনে, যে প্রতারণা করতে সমর্থ তার (শাস্ত্র) বিদ্যার কী প্রয়োজন? প্রতারণা দ্বারাই সে সবকিছু গুছিয়ে নেবে। দ্বিতীয় ছত্রে কিন্তু পড়তে হবে প্রতারণা অসমর্থ। এখানে সন্ধি করলে পূর্ব ছত্রের মতোই 'প্রতারণাসমর্থ' রূপ নেয়। অর্থ : প্রতারণা করতে যে জন অসমর্থ কোনও বিদ্যাই তার কোনও কাজে লাগবে না। অর্থাৎ বিদ্যা কোনও অবস্থাতেই কারও কোনও কাজেই লাগে না। কাজ হাসিল হবে প্রতারণা মারফত। বড্ড সিনিক্-এর মতো তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ করে বোধহয় এই কারণে যে তাঁকে বিদ্যার সাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এবং হয়তো-বা ওই সময়েই মাইকেল তাঁর প্রশস্তি আরম্ভ করেন। 'বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে' শ্রীমধুর মধুময় ছত্রটি বিদ্যার সাগর দিয়ে আরম্ভ হয়। সর্বশেষে এ তথ্যটিও প্রাতঃস্মরণীয় যে, বহুলোক বহু উপাধি পায় কিন্তু সেগুলো এ রকম টায় টায় খাপ খায় না বলে লোকে উপাধিধারী কাউকে কখনও তার পদবি যেমন 'বাঁড়ুয্যে' কখনও 'কালীকৃষ্ণ' কখনও 'ন্যায়রত্ন' বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কখনও বাঁড়ুয্যে মশাই (যতদূর মনে পড়ে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ দু জনাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষেপে বাঁড়ুয্যে, হয়তো-বা রামমোহনও) বা 'ঈশ্বরচন্দ্র' বলে উল্লেখ করেনি। প্রবন্ধ লেখার সময় আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করি ভাষার অনুপ্রাস, কবিতার ছন্দ শ্রুতিমাধুর্য বা অর্থগৌরব অনুযায়ী যখন যেরকম মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়— হয়তো-বা কিঞ্চিৎ হার্দিক নৈকট্যের ইঙ্গিতসহ। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিত্যদিনের চিরন্তন বিদ্যাসাগর। শুনেছি বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার পর

www.pathagar.com

ফরেসডাঙ্গার (চন্দননগর) তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে বোনে— 'বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে তুমি।' এবং এ উপাধি যে কত সত্য কত গভীর তার চরম স্বীকৃতি দিয়েছেন সে-যুগের অন্যতম ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি স্বয়ং এসেছিলেন বিদ্যেসাগরের দর্শন লাভার্থে তাঁর ভবনে। উভয়ের পন্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রামকৃষ্ণ সাধক, আর বিদ্যাসাগর ছিলেন মোক্ষ, মুক্তি, বৈকুণ্ঠলাভ বা শিবত্ব প্রাপ্তি বাবদে নিরঙ্কুশ উদাসীন। বিদ্যাসাগর অতিশয় সযত্নে রামকৃষ্ণকে সম্মুখের আসনে বসালেন। রামকৃষ্ণ মুগ্ধ নয়নে এক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তাঁর দিকে তাকিয়ে শেষটায় ভাবোদ্বেল কণ্ঠে বললেন, এতদিন দেখেছি শুধু খাল বিল ডোবা; এইবারে সত্যই 'সাগর দর্শন হল।' রামকৃষ্ণ 'বিদ্যাসাগর' না 'দয়ার সাগর'— শ্রীমধুর মধুর ভাষায় 'করুণার সিন্ধু তুমি!'— বা উভয়ার্থে বলেছিলেন সেটা পরিষ্কার হয়নি; আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস উভয়ার্থে। বলা নিতান্তই অনাবশ্যক যে, রামকৃষ্ণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। সে যুগের বহুজন সম্মানিত বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' তথা নব-হিন্দু ধর্মব্যাখ্যান মাসের পর মাস লিখে যাচ্ছেন তখন তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা বা যাই হোক, সে সন্ধানে যেতেন তাঁর আশ্রয়স্থলে— বিদ্যাসাগর কখনও যাননি। একদিন রামকৃষ্ণ হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, 'আপনার নাম যেরকম বঙ্কিম, আপনি ভিতরেও বাঁকা বটে।' সম্পূর্ণ মন্তব্যটি আমার মনে নেই। তবে সেটা যে অতিশয় শ্রুতিমধুর ছিল না তা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বিদ্যেসাগর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে ব্যত্যয়হীন বিরোধিতা প্রকাশ করতেন বলে তাঁকে অজ্ঞজন রূঢ়স্বভাবের লোক বলে কখনও কখনও মনে মনে সন্দেহ করেছে। এ স্থলে কবি ভর্তৃহরির দুটি ছত্র তুলে দিলেই বিষয় সরল হবে :

'আচারনিষ্ঠে ভণ্ড বলেছে,
ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ়
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গোণে,
বীরেরে নির্দয়, তেজীরে রূঢ়।'
(সত্যেন দত্তের অনুবাদ)

এই ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীন যুগে একথা স্মরণে এনে বড় আনন্দ পাই যে বিদ্যাসাগরের মতো রূঢ়তাবর্জিত তেজিজন এদেশে জন্ম নিয়েছিলেন। আমি বিদ্যাসাগরচরিত্র যদি কণামাত্র চিনে থাকি তবে রূঢ়তম কণ্ঠে রূঢ়তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলব, তাঁর মতো বিনয়ী লোক ইহসংসারে হয় না।

রামকৃষ্ণের মুগ্ধ মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগর হেসে বলেছিলেন, 'সাগরেই যখন এসেছেন তখন খানিকটে লোনা জল নিয়ে যান।' রামকৃষ্ণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সুস্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন।

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর ধরে দেশে-বিদেশে যখনই আমি কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি তখনই আমার মনে জেগেছে প্রথম দিনের প্রশ্নটা, করুণাসাগর 'লোনা জল' বলতে সেদিন কী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?

তবে কি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর সর্বসত্তাতে আছে শুধু চোখের জল, অশ্রুধারা লোনাজল?

বেতার বাংলা, জুলাই ১৯৭৩

www.pathagar.com

Tagore as Nationalist

আজকের দিনে অটোগ্রাফ, অটোগ্রাফের বই কাকে বলে পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে। আমি যে যুগের কথা বলছি তখন কলকাতায় সবচেয়ে নামজাদা বিলিতি দোকানেও অটোগ্রাফের বই চাইলে সেলসম্যানদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যেত জিনিসটা কি এবং শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলেও মাত্র দু'এক খানা।

তাই আজকের দিনের মত আমরা তখন অবহেলায় ছেঁড়া খাতার নিয়েই সন্তুষ্ট হতুম না, এবং যাঁদের কাছে যেতুম তাঁরাও বেশ যত্ন করে, খানিকটে ভেবে-চিন্তে কিছু একটা মনে রাখবার মত কথা লিখে দিতেন।

www.pathagar.com

শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন বাজে শিবপুরে, ছোট্ট এক খানি বাড়িতে। খুঁজে নিতে রীতিমত বেগ পেতে হত। তুপাকি আশ্রমগাঁয়ের ছেলে বললেও হয় — বিলাস শান্তিনিকেতন।

শরৎচন্দ্র শুধোলেন, 'আমারই কাছে এসেছ কেন?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললুম, 'আপনার লেখা আমার বড় ভালো লাগে।'

শরৎচন্দ্র কলম হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে লিখলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

এখানে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। শরৎচন্দ্র তখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে সবে অসহযোগ-আন্দোলনের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। এই নিয়ে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথে কিছুটা মনান্তরও হয়ে গিয়েছে — যদিও তেমন কিছু তীব্র নয়,

www.pathagar.com

এবং সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম এবং গভীর শ্রদ্ধা — তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত — এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে দেখতেন অত্যন্ত স্নেহের চোখে।

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, একথা জেনেই বোধহয় শরৎচন্দ্র বিশেষ করে আমার দৃষ্টি তাঁর লেখার কাজের দিকে আকৃষ্ট করালেন। তাছাড়া আমি তো বলেইছি যে তাঁর লেখা আমার বড় পছন্দ।

তারপর অটোগ্রাফ বই নিয়ে গেলুম, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আমরা তাঁর ছাত্র বলে তিনি একটু বিশেষ ভাবে নিজেই আমাদের অটোগ্রাফ বইয়ে ভালো লেখা, উদ্ধৃতি এমনকি কবিতাও লিখে দিতেন। অতি খুশী হয়ে বললেন, রেখে যা, ভালো করে লিখে দেব। দিন পনেরো পর বেশ সাহসে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সময় করে উঠতে পারেননি। কয়েকদিন পর আবার সসংকোচে আমার

www.pathagar.com

দিলেন। এবারেও পূর্ববৎ। কিন্তু হয়তো আমার বিষণ্ণ মুখ দেখে বললেন, তুই দাঁড়া। আমি একখানি লিখে দিচ্ছি।'

তারপর অলস হস্তে আমার অটোগ্রাফ খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, শরৎচন্দ্রের নিজহাতে লেখা। সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো চিন্তা না, ভাবনা না। প্রথম সাদা পাতাতেই লিখে দিলেন,

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

× × ×

এই কথাটির ভিতরেই আছে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ যে আপন দেশকে কতখানি ভালোবাসতেন, কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, সে দেশ যেন জনসমাজ মাঝে আপন আসন বেছে নেয়, পূর্ব-পশ্চিম যেন সে-দেশের ভাগ্যবিধাতার সিংহাসন পাশে এসে সম্মিলিত হয় এই মহান প্রার্থনা— আজ কোন রাজনীতির অর্থে তাঁর বক্তব্য খণ্ডিত বিকৃত হচ্ছে না?

কিন্তু তিনি জানতেন, দেশের প্রতি ভালোবাসার মত নির্মল জিনিস ও এমন স্বাধিকারপ্রমত্ততার সঙ্গে

www.pathagar.com

সংযুক্ত হয়, তেমন তার বিকৃততম রূপ দেখা দেয় চরম বিচ্ছিন্ন স্বজাত্যন্যায়ে। উগ্র জাতীয়তাবাদী তখন দুঃসাহস, তার বর্বরতা তখন দেখা যায়। আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম — প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

www.pathagar.com

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

আজ তাই পুনরায় স্মরণ করি,
সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ
দ্বারাই আমার দেশের সার্থকতা।।

সৈয়দ মু. আলী

১৪/২/৬২

বিচিত্র ছলনাজাল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি, স্বকর্ণে একাধিকবার, তাঁর মৃত্যুদিন যেন পালন না করা হয়। করতে হয় তো করি যেন তাঁর জন্মদিন।

স্বভাবতই আমাদের সকলের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন?

রবীন্দ্রনাথ তো চার্বাকপন্থি ছিলেন না। চার্বাক বলতেন, দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর পুনরাগমন কোথায়? এ স্থলে পুনরাগমন সমাসটি পুনর্জন্ম বা শেষ বিচারের দিন, যেকোনো অর্থে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তো এতখানি জড়বাদী ছিলেন না।

বরঞ্চ তিনি বারবার কতবার যে বলেছেন, মৃত্যুতে একদিকে আছে পরিসমাপ্তি অন্যদিকে আছে নব-অভ্যুদয়। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ও শিষ্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে তিনি যেন, যে অমর্ত্য-লোকে তাঁর প্রিয় কবি নতুন আনন্দ গান ধরেছেন তার সুর শুনতে পাচ্ছেন :

'— সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে
মিলিত মধুর
প্রভাত আলোকে আজি;
আছে তাহে সমাপ্তের ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের
মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে
বিদায়ের বিষণ্ন মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে
মিলনের আসন্ন অর্চনা।'

শুধু কি তাই? যারা এ জীবনে কৃপণ ভাগ্য বশে বিড়ম্বিত হয়েছে, কবি তাদের মৃত্যুতে তাদের জন্য বিরাট একটা অপ্রত্যাশিত বৈভব গৌরব দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহতালা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বহু বিচিত্র অমূল্য সম্পদ দিয়েছিলেন কিন্তু একটি অতি সাধারণ ব্যাপারে তাঁর প্রতি বিমুখ। তাঁর পত্নী, দুই কন্যা, এক পুত্র (অন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, এক কন্যা মীরা দেবী)— এই চারজন পরপর মারা যান। এঁদের বয়স যথাক্রমে, স্ত্রী— ঊনত্রিশ, কন্যা— তেরো (নিঃসন্তান), পুত্র— এগারো, কন্যা— বত্রিশ (নিঃসন্তান)। এরপরও রবীন্দ্রনাথ রেহাই পাননি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তো নিঃসন্তান— রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর পুত্রবধূর কোনও সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্য পুত্র এগারো বৎসর বয়সে গত হয়েছে— কলেরায়। পুত্রের দিক দিয়ে তাঁর কোনও সন্তান-সন্ততি নেই। আছে কেবল কন্যা মীরার একটি পুত্র ও কন্যা। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল এই মেয়ের দিক দিয়ে তাঁর বংশ রক্ষা হবে। আমাদের হজরতের বেলা যা হয়েছে। ছেলেটির নাম নীতীন্দ্রনাথ, ডাক নাম নীতু। মীরা দেবী দাম্পত্যজীবনে সুখী হতে পারেননি বলে পুত্রকন্যা নিয়ে পিতার কাছে চলে আসেন ১৯১৯/২০-তে। বলা বাহুল্য ২৭ বছর বয়সে কোনও কন্যা যদি চিরতরে পিত্রালয়ে চলে

www.pathagar.com

আসে তবে পিতার মনের অবস্থা কী হয়; মীরা দেবীর বিবাহিত জীবনের কঠোর দ্বন্দ্বের অনেকখানি সন্ধান পাঠক পাবেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসে। কিন্তু সেখানে কুমুদিনীর পিতার মৃত্যু তার বিবাহের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল বলে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে কন্যা মীরার প্রত্যাবর্তন কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটা উপন্যাস থেকে জানবার উপায় নেই। পাছে কেউ ভুল বোঝেন, তাই বলে রাখা ভালো, কুমুদিনীর পিতা এবং মীরা দেবীর পিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে বিন্দু-বিসর্গের মিল নেই।

এতদিন এসব বিষয়ে আমি সবিস্তর আলোচনা করাটা যতখানি পারি এড়িয়ে গিয়েছি কারণ মীরাদির স্নেহ আমি বাল্যবয়সে পেয়েছি। তাঁর মেয়ে নন্দিতা, ডাকনাম 'বুড়ি'-কে আমি তার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে চিনি। আমার বয়স তখন ষোলো (নীতুর বয়স নয়); পাঁচ বৎসর ধরে নানা মান-অভিমানের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রতি সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। এর প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দিল্লিতে আমরা যখন প্রতিবেশী তখন তো আর কথাই নেই। এর দশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। বুড়ির সঙ্গে শেষ দেখা হয় বছর-চারেক পূর্বে। বুড়ি নিঃসন্তান বলে কথাবার্তার সময় আমি কাচ্চাবাচ্চাদের প্রসঙ্গ কখনও তুলতুম না। এখন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, তাঁর সন্তানদ্বয় কেউ আর এ-লোকে নেই; আমার অক্ষম লেখা কারও পীড়ার কারণ হবে না।

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ি,
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশ হাজার কুড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১-এ যখন এ-কবিতাটি লেখার পরদিন আমাদের পড়ে শোনান, তখন বুড়ি সেখানে উপস্থিত ছিল। পাঁচবছর বয়সের বুড়ি কবিতাটির আর কতখানি বুঝবে। তবে তার দাদা নীতুর বয়স নয়। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি বুঝেছিল। মাঝেমধ্যে বুড়িকে 'বুড়ি বুড়ি' বলে ক্ষ্যাপাত বলে ওই কবিতার শেষের দিকে আছে :

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, 'বুড়ি বুড়ি'।

নীতুর মতো সুন্দর প্রিয়দর্শন ছেলে আমি জীবনে কমই দেখেছি। তার বিশেষ বন্ধু ছিল, আমার রুমমেট চাটগাঁয়ের (বোধহয় পাহাড়তলী অঞ্চলের) জিতেন হোড়। নীতু প্রায়ই আমাদের রুমে এসে গালগল্প জমাত। সে ছিল স্বল্পভাষী, আর জিতেন কথা কম বললেও ছিল বাক-চতুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন পুত্র-কন্যাকে কতখানি ভালোবেসেছিলেন সে আমার জানার কথা নয়, কিন্তু নীতুকে তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় উজাড় করে যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তার সাক্ষ্য দেবে সে যুগের দু পাঁচজন যাঁরা এখনও এপারে আছেন।

পাঠকের মনে থাকতে পারে কবির 'ঠাকুরদা' গল্পে নয়নজোড়ের বাবুদের কাহিনী। সে বাবুদের শেষ বংশধর পাড়ার ঠাকুরদা অর্থাভাবে 'ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার বন্ধ

www.pathagar.com

করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার অস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন—'

রবীন্দ্রনাথের 'ভৃত্যাভাব' ছিল না এবং তাঁর উড়িয়া সেবক বনমালী যে পাঞ্জাবির আস্তিন ও ধুতির কোঁচা খুব একটা সাধারণভাবে গিলে করত তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হাতের সুচিক্কণ গিলে করার পদ্ধতির সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে কেন? একদিন নীতু এসেছে আমাদের রুমে। পরনে গিলে করা 'অতি পরিপাটি' সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে সিল্কের উড়ুনি। আমাদের জানাল সে দিনটা তার জন্মদিন। শেষটায় ধরা পড়ল, স্বয়ং দাদামশাই স্বহস্তে কাপড়-জামা গিলে করে তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

১৯৩১-৩২-এ নীতু জর্মনিতে গেল পড়াশুনো করতে। কয়েক মাসের ভিতরই হল ক্ষয়-রোগ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সখা সি এফ এনড্রুজ বিলেত থেকে জর্মনি গেলেন তার দেখভাল করতে। অবস্থা খারাপের দিকে খবর পেয়ে মীরা দেবীও গেলেন জর্মনি। ওই সময় বরানগরে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন কাটাতে এসেছেন প্রশান্ত-রাণী মহলানবিশের সঙ্গে। ৭ অগস্ট (আমি প্রচলিত বইপত্রে সঠিক তারিখ বের করতে পারিনি) নীতু মারা গেল।

রাণী মহলানবিশ লিখছেন, 'পরদিন রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম জার্মানিতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে। এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কী প্রকারে?

'শেষে স্থির হল খড়দায় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে ফোন করে আনিয়ে আমরা চারজন একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস? সে এখন ভালো আছে, না?" (এর কারণ কবি তার আগের দিন, এনড্রুজের কাছ থেকে চিঠি পান— তখনও অ্যার মেল চালু হয়নি— যে, নীতু তখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে— লেখক) রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। (ওই সময় থেকেই কবি কানে একটু খাটো হয়ে গিয়েছিলেন— লেখক)। বললেন, "ভালো? কাল এনড্রুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভালো আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।" রথীবাবু এবার চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভালো নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বউমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে।" '

এটা যে কত বড় শোক তার জন্যে কোনও মন্তব্য বা টীকার প্রয়োজন হয় না। ওই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে মীরার জন্য যে দুটি কবিতা লেখেন, তিনি বা মীরাদি তখন কোনও পত্রিকায় সে দুটি প্রকাশ করেননি। প্রকাশিত হয় তিন বৎসর পরে 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থে; তাই অনেকেরই দৃষ্টি এ কবিতা দুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।... সকলেই জানেন, ঈশ্বরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল অতিশয় গভীর। 'দুর্ভাগিনী' কবিতায় স্তম্ভিত হয়ে দেখি, সে বিশ্বাসে চিড় লেগেছে।

'— চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।'

তখন দুর্ভাগিনী মাতা যখন সান্ত্বনার জন্য ইষ্টদেবতার সম্মুখীন হল তখন কী পেল সে।

'— দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ, সেখানে বিদ্রূপ।'

www.pathagar.com

ঈশ্বর-বিশ্বাসীজন এর চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর কী বলতে পারে! ঈশ্বর বিদ্রূপ করেন।

এখানেই কি শেষ? প্রায় তাই। কিন্তু দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করলে তার মূল্যও দিতে হয়। একে একে অনেক বন্ধু চলে গেলেন ওপারে। এদিকে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছে। মৃত্যুর ষোলো মাস পূর্বে খবর এল কলকাতায় এনড্রুজ গত হয়েছেন। বন্ধুত্ব তো ছিলই কবে, সেই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগের থেকে, তদুপরি বিশ্বভারতীর বছরের পর বছর ব্যাপী অর্থকষ্ট কঠিন সঙ্কটে পৌঁছলেই কবিকে না বলে, এনড্রুজ তাঁর মিত্র মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে অহমদবাদের কোটিপতিদের কাছ থেকে বিপদতারণ অর্থ সংগ্রহ করতেন। এনড্রুজের স্বাস্থ্য ছিল কবির চেয়ে অনেক ভালো। কবির মানসপুত্র, বিশ্বভারতীর খুল্লতাত চলে গেলেন জনকের আগে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু পাঁচটি বৎসর তিনি আমাদের সেই গ্রিক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন। আরও কত কী! সে তো ভোলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে-ভাইপোকে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, তাঁর চেয়ে মাত্র এগারো বছরের ছোট সুরেন্দ্রনাথ গত হলেন ঠিক তার এক মাস পরে, কবির জন্মদিনের মাত্র চারদিন পূর্বে :

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়-মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ

সর্বশেষে লিখছেন, শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মরণে, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি,

তাঁর মৃত্যুর জ্বলন্ত শিখার
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক
হয়ে আছে;
সে মহিমা উদবারিল যাহার উজ্জ্বল
অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

শোকের পর শোক, প্রতি শোকে কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বারবার অনুসন্ধান করছেন— এ কি সব অর্থহীন? এর চরম মূল্য কি কোনওখানেই নেই?

অথচ তিনি অতি উত্তমরূপেই জানতেন, এ সংসারে এমন কোনও মহা সুপারম্যান অবতীর্ণ হননি যাঁর তিরোধানবশত তাবল্লোক গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হবে, কিম্বা আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের দ্বার খুলে তার থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নেবে না। তাই তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রাক্কালে বলছেন :

জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির কথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে

www.pathagar.com

নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

অতি সত্য কথা। কিন্তু যে লোকটা আমাদের এত কিছু দিয়ে গেল, অনাগত যুগের তরেও তুলনাহীন বৈভব রেখে গেল, তাঁকে স্মরণ করব না এই দিনে? এই দ্বন্দ্ব'র কি কোনও সমাধান নেই? যে এত দিল তাকে স্মরণে না-আনা সে তো ছলনা।

কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা স্মরণে আনি :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী!

একদিকে 'বিচ্ছেদ বেদনা', অন্যদিকে 'নির্মম আনন্দ' এ তো ছলনা। তাই

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ॥

'পূর্বদেশ' ৫.৮.১৯৭৩

রামানন্দ-তর্পণ

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি— আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরল কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল! শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরও কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের শতদোষ থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মতো লোক মানবজাতির ওপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশি।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দু জনাতে বড়ই মিল। দু জনাই জহুরি। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন এক নিভৃত কোণে কে কোন গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কী করে ধরে নিয়ে আসা যায়

www.pathagar.com

সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন এক অখ্যাতনামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে— ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ! আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ পণ্ডিত কোন বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন— সেদিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনও কোনও স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণিকাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেরেছিল।

* * *

সে যুগের 'প্রবাসী'তে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুত, এ যুগের কোনও মাসিক কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য একথাও স্বীকার করি— ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দি বা অন্য কোনও অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যাম্পিয়ন অব লস্ট কজেস— তাবৎ বাঙলা দেশে দু জন কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বে, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক রামানন্দ জানতেন 'কান্টীয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনও প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সুফিতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সুফিতত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যান্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২-১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নতুন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্বল বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্ট কজ্। এরকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্যদিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যেকোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্বকথাটি বুঝে যাবেন।

১. হুবহু শিরোনামাটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

www.pathagar.com

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনও ভেজাল বেচেননি।

এই পাবলিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র যেকথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় 'প্রবাসী'র কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়— এতে থাকবে 'প্রবাসী' থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ন রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে 'মডার্ন রিভ্যু' খাস লন্ডনে প্রচারিত যেকোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরেজি মাসিক বেরোয়নি।

* * *

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভ্যু' ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে— 'হিন্দির পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'— লিখবেন) এই একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্টভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মতো বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তার পর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশবার বলব, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোনও সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * *

ওঁ শান্তি; শান্তি; শান্তি।

'কথাসাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

অনাদিদেব! অনন্ত ভব!
শতং জীব! সহস্রং জীব!!

একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে সঙ্গীতের কর্ণধার ছিলেন— অবশ্য কবিগুরুকে বাদ দিয়ে— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী। পরম শ্রদ্ধেয় মমাগ্রজসম শ্রীযুত অনাদিকুমার দস্তিদার (শতং জীব, সহস্রং জীব!) তখন ছাত্র। কিন্তু আমি তাঁকে কখনও ছাত্র বলে ভাবতেই

www.pathagar.com

পারিনি। তাঁর আসন কার্যত এই দুই গুরুর পদপ্রান্তে ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায়— ফরাসি-ইংরেজি-বাংলা ক্লাসে আমার সতীর্থা, সুকণ্ঠী, সুবিনয়ী অনন্ত সুরলোকবাসিনী শ্রদ্ধেয়া রমা মজুমদার— যাঁর অকাল মৃত্যুতে কবিগুরুর শোক তাঁর পরমাত্মীয়া-বিয়োগ শোককেও প্রায় অতিক্রম করেছিল— একমাত্র ইনি ছাড়া শ্রীঅনাদি ছিলেন অনেক উচ্চে; দুই গুরুর আদেশনির্দেশ শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বকর্মের অব্যবহিত প্রধান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এক সঙ্গীতসাধনাই মানুষকে অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে, তদুপরি তাঁর স্কন্ধে চাপানো হল বিশ্বভারতীর 'সাহিত্য সভার' সম্পূর্ণ কর্মভার। ওইটিই ছিল সেকালে বিশ্বভারতীর মায় কলাভবনাদির বয়স্ক ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের সাহিত্যচর্চার একমাত্র মুক্ত, পাঞ্চজন্য প্রতিষ্ঠান। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকলে সর্বদাই এর অনুষ্ঠানাদির সভাপতিত্ব করতেন। একে তো অধিকাংশ আশ্রমবাসী, সহজেই অনুমেয় কারণে, গুরুদেবের সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠ করতে সংকোচ এমনকি কিঞ্চিৎ শঙ্কা অনুভব করতেন, তদুপরি গুরুদেবের নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, রুচিসম্মত পদ্ধতিতে সভার আয়োজন করা, পরবর্তী সভায় পূর্ব সভার সুষ্ঠু প্রতিবেদন রচনা করা যেকোনো আর্টস্ বিভাগের ছাত্রদের পক্ষেই নিঃসন্দেহে সুকঠিন কর্মরূপে বিবেচিত হত; এবং অনাদিদা ওই সময়ে যুগপৎ অভ্যাস করছেন শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, তদুপরি নবাগতদের সঙ্গীতে শিক্ষাদান, এবং স্বরলিপি রচনায় প্রচুর কালক্ষেপণ। ইতোমধ্যে যদি বাইরের কোনও কলেজ থেকে ক্রিকেট বা ফুটবল টিম খেলার নাম করে শান্তিনিকেতনের 'চিড়িয়াখানা' দেখতে আসত তখন অনাদিদার ওপরেই ভার পড়ত সন্ধ্যাবেলায় তাদের জন্য সঙ্গীতামোদের ব্যবস্থা করা।

অজাতশত্রু নিরীহ, স্বল্পভাষী এই লোকটির স্কন্ধে যে কতপ্রকারের গুরুভার বে-দরদ চাপানো হয়েছিল তার ফিরিস্তি তিনি, স্বয়ং, আজ আর দিতে পারবেন না।

হয়তো-বা আমিই সেই লাস্ট স্ট্র দ্যাট ব্রোক দি ক্যামেল্স্ ব্যাক!

তাই যদি হয়, তবে সে অপরাধের জন্য অংশত দায়ী শ্রীযুত অনাদি।

অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই এস্থলে বলে রাখি, অনাদিদা'র রবীন্দ্রসঙ্গীতানুভূতি ও জ্ঞান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পটভূমিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ, সে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ বিবর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলিত স্বরলিপির মূল্যায়ন, সে-যুগে দিবান্ধ কলকাতাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রবর্তন— এর কোনওটা সম্বন্ধেই আমার মতামত প্রকাশ করাটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। বাইরের থেকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, সর্বশেষের কর্মটি করতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর তিক্ততা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, রুচিহীনের সদম্ভ প্রলাপ এবং উপদেশ, একাধিক স্থলে বাধ্য হয়ে 'ভঁয়সকে সামনে বীণ্ বাজানো' অর্থাৎ সুর-কালা প্যাঁচাগলা মুর্গি-মগজ 'কলচর'-লোভিনী বিত্তবান-নন্দিনীকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার বন্ধ্যাগমন (শেষোক্তটি অনাদিদা'র জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখে শোনা) ইত্যাদি নানাপ্রকারের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল। যে নম্রস্বভাব স্বল্পভাষী তরুণকে প্রায় 'মুখচোরা' বলা যেতে পারে, তাঁর ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত জনের পক্ষে প্রশংসনীয়, নবীন পন্থা নির্মাণকারীর পক্ষে নিন্দনীয় একটি অপরিবর্তনীয় স্বভাব— তর্কাতর্কির প্রতি প্রকৃতিগত সহজ অনীহা, কিন্তু প্রচুরতম সহিষ্ণুতা মিশ্রিত। সহিষ্ণুতা মিশ্রিত ধৈর্যকে কুরান শরিফ এক শব্দে বলেন 'সব্‌র্' যার থেকে বাংলা 'সবুর্' সুদ্ধমাত্র অপেক্ষা করা,

www.pathagar.com

স্থূল-বিশেষ ধৈর্য ধারণ করা অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাতালা অগণিতবার তাঁর প্রেরিত পুরুষকে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি 'সব্‌র্' করতে আদেশ দিয়েছেন। অনাদিদেব অকৃপণ হস্তে এই মহৎ গুণটি অনাদিদা'র ওপর বর্ষণ করেছিলেন।

এসব গুণ নির্ণয় আমার পক্ষে ধৃষ্টতা— কিন্তু অনাদিদা'র অফুরন্ত 'সব্‌র্'ই আমার ভরসা। কারণ তিনি শব্দার্থে, ভাবার্থে, সর্বার্থে ছিলেন আমার গার্জেন, এখনও তাঁকে গার্জেনরূপেই মানি। আমি স্থির প্রত্যয়, তিনি আমাকে কখনও বর্জন করতে পারবেন না। আমি পাষণ্ডতর আচরণ করলেও। তাঁর স্নেহ আমার নিকৃষ্ট রচনাকে আদরের চোখে দেখে।

একে বাঙাল— খাজা বাঙাল— তদুপরি বাচাল, সর্বোপরি সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত মহিলা মিশ্রিত ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া বাবদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বয়স ষোলো বছর হয়-কি-না-হয়, চঞ্চল প্রকৃতির মুসলমান ছেলের পক্ষে সে বাতাবরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎকট সংকট, বিভীষিকাময় খণ্ড প্রলয় থেকে তাকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন, প্রথম দিন থেকেই; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সম্ভ্রান্তবংশজাত অতি সহজ আড়ম্বরহীন আচরণ দ্বারা, পথ-নির্দেশ করেন সামান্যতম নিতান্তই অবর্জনীয় দু চারটি শব্দ দ্বারা— অনাদিদা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার গার্জেন। তাঁর শান্ত সমাহিত আচরণ সংযতবাক্ দিকনির্দেশ আমাকে প্রথমদিনই মুগ্ধ করেছিল, তিনি তাবৎ ছাত্রদের মধ্যমণিরূপে কতখানি সম্মানিত— সে সত্য নির্ধারণ করতে আমাকে আশ্রম পরিক্রমা করতে হয়নি— এদের মধ্যে আছেন আশ্রমপালিত লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীযুত প্রমথনাথ, পাণ্ডিত্য তথা রসময় সর্বরচনপদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত বাগ্‌বিদগ্ধ গোস্বামীগৌরব শ্রীযুত পরিমল, অহরহ চটুল হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত শ্রীযুত অনিলকুমার, প্রসিদ্ধ চিত্রকর সত্যেনদা, বিনোদবিহারী, সিংহলাগত কিশোর শ্রমণ শরণাঙ্কর সাধু, একাধিক ভাষায় অগ্রগামিনী এবং স্বল্পকাল মধ্যেই নৃত্যকুশলীরূপে সুপরিচিতা শ্রীমতী হটীসিং (ঠাকুর), সর্বসঙ্গীত প্রচেষ্টায় অনাদিদা'র প্রীতিময়ী সহচারিণী রমা মজুমদার... কিন্তু এ নির্ঘণ্ট অফুরন্ত। স্বয়ং গুরুদেব, দিনেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁকে শুধু যে অশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে তিনি যে রবিসঙ্গীতের ভাণ্ডারী, কার্যত সেটা বারবার স্বীকার করেছেন তাই নয়— আমার মনে হয়, শিষ্যকে গুরু যে স্বীকৃতি যে সম্মান দিতে পারেন অনাদিকুমার পেয়েছিলেন সেটি পরিপূর্ণমাত্রায়। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনও শিষ্য গুরুপদপ্রান্ত থেকে এতখানি সম্মান আহরণ করতে পারেননি।

কিন্তু আজ যতই প্রাচীন দিনের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরি ততই মনে হয়, এসব কারণ তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রতিদিন গভীরতর করেছে বটে কিন্তু তিনি আমার গার্জেন ছিলেন একেবারে অকারণে, আমি তাঁর প্রথম আদেশই দ্বিধাহীন চিত্তে কেন পালন করেছিলুম তার কারণ অনুসন্ধান করার কোনও প্রয়োজন আমি কস্মিনকালেও অনুভব করিনি। বাহান্ন বৎসর পর আজও তিনি আমার গার্জেন। কারণ অনুসন্ধান করে আমার কোন মোক্ষলাভ হবে? এই বৃদ্ধ বয়সে আমি গার্জেনহীন হতে চাইনে।

ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মরহুম শেখ মুহম্মদ মুস্তাফা অল-মরাগি

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ওস্তাদ অল-মরাগি দেহত্যাগ করিয়াছেন। চীন, মালয়, ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য লইয়া একদিকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত, অন্যদিকে তুর্কি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রিস, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি বল্কানদেশ ও রুশ, আফ্রিকার নানা প্রদেশ এমনকি আরব সাগরের মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ হইতে বহু মুসলমান ছাত্র অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। তাহাদের জন্য ছাত্রাবাস আছে; ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ বাসস্থান ও অন্যান্য বন্দোবস্ত আছে।

অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না। পৃথিবীর যেকোনো বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ইহার বয়স অন্তত তিনশত চারিশত বৎসর বেশি। ইয়োরোপে যখন বর্বর, অন্ধকার মধ্যযুগ তখন অজহরের বিদ্যায়তন গ্রিক দর্শনের আরবি তর্জমা বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও চীন বাদ দিলে সে যুগে অজহরই ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভূ-ভাগের শিক্ষাকেন্দ্র। দমস্কস ও বাগদাদে পণ্ডিতরা যে জ্ঞান-চর্চা করিয়াছিলেন, তাহা কেন্দ্রীভূত হয় কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পরবর্তী যুগে সেই অজহরের প্রচলিত ইবনে রুশদের (লাতিন ও বর্তমান ইয়োরোপীয় ভাষায় আভেরস নামে খ্যাত) দর্শন লাতিন তর্জমাযোগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ইয়োরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৃষ্ণার সৃষ্টি করেন ইবনে রুশদ ও ইবনে সিনা (আভিচেন্না বা আভিসেনা)। ইঁহাদের দৌত্যে ইয়োরোপ আপনার গ্রিক-দর্শন আবার ফিরিয়া পায়। তখনই প্রথম লাতিনে গ্রিক দর্শন, আয়ুর্বেদের অনুবাদ হইল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ছেলেরা যে গাউন পরে, তাহা অজহরের নকলে। মধ্যযুগে নিঃস্ব বিদ্যার্থীরা এই বিরাট গাউন বা 'আবার' দ্বারা ছিন্নবস্ত্র ঢাকিয়া বিদ্যায়তনে উপস্থিত হইত।

এক হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ফি-সবিলিল্লা (অর্থাৎ 'আল্লার পথে', দান-খয়রাতের ধর্মপথে) হিসাবে অজহরকে জমিজমা অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। সে সম্পত্তির আয় এখন প্রচুর, কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা তদপেক্ষা প্রচুর। তবু অজহর কোনও ছাত্রের নিকট হইতে অর্থ (ফিজ্) গ্রহণ করে না, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বাসস্থান দেয় ও প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক তিন হইতে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দেয়। তাহারই জোরে নিতান্ত কপর্দকহীন ছাত্র দুই-তিনজনে মিলিয়া ক্ষুদ্র মেস করিয়া ও গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ আটা-আলু আলাইয়া দিন গুজরান করিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে যখন বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, যখন ধন না থাকিলে তোমার বিদ্যায় অধিকার নাই, যখন ধন থাকিলে তুমি হেলাফেলায় বিদ্যায়তনের আবহাওয়া মর্জিমাফিক বিষাক্ত করিতে পার, তখনও অজহর বিশ্বাস করে যে, বিদ্যায় সকলের সমান অধিকার! যেকোনো ছাত্র, যে কোনও দেশ হইতেই হউক অজহরে উপস্থিত হইয়া তাহার অতি অল্প আরবি জ্ঞান দেখাইতে পারিলেই বিদ্যায়তনে ভর্তি হইতে পারে ও বরাদ্দ দক্ষিণা পায়। পূর্বে অ-মুসলমান ছেলেদেরও লওয়া হইত, কিন্তু শুনিয়াছি, কয়েকটি ক্রিশ্চান পাদ্রি ছাত্র ধর্মশিক্ষার ভান করিয়া নানা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া এমন কাণ্ড করিলেন যে ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত অজহর তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিল,

www.pathagar.com

কে জানে, কোনদিন তাঁহাদের 'প্রটেকশনে'র প্রয়োজন হইবে। এই আফ্রিকার আরেক অংশেই তো সেদিন এক নিগ্রোকে বলিতে শুনিলাম, ইয়োরোপীয়রা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসিল, তখন তাহাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। এখন অজহরের তুলনা করা ভুল হইবে।

অজহরের ছাত্ররা ধর্মশাস্ত্র পড়ে। সম্প্রতি ইংরেজি ফরাসি ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সর্বাপেক্ষা অভ্রভেদী নেশা খবরের কাগজ পড়ার। সকালে যে কোনও ক্লাসে প্রবেশ করুন না কেন, দেখিবেন শতকরা ত্রিশটি ছেলে আপন আপন খবরের কাগজ নিবিষ্ট মনে পড়িতেছে। এদিকে পড়িতেছে তেরোশত বৎসরের পুরনো শাস্ত্র ওদিকে দুনিয়ার হালচালের প্রতি চড়া নজর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের টোল বা মাদ্রাসার নিরীহ শান্ত ছাত্রদের সঙ্গে অজহরের তুলনা করা ভুল হইবে।

কাইরোতে আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; একটি মিশর সরকার চালান (অজহর নিজের সম্পত্তিতে চলে) ও অন্যটি মার্কিনরা। এই দুইটি আমাদের কলিকাতা-ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হরেকরকম্বা করে।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে অজহর পয়লা নম্বর।

সাইবেরিয়া হইতে জিব্রাল্টার পর্যন্ত শেখ অল-মরাগির শিষ্যেরা শোকাতুর হইবেন। অনুমান করি, অন্তত ছয় মাস ধরিয়া তার-চিঠি, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা, শেখের জীবনী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশে হইতে নানা ভাষায় কাইরোর দিকে প্রবাহিত হইবে ও শেখের পূতজীবন ও অপূর্ব প্রতিভা বিশ্ব-মুসলিমকে কী প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবে।

অজহরের নিয়ম যে, যিনি প্রধান শেখ বা রেক্টর হইবেন, তাঁহার শুধু পণ্ডিত হইলেই চলিবে না, তাঁহার চরিত্র যেন অকলঙ্ক হয়। অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনাড়ম্বর ধর্মপরায়ণতার সম্মেলন শেখ অল-মরাগিতে ছিল বলিয়াই তাঁহার হাজার হাজার শিষ্যের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শেখের পাণ্ডিত্যের বিচার আজ করিব না। ধর্মভীরু বলিয়া তাঁহাকে অনিচ্ছায় রাজনীতিক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছিল। শেখ বিশ্বাস করিতেন যে, দেশে যখন অত্যাচার অবিচার চলে, তখন তাহারই একপার্শ্বে সঙ্গোপনে ধর্মচর্চা করিয়া অনাচারকে নীরবে স্বীকার করিয়া লওয়া অধর্ম, পাপ। তাই যখন বিদেশি শক্তির চাপে পড়িয়া মিশরের রাজা ফুয়াদ ওয়াফদ দলকে তাড়াইয়া প্রচলিত শাসনবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বিদকি পাশাকে 'চোটা মুসোলিনি' কায়দায় (তখনও হিটলার আসর জমাইতে পারেন নাই) ডিক্টেটর বানাইলেন ও স্বিদকি সদম্ভে প্রচার করিলেন যে তিনি 'বজ্র-বাহু দ্বারা মিশর শাসন করিবেন,' তখন শেখ অল-মরাগি নির্ভীক বলদৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বিদকির প্ররোচনায় রাজা শেখকে হুকুম দিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য আশিজন ওয়াফদহিতৈষী অধ্যাপককে যেন বরখাস্ত করা হয়। শেখ উত্তর দিলেন যে, অধ্যাপকেরা ওয়াফদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ধর্মাচরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহাদিগকে শাস্তি দেবার কোনও কথাই উঠিতে পারে না। স্বিদকির প্ররোচনার রাজা অটল; বিদেশি শক্তিও অজহরের মেরুদণ্ড ভাঙিতে পণ করিয়াছে।

www.pathagar.com

শেখ পদত্যাগ করিলেন। তামাম মধ্যপ্রাচ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, রাজা শেখের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন কী করিয়া।

স্বিদকি তাঁহারই এক ক্রীড়নককে অজহরের শেখ নিযুক্ত করিলেন— কোনও ধর্মভীরু পণ্ডিতই তখন স্বিদকির পদলেহন করিতে সম্মত হন নাই। নতুন শেখ আশিজন দেশমান্য অধ্যাপককে পদচ্যুত করিলেন। অজহরের হাজার বৎসরের ইতিহাসে ওই একমাত্র মর্কট সিংহাসনে বসিয়াছিল।

তার পর অজহরের ছাত্রেরা যে কাণ্ড করিল, তাহা স্বিদকি সম্প্রদায়ের চিরকাল মনে থাকিবে। ট্রাম জ্বালাইয়া, বাস পোড়াইয়া, বোমা ফাটাইয়া স্বিদকির স্বাধিকার প্রমত্ততাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিল। বাঙালি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে, সা'দ জগলুল পাশার আমলে হইতে আজ পর্যন্ত মিশরে যত রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতে নেতা ও কর্মীর অধিকাংশ অজহরি। তাঁহাদের জাল মিশরের সর্বত্র ছড়ানো। তুলনাস্থলে ১৯২০-এর খেলাফত আন্দোলনের একাগ্রতা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেই।

স্বিদকির মেরুদণ্ড ভাঙিল। আন্দোলনের শেষদিকে তাহার দক্ষিণহস্তে সেই দম্ভকর বজ্রবাহুতে পক্ষাঘাত হইল। মিশরি পরম সন্তোষের সঙ্গে বলিল— 'আল্লা-হু-আকবর'। বিদেশি শক্তি ম্রিয়মাণ। রাজার চেতনা হইল। ওয়াফদকে আবার ডাকা হইল।

অজহরের ছাত্রেরা পরমানন্দে শেখ অল-মরাগিকে অজহরে ফিরাইয়া আনিতে গেল। শেখ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যে দেশের রাজা বিদেশির ক্রীড়নক হইয়া গণ্যমান্য দেশপ্রিয় অধ্যাপকদের লাঞ্ছনা করে, তাহার অধীনে কর্ম করার মতো বিড়ম্বনা আর কিছু নাই। ছাত্রেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু শেখ অটল। তখন তাহারা শেখের অন্ধ বৃদ্ধ গুরুর দ্বারস্থ হইল। তিনি বলিলেন, 'শেখকে গিয়া বল আমি বৃদ্ধ, মৃত্যুর সম্মুখীন, কিন্তু এমন কোনও পুণ্য করিতে পারি নাই যে, জিন্নতের (স্বর্গের) আশা করিতে পারি। আমার একমাত্র ভরসা যে, মরাগির মতো শিষ্য আমার কাছে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যদি কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন, তবে জিন্নতে যাইবার আমার শেষ আশা বিলীন হইবে।'

শেখ অল-মরাগি তৎক্ষণাৎ গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়াছিলেন।

শেখের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার কতটুকু গ্রহণ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় জগৎকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণ অসম্ভব অথচ ইয়োরোপের জড়বাদের তাণ্ডবলীলা তাহার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে দেশে প্রবর্তন করার অর্থ দীন-দুনিয়ার সর্বনাশ।

মনে পড়িতেছে, প্রশ্ন উঠিয়াছিল রেডিয়োতে কুরানপাঠ শাস্ত্রসম্মত কি না। উগ্রপন্থিরা বলিলেন, রেডিয়োর প্রচুর চলতি শুঁড়িখানা ও বেশ্যালয়ে। সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততার আবহাওয়ায় কুরানপাঠ কুরানের অবমাননা! শেষ ফতোয়া দিয়াছিলেন, শেখ অল-মরাগি। তিনি বলিলেন, 'ধার্মিকের গৃহে কুরানপাঠ অহরহ হইতেছে। কিন্তু আমি চাই কুরান যেন সর্বত্র পৌঁছে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাপী তো কুরান শুনিতে ধার্মিকের দ্বারস্থ হয় না। সুরাসক্ত

www.pathagar.com

যদি অনিচ্ছায়ও একদিন রেডিয়োতে কুরান পাঠ শুনিয়া বিচলিত হয়, ধর্মপথে চলিবার তাহার বাসনা হয়, তবে বেতার ধন্য হইবে।'

এই হিমালয়ের ন্যায় বিরাট পণ্ডিতের কথা যখন ভাবি, তখন মনে পড়ে তাঁহার ব্যবহারের জন্য শেখ সেই গাড়ি চড়িয়া দূর আবদিন প্রাসাদে যাইতেন রাজার সঙ্গে দেখা করিতে। সেই সময়ে মোটর ভ্রমণেচ্ছুক ছেলেরা, বিশেষত গ্রাম্যরা শেখের অফিসের সামনে ঝামেলা লাগাইত। শেখ গাড়িতে উঠিয়া ছেলেদের ডাকিয়া যেন নৌকাতে কাঁঠাল বোঝাই করিতেন। কাহাকেও বাদ দিবার ইচ্ছা শেখের নাই অথচ গাড়ি যত বিরাটই হউক, সে তো গাড়ি। দামি রোলস বটে (এক ধর্মপ্রাণ শেখের ব্যবহারার্থ অজহরকে ভেট দিয়েছিলেন) কিন্তু শেখের আপসোসের অন্ত নাই যে, যথেষ্ট পরিমাণে প্রশস্ত নহে।

আবদিন প্রাসাদের সম্মুখে ছেলেরা নামিয়া যাইত। শেখ পই পই করিয়া আদেশ করিতেন, কেউ যেন ছিটকাইয়া না পড়ে; তিনি যাইবেন আর আসিবেন। তার পর দশবার করিয়া গুনিতেন কয়টি ছেলে আসিয়াছে ও দশবার করিয়া সে আদমশুমারি ভুলিয়া যাইতেন।

রাজাকে সৎপথে চলিবার উপদেশান্তে শেখ বাহির হইয়া সেই একপাল ব্যাঙকে এক ঝুড়িতে পুরিবার চেষ্টা করিতেন। কেউ এ কাফেতে ঢুকিয়াছে, কেউ ওই দোকানে গুম হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিবার পথে শেখের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কেউ বাদ পড়িয়া যায় নাই তো, ড্রাইভারের আশ্বাসবাক্য কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। বারে বারে বলিতেন, গাড়ি যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতেছে।

সেই শেখ জিন্নতবাসী হইলেন। আল্লাতালা তাঁহার আত্মাকে নিজের কাছে ফিরাইয়া লইয়াছেন। 'নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি ও অবশ্যই আমরা তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইব।'

আনন্দবাজার পত্রিকা ২.৯.১৯৪৫

পল্‌ডি

আমাদের দেশে কালিদাস সম্বন্ধে যেসব গল্প চলতি আছে, তার অনেকগুলোই তাঁর প্রথম যৌবনের হাবামি নিয়ে। উত্তর ভারতেও নিরেট হাবামির গল্প বানানো হলে সেগুলো সাধারণত শেখ চিল্লির ঘাড়ে চাপানো হয়। (এর উল্টো দিকও আছে— চালাকির গল্প বলতে হলে আমরা সেটা গোপালভাঁড়ের কাঁধে চাপাই)। এই করে করে কোনও কোনও দেশে অজ মূর্খামি অথবা মারাত্মক ফন্দিবাজির গল্পগুলো কোনও এক বিশেষ কল্পনামূলক বা সত্যিকার চরিত্রের চতুর্দিকে জড়ো হয়।

জর্মনিতে নিরেট হাবামির গল্পগুলো জমেছে পল্‌ডি নামক মাহাখানদানি, পয়সাওয়ালা এক হস্তিমুর্খের চতুর্দিকে। পল্‌ডির সবিশেষ পরিচয় দেবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু

www.pathagar.com

বললেই যথেষ্ট হবে লোকটি অষ্টপ্রহর ফিট-ফট্টিনাইন, দুনিয়ার তাবৎ লোকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম এবং তার ব্রেন-বক্সে কিছু আছে কি না সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন। গুণের মধ্যে দেখা যায়, পল্‌ডি অত্যন্ত সহৃদয় এবং খাঁটি খানদানি মনিষ্যির মতো পাঁচজনকে আপ্যায়িত করবার জন্য তার চেষ্টা-ত্রুটির অন্ত নেই।

পল্‌ডির বাকি পরিচয় পাঠক নিচের লেখাগুলো থেকে পাবেন।

'সে কী পল্‌ডি, আমাকে এখনও চিনতে পারছিসনে? স্কুলে তোরই পাশে এক বেঞ্চিতে বসতুম যে!'

'মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। স্কুলে আমার পাশে ওরকম লম্বা দাড়িওয়ালা কেউ বসত না।'

*

'সে কী পল্‌ডি, আপনি দাঁড়কাক পুষেছেন কেন?'

'সত্যি বলব? আমি হাতেনাতে দেখতে চাই, এই যে লোকে বলে দাঁড়কাক তিন'শ বছর বাঁচে কথাটা সত্যি কি না।'

*

'হাঁ হাঁ, ঠিক বুঝেছি কাপ্তেন সায়েব। আপনার কম্পাস সবসময় উত্তর দিক দেখিয়ে দেয়। কিন্তু মনে করুন আপনি যদি আর কোনও দিকে যেতে চান, তা হলে কী করেন?'

*

অধ্যাপক— 'এখন আপনাদের যে তারাগুলো দেখাব তাদের আলো পৃথিবীতে আসতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।'

পল্‌ডি (নেপথ্যে)— 'আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না? আমরা আটটার সময় খানা খাই।'

*

'আমার রিটর্ন টিকিট চাই।'

'কোথাকার?'

'কী মুশকিল! এখানে ফেরবার।'

*

'এই যে পল্‌ডি, সুখবর শুনুন, আজ সকালে আমি ঠাকুরমা হলুম।'

'কী যে বলেন। আর এরি মধ্যে দিব্যি চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন!'

*

পল্‌ডি— 'ওই যে দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন, ওইখানে আমার জন্ম হয়। আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?'

টুরিস্ট— 'হাসপাতালে।'

পল্‌ডি— 'কী ভয়ানক। কেন, আপনার কী হয়েছিল?'

আনন্দবাজার পত্রিকা

www.pathagar.com

উমেদারি

জনাব সহযোগী সম্পাদক মহাশয়,

কদম্-মবারকেষু,

মহাত্মন!

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সম্পাদক মহাশয়ের পরিবর্তে এ পত্র তস্য সহযোগীর উদ্দেশে প্রেরণ করা সখৎ বে-আদবি। কিন্তু আপনি স্বয়ং বিসমিল্লাতেই গলদ করে বসে আছেন বলে আমাকেও বাধ্য হয়ে এই প্রোতকল-বিরুদ্ধ অনাচার করতে হল।

আপনি উত্তমরূপেই জানেন, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে জানেন, আমার জীবনের সর্বোচ্চাশা, কোনও একটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়া— তা সে আজেবাজে মার্কা লন্ডন-টাইমস্-ই হোক, কিংবা তখ্ৎ-ই-তাউস-কম্ কুৎব্‌মিনাররূপী 'কালি ও কলম'ই হোক। অতএব আমার জিগর-কলিজার চিল-চেল্লানির ফরিয়াদ, আমাকে সম্পাদক পদটি দিলেন না কেন?

প্রত্যহ ক্রমিক বেকারির দাওয়াই কর্মখালির বিজ্ঞাপন চা-পানান্তে রকে বসে সেবন করি— সে-ও আপনার মতো হর-ফন্-মৌলা হুনুরি জনের অজানা নয়। কই, কোনও কাগজে তো আপনার কাগজের জন্য 'সম্পাদক প্রয়োজন' এমত বিজ্ঞাপন দেখিনি। আপনি আরও জানেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ভ্যাকেন্সির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়— তা সে কেরানির চাকরিই হোক আর লক্ষ লক্ষ চাকরি যে মহারাজ দেন তাঁর চাকরিই হোক!

বলতে হবে না, বলতে হবে না! আমি জানি, আপনি বলবেন, 'কিন্তু আখেরে চাকরিটি পায় কে? আপনি পান? আমি পাই? স্বপনকুমার পায়? আসলে কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ব্যাপারে গাফিলি করেন; বিজ্ঞাপন দেবার সময় চাকরিটা যাকে দেবেন তার ফটোগ্রাফ সঙ্গে ছপিয়ে যদি ঘোষণা করেন, 'None need apply whose photograph does not resemble this!' তা হলেই সর্ব ঝামেলা চুকে যায়।

বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। ক-সের ধানে ক-সের চাল— সরি, বলা উচিত ক-সের গম নিলে ক-সের চাল পাবে, কিংবা কটা লুপ্ নিলে কটা বউ পাবে— এসব কাশীমিত্তির নিমতলা আমি চিনি, মুসলমানের ব্যাটা হয়েও। মামদোর উপর ব্রহ্মদত্যি!

আমি আপনাকে সোজাসুজি— বাড়িতে না থাকলে 'লটকাইয়া লটকাইয়া' নোটিস দিলুম, আমি অডিটার জেনরেল, এনফরস্‌মেন্ট ব্রাঞ্চ, ইনকাম ট্র্যাক্স সব্বাইকে আপনার কীর্তি জানিয়ে উড়ো চিঠি লিখব; তখন বুঝবেন ঠ্যালা কারে কয়। ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

'মস্‌তান' 'মস্‌তানি' 'মস্‌তানগিরি' শব্দগুলো চেনেন? ওই যে সিদিনা ছুঁচলো গোঁপ, ছুঁচলো জুতো, ছুঁচলো পাতলুন গয়রহ সমন্বিত গোটাকয়েক ছোঁড়া এসে পুজোর চাঁদা চাইলে— যেভাবে আপনার দিকে চেয়ে 'চাইলে', তাতে আপনি বাপ্পো বাপ্পো করে টাকা দিতে দিতে ইষ্টনাম স্মরণ করলেন না (কত খসল?)? মনে মনে আন্দেশা করলেন না, বড় আহাম্মুখী হয়ে গিয়েছে ঢাকা বারান্দায় ট্যুব লম্পটি লাগিয়ে। ওটা গেল। ওরা যদি সন্তুষ্ট না হয়।... কালই দেখতে হবে, বাজারে গডরেজ ইস্পাতের বাল্‌ব্ হয় কি না!

www.pathagar.com

এই হল গে মস্‌তানি— বাঙলা ভাষায় বাঙলা কথা।

কিন্তু শব্দটা যাবনিক। অর্থাৎ এর ওপর আপনার চেয়ে আমার হক ঢের ঢের বেশি। তদুপরি আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, আমার 'বন্‌নো'টি আর না বললুম, ওই সামনে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা— মা-আমার অধমের বন্‌নো পেলে জেল্লাই টেকরাতেন।

শব্দটির বহর দেখুন! Drunk, intoxicated, libidinous= কামোন্মাদ; Iustful, wanton, furious; an animal in rut = ভাদ্রমাসীয় সারমেয়, excessively drunk and polluted with neat wine = দ্বন্দ্বটা লক্ষ করুন! মদটা উত্তম শ্রেণির (বা নির্জলা) কিন্তু অস্থলে পড়ে বেবাক নোংরা করল (গোমূত্র পবিত্র, কিন্তু দুধে পড়লে— তুলনীয়), intoxicated with the wine of rashness = কাচের দোকানে পাগলা ষাঁড়, ইত্যাদি ইত্যাদি আরও বিস্তর আছে।

ধন্য, ধন্য যিনি এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়েছেন! পাড়ার মস্তানদের কোনও গুণ এতে অবহেলিত হয়নি, বড় তামাকের কল্‌কে পেয়েছে। 'ভূমা' 'খল্বিদং' ইত্যাদি ডাঁট ডাঁট শব্দ এঁয়ার কাছেই আসতে পারে না।

তারই দোহাই কেড়ে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি :

আমাকে পত্রপাঠ সহযোগী অসহযোগী— অনারারি হলেও কণামাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু খবরদার, সেস্থলে সেটা যেন পারমেনেন্ট হয়— কোনও একটা সম্পাদক যদি না করেন তবে ওই কথাই রইল! আপনার ট্যুব লম্পোটির প্রতি আমার কিঞ্চিৎমাত্র জুগুপ্সা নেই। আমি দেখে নেব, আপনি কী করে যজমান বাড়িতে আতপ চাল আর কাঁচকলা পান— যার ওপরে ভরোসাঁ কর্‌কে কার্‌ওয়ার বৈঠিয়েছেন অর্থাৎ 'কালি' ও 'কলম' যোগাড় করেছেন। পয়সায় তিনটে বাগচীর 'কালি' 'বড়ি' আর খাগড়ার 'কলম' তো।

তা বেশ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখবেন, ওই 'কালি ও কলমে'র হাফ হিস্যেদার আমি। 'কালি' না হয় আশু-প্রত্যাশিত মা কালীর চর্মনির্যাস হতে পারে কিন্তু 'কলম'* শব্দটি আরবি, যাবনিক। আরব নবী হজরত ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তাই বোধহয় আল্লাপাক কুরান শরিফে বাণী দিয়েছেন তাঁকে (আল্লাকে) স্মরণ করে আবৃত্তি কর, তিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন।... আপনার পত্রিকার নামকরণের ওক্‌তে কলমকে স্মরণ করে আপনি আল্লা নির্দেশিত পথেই যাত্রারম্ভ করেছেন!

এ দৃশ্য দেখে গুণীজ্ঞানীরা বিস্মিত হবেন না। ভবিষ্য পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশে নাকি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 'কলিযুগস্য লক্ষণম্ কিং?'— থাক্ সংস্কৃত। মোদ্দা : কলিযুগে 'ব্রাহ্মণে যবনাচরণ করবে, আর যবন আর্যশাস্ত্র রচনা করবে।'

আপনার পথ আপনি বেছে নিয়েছেন; আম্মো অধুনা গৌড়ভূমে যে নব্যন্যায় সৃষ্ট হয় তারই অনুকরণে একখণ্ড উপাদেয় 'নব্যস্মৃতি' লিখেছি। আপনার শুভবুদ্ধি যদি আমাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে ভূম্যাসনও দেয় তবে মল্লিখিত সেই 'স্মৃতিশাস্ত্র' কালি ও কলম মারফত তাবল্লোকে শনৈঃ শনৈঃ প্রচারিত হবে। এই সুবাদে কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদ সার্‌ভ্ করছি (ফরাসি

* যদ্যপি কেউ কেউ বলেন ওটা নাকি মূলে গ্রিক।

www.pathagar.com

মেনু-তে যে আইটিম্ 'অর্ দ্য ভ্র্ hors d-oeuvre' নামে সুপরিচিত); যেহেতু অর্বাচীন গৌড়সন্তান যাবনিক উপাহারলয়ে তথা ভোজন হর্ম্যে পূর্বাভিজ্ঞতানটনবশত বংশারণ্যে ডোম্বান্ধের ন্যায় আচরণ করত হাস্যাস্পদ হয়, সেহেতু মদ্গ্রন্থে 'ফিরপোতে হবিষ্যান্ন' নামক একটি বিশেষ উল্লাস আছে, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ কল্লোলে। কোন কোন তিথিনক্ষত্রে ফিরপো গমনে যাত্রা শুভ তথা যাত্রা নাস্তি একাদশীতে তথায় ষণ্ডপুচ্ছযশ সেবন অবিধেয় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি তাবৎ জটিল জটিল সমস্যার নিঘণ্টু তথা দফে দফে সবিস্তর বর্ণন অধমাধমের নব্যস্মৃতিতে যাবনিক সংস্কৃতে আলেকজানদ্রিয়ান ছন্দে গ্রন্থিত আছে। একাধিক আই সি এস কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। তাঁরা অবশ্য তাঁদের যবন পূর্বসূরিগণ কর্তৃক স্থাপিত প্রথা অনুযায়ী যথারীতি পুস্তক না পড়েই প্রশংসাপত্র দিয়েছেন কিন্তু এস্থলে পাণ্ডুলিপি পূর্বাহ্নে অনধীত থাকাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি— 'দি ক্যারাভান (চালিয়াতি উচ্চারণ কারাভাঁ) পাসেজ'— কাফেলা অগ্রগামী। ইতোমধ্যে আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামী বিটলানন্দ (বিটেল নয়, Beatle) ও শ্রীদিদি স্বপ্নযোগে পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করত আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মার্কিন বিটল সম্প্রদায়ের জন্য 'মারিযোয়ানা' হশিশ-ভাঙ-চণ্ডু ইত্যাদি মিশ্রিত 'পঞ্চরঙ' (এটিই প্রকৃত অকৃত্রিম বস্তু— 'পঞ্চরসের' অনুকরণে নির্মিত 'Punch' নিরেস, নীরস ভেজাল) এবং বিশেষ করে 'মার্তণ্ড-তাপিত-বকযন্ত্রোদ্গীর্ণ-ঋর্জুর-নির্যাস'— শাহ্-ইন-শাহ জহাঁগিরের সুপ্রিয় পেয় 'ডব্‌ল ডেস্‌টিল্‌ড্-এরেক্' এই মহা-কারণবারিরই শ্বেতাঙ্গ দত্ত অভিধা— কী প্রকারে কোন শুভলগ্নে পান বিধেয় সবিস্তারে এ তাবৎ শ্লোকবদ্ধরূপে গ্রথিত আছে।— সহজে প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘোর সত্য যে যুক্তফ্রন্টের কমন-ইস্ট তথা প্রতিপক্ষ উভয় সম্প্রদায়ই এ স্মৃতি সোল্লাসে কামনা করেছেন। বাসনা ধরেন, খবরই প্রসাদাৎ বিধান, ফতোয়া, ফরতা প্রয়োগ করত একে অন্যকে স্মৃতিভ্রষ্ট জাতিচ্যুত করতে সক্ষম হবেন। আমেন— যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ!

সম্পাদকতার পরিবর্তে এই দেবদুর্লভ গ্রন্থের কপিরাইট অতীব সুলভ। দ্যাখতোনাদ্যাখ আপনাদের বাক্-সাহিত্য তামাম বেঙ্গলকে তাক লাগিয়ে অবাক সাহিত্যে পরিণত হবে! বাঙলা কোন ছার, আপনি 'হেলায় লঙ্কা করিবা জয়'।

এইবারে বলুন, শুধু মস্তানিই করি? উদারার খাদেও চড়াকসে নামতে জানি।

* * *

কিন্তু, যাই-বলি-যাই-কই, কিন্তুক ব্যাকরণে একটা বিভীষণ ভুল করে বসে আছি আমি। সেটাকে আমার ওয়াটারলু পানিপথ গাল্‌লিপলি আপনার প্রাণ যা চায় তাই তুলে বেইজ্জত করতে পারেন। আমার মন নির্দ্বন্দ্ব ছিল, আপনি আপনার পেটুয়া কাকা মামা শালাদের কাউকে দুম্ করে সম্পাদকের দিওয়ান-ই-খাস-এর সন্‌গ্-ই-মর্‌মর্ তখতে বসিয়ে দেবেন। ও হরি! কোথায় কী? বসিয়ে দিয়েছেন বিদগ্ধ ভদ্র কুলীন সন্তান মিত্রজ শ্রীযুত বিমল মহোদয়কে। সর্বনাশ! আমার। আপনার তো সর্বরক্ষা! এ যে আমার কুল্লে ফরিয়াদের কী বেহ্দ্ মুখ-তোড় জবাব তার জবাব কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। 'কালির' উপর বিমল! সোনার পাথর বাটি আপনিই সব্বপয়লা গড়লেন। কালি সরোবরে বিমল হংসকে ছেড়ে দিয়েছেন। কবীর (বেজোড়ের) বলেছেন, 'বিরল হংস'। 'ম' স্থলে 'র'। তা ওই ম র ম র ম রা করে করেই শ্রীবাল্মীকি রামচন্দ্র পেয়েছিলেন!

www.pathagar.com

কহাঁ আসমান কা সিতারা, ঔর কহাঁ— — — ! কোথায় আসমানের তারা আর কোথায় পাছার পাঁচড়া! কোথায় শ্রীবিমল আর কোথায় আমি!

সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি জমানো সর্বভূমিতেই সুকঠিন। কঠিনতম গুজরাত মারওয়াড়ে। ঝাড়া দশটি বছর আমি তৎ তৎ অঞ্চলে বসবাস করেছি এবং লক্ষ করেছি ওইসব ভূমিতে 'সাহিত্যিক' নামক বস্তুটি কালোবাজারেও পাওয়া যায় না। অবশ্য শুনে তাক লেগে যাবে ওইসব অঞ্চলে কালোবাজার হেথাকার তুলনায় ঢের ঢের কম। সো কৈসন? উত্তরে সেই উর্দু প্রবাদটি স্মরণ করিয়ে দিই— 'মহল্লেকি রেণ্ডি মা বরাবর'= আপন মহল্লার বেশ্যা মায়ের মতো, অর্থাৎ, ঢলাঢলি করবি তো কর, কিন্তু আপন মহল্লাতে নয়। তাই ওদেশের মহাজনরা— উভয়ার্থে— আপন আপন জন্মভূমিকে কর্মভূমিতে পরিণত করেননি। ঐসি গতি সন্‌সারমেঁ। তা সে যাক। বলছিলুম কী, ওদেশে সাহিত্যিক বস্তুটি ডুমুরের ঠ্যাং। যদিস্যাৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ প্রাণীটি এদেশে দেখা দেয় তবে তাকে কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলে 'সাহিত্যিক ছে' অর্থাৎ 'ইনি সাহিত্যিক'। অন্য পক্ষ তখন মনে মনে বলছে 'বেচ্‌চারা! না জানি, বউ বাচ্চা ক মাস ধরে অনাহারে আছে!' এপক্ষ তখন গম্ভীরতম কণ্ঠে সুবে অহমদাবাদ-গুজরাত-সৌরাষ্ট্র-কচ্ছকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে বলে 'গের বাঁধ্যুছে!' অর্থাৎ 'ঘর বেঁধেছে?' 'কী বললে? কী কইলে? সুঁ ব্যোলা?' বরঞ্চ চিংড়ি মাছ হিমালয়ের চুড়োয় চড়ে আল্‌পস-চূড়া-প্রবাসিনী চিংড়িনীকে ডেকে তার সঙ্গে রসালাপ করতে পারে— সরু গলির এ-পার ও-পার যেরকম নিত্যি নিত্যি হয়— কিন্তু সাহিত্যিক আপন কামানো কড়ি দিয়ে বাড়ি বেঁধেছে! জয় প্রভু পরস্‌নাথ!

বিমলবাবু কড়ি দিয়ে কী কী কিনেছেন বলেননি। দাদখানি বেল মশুরির তেল থেকে শুরু করে নিশ্চয়ই 'গের'= ঘর = বাড়ি!

ওদিকে দেখুন, পাঠান মোগল ইংরেজকে তিনি কীরকম গুলে খেয়েছেন! শ্রীমিত্র হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাতে পারেননি— কে-ই বা পারে— কিন্তু তাঁরা ইতিহাস চর্চা বঙ্কিমের চেয়ে কম নয়। সে যুগের তুলনায় আজ লাইব্রেরিতে ফারসি ইতিহাস ঢের ঢের বেশি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, অর্বাচীনরা যখন ভেবেছিল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের জমানা খতম, 'সাত হাত মিট্টিকে নিচে' তখন শ্রীবিমল দেখিয়ে দিলেন, কোনও বিষয়বস্তু কোনও যুগ, কোনও জাঁর = genre-ই চিরতরে লোপ পায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস আজও লেখা যায়— ঈশপের গল্প পাঁচ হাজার বছর পরেও লেখা চলবে, কলমের জোর থাকলে।

ওই কলমের জোরটাই আমাকে নিধন করেছে, সহযোগী মশাই, ওই পোড়া কলমের জোর।

নইলে, স্মরণ করুন, কুবুদ্ধির তাড়নায় একদা আপনি স্বয়ং 'পঞ্চতন্ত্র' ছাপাননি? মহাত্মা বিষ্ণুশর্মার 'জাঁর' পৃথিবীর কোন দেশে অপরিচিত? এই শর্মাই বা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবে না কেন? কিন্তু আপনার-আমার জোড়া কপাল— দৈবের লিখন, আহা, খণ্ডাইতে সাধ্য কার— গর্দিশের গেরোতে গেরনে গেরাস করলে।... শুনলুম, বইখানা আপনার হাতছাড়া হয়েছে। তা হলে মৌলা আলির উদ্দেশে ব্রতোপবাস করে, সেখানে আচারাত চতুর্দশ শাক নিবেদন করত চলে যান সোজা কালীঘাটে। সেখানে কালী কেলকেত্তাওয়ালীর পদপঙ্কজে বিবি শিরনি ছড়িয়ে— এর সমূচহ বিধি বিধান 'নব্যস্মৃতি'তে পাবেন— 'ব্রহ্মময়ী মা, ব্রজযোগিনী মা' স্মরণ করতে করতে বাড়ি ফিরে পুজোপাটার বিশেষ বেশ গরদের ইজের-পাজামা ফের শিকের হাঁড়িতে রাখবেন। কারণ অধুনা 'তোমার বাহন যেটা, দুষ্ট সেই ইঁদুর ব্যাটা—'

www.pathagar.com

সোঁদর বনের বড়-মেঞার মুরশিদ, দক্ষিণ রায়ের ভ্রাতা গাজীপিরের ফির্‌পো প্রবেশ ছাড়পত্র ইভনিং-জ্যাকেট্‌টির নিকুচি করেছে!

* * *

কিন্তু এই ওয়াটারলুর সামনেও আমার একটি বক্তব্য আছে।

শ্রীবিমল ক'খানা বই লিখেছেন আমি জানিনে বলে লজ্জিত। কিন্তু তাঁর প্রত্যেক বই যেন অনার্‌জ্‌ সহ পাস সে তথ্য অজানা নয়! পক্ষান্তরে আমার চোদ্দটি সন্তান— আপনাদের প্রদত্ত 'গ্রেস' সত্ত্বেও— হারাধনের দশটি ছেলের 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে' কপপুর! সবকটা বিলকুল না-পাস।

তাই শ্রীবিমল better কোআলিফাইড!

এই তো আপনার বুদ্ধি!

চৌদ্দ ব্যাঙ্ক যে ডকে তুলেছে সে সন্ধি সুড়ুক বেশি জানে, না যে সগৌরবে বেশুমার ব্যাঙ্কের উন্নতি করেছে সে বেশি জানে? কালোবাজার, ট্রিপ্‌ল্‌ একাউন্ট রাখা, ব্যাঙ্কের টাকায় তেজিমন্দি খেলা, ইনকমট্যাক্স দেওয়া দূরের কথা তাদের কাছে রিলিফ রূপে দাদন চাওয়া— এসব না করতে পারলে আপনার সদ্য ভরা 'কালি' সাহারা হয়ে যাবে না, আপনার 'কলম' মুষলে পরিণত হয়ে যদুবংশ ধ্বংস করবে না! ঈশ্বর রক্ষতু!

তবু গাঁইগুঁই করছেন? অর্থাৎ, এটা বোঝার মতো এলেমও আপনার পেটে নেই। তা হলে মারি সেখানে বোমা!

এক বিশেষ সম্প্রদায়ের তালেবর ব্যবসায়ী ভাবী জামাতার সঙ্গে ব্যবসাতে বাবাজির তজরুবাহ্‌-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোন। উত্তর শুনে সোল্লাসে বললেন, 'ওয়াহ্‌, ওয়াহ্‌ বেটা জিতে রহো! ঔর ক্যা পুঁছু?— (আর কী শুধবো!) সাত দফে গণেশ উল্টায়া! কামাল্‌ কিয়া, কামাল্‌ কিয়া! বঢ়হিয়া দামাদ (জামাতা), উম্‌দা দামাদ্‌!'

এই 'কামাল্‌ কিয়া' শুনেই কাজী-কবি মুস্তফা কামালের উদ্দেশে গেয়েছিলেন, কামাল! তুনে 'কামাল কিয়া,' ভাই!

আমার নাম মুস্তফা নয়— বঙ্গসন্তান তবু আকছারই আমাকে ওই নামে চিঠি লেখেন, আমিও ওই নামের ধোঁকার টাটির পিছনে আশ্রয় নিই, পাওনাদারের হুনো খেয়ে—

আমার চ্যান্স দিন, স্যার, আমি আপনার কাগজের তরে কামালের আক্‌মল্‌ করে ছাড়ব! ও! আপনি বুঝি আরবি ভাষা আমার চেয়েও বেশি মিসান্ডারস্টেন্ড করেন। 'কামালের' স্যুপারলেটিভ 'আক্‌মল্‌'— যেমন 'কবীর'-এর 'অক্‌বর্‌', 'হামিদ'-এর 'আহ্‌মদ্‌'! 'বাঁদরের' বোধহয় 'আব্‌দর্‌'— নইলে হারাম ব্র্যান্ডি-পানি দেবে কেন?

* * *

শ্রীবিমলকে না নিলেও আপনি যে মিত্তির একটি নিতেনই— সে আমি জানি। 'মুখুয্যে "কুটিল" অতি বন্দ্যো বটে সাদা', অপিচ 'ঘোষ বংশ মহাবংশ, বোস বটে সাদা, মিত্তির "কুটিল" অতি দত্ত মহারাজা।'

এ কম্মটি ভালোই করেছেন। সর্বশেষে দেখছি নমস্য বদ্যিও জুটিয়েছেন। কবিগুরুর দক্ষিণ-হস্তের সাক্ষাৎ প্রতীক আপনাদের কাগজের মেরুদণ্ড গড়ে দিচ্ছেন।... হ্যাঁ হ্যাঁ পাবলিসিটি করতে জানতেন না, বদ্যি সন্তান 'শ্রীম'।

* * *

তবু বলছি, আমাকে নিলে ভালো করতেন!

কালি ও কলম' ফাল্গুন ১৩৭৫

www.pathagar.com

এষাস্য পরমা গতি?

'সত্যেরে দেখিব আমি জ্যোতির্ময় রূপে;
আমার চরম মোক্ষ, আমি গন্ধ ধূপে
ভস্ম হব পরি লয়ে সে দীপ্ত তিলক
অগ্নিতে আছেন যিনি, জলে বিশ্বলোক—
অন্তস্তলে, ওষধিতে, বনস্পতি মাঝে—
মম সত্তাবীণা যেন তাঁরি স্পর্শে বাজে ॥'

সে যুগ অতীত হল। তার পর ঋষি
কহিলেন, 'এ জীবন অন্ধ অমানিশি।
সত্য বাক্য, সত্য চিন্তা, তথা সত্য কর্ম—
ত্রিরত্ন তোমার হোক— সঙ্ঘ, বুদ্ধ ধর্ম
দীপ্যমান সর্বলোকে অন্ধ তমোনাশা
ঈশ্বরের দাস্য ত্যজ, ত্যজ শূন্যে আশা।'
বুদ্ধ-জীন ক্ষত্রিয়ের অমিতাভ ভাষা।
তাপিত শূদ্রের বুকে এনেছিল আশা ॥

অতিক্রমি আরবের দুস্তর মরুরে
ভারতে শ্যাম-সুধা-পঞ্চনদ ক্রোড়ে
আশ্রয় লভিল যবে নব সত্যদূত
বক্ষেতে বাহুতে তার এক ধর্ম পূত
একেশ্বর। প্রণমিয়া এ ভূমিরে
— যে দেশ ত্যজিয়া এল নাহি চাহি ফিরে—
কহিল, 'সত্যেরে আমি যে সুন্দর রূপে
লভিয়াছি, তবু শুভ্র পাষাণের স্তূপে
করিব প্রকাশ আমি। এস সর্বজন,
জাতিবর্ণ নাহি হেথা। মুক্ত এ প্রাঙ্গণ
আচণ্ডাল তরে।' শুনি সে উদাত্ত বাণী
শান্ত হল অভিযান, যুদ্ধে হানাহানি ॥

তার পর? তার পর লজ্জা, ঘৃণা, পাপ,
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ ॥
যুগ্মক্ষাত্র তেজে তার পাপ-প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদ-মন্ত্র ছিদ্রান্বেষী, পরস্পরাঘাত,
হইল বিজয়টিকা— সে অভিসম্পাত ॥

www.pathagar.com

দীর্ঘ রাত্রি অবসানে অরুণ আলোতে
মেলি সুপ্ত আঁখি দেখি চলে মুক্তস্রোতে
নাগরিক বৃদ্ধ ক্ষুদ্র; জনপদে জাগে
দীন-দুঃখী, পাপী-তাপী। তারি পুরোভাগে
মোহনের সাথে চলে যে ছিল নির্ভয়
মহাপুরুষের নামে দিতে পরিচয়,
আজাদি মোতিরমালা চিত্ত কেড়ে লয়
সরোজিনী পঙ্কে ফোটে— জয় জয় জয়!
চক্রনেমি আবর্তন পূর্ণ হল ভেবে
কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে প্রণমিনু দেবে।

হায়রে বিদীর্ণ ভাল, হারে অর্বাচীন
চক্রনেমি আবর্তিল; কিন্তু হল লীন
সম্মুখের সুখস্বর্গ। কি অভিসম্পাতে
ভাগ্যচক্র প্রবেশিল সেই অন্ধরাতে ॥
ভূতনাথ গিরিশৃঙ্গে উভয়ে প্রয়াণ
নববীজমন্ত্র লাগি। নাহি অসম্মান!
নাহি অসম্মান তাহে। হেথা নাগরিক
দ্বি-ধা হয়ে তর্ক করে দীর্ণে দিগ্বিদিক!
কৌলীন্য বিচারের তাই কী জাত্যাভিমান!
দম্ভ কিবা?— কে পড়িছে বেশি স্টেটস্‌ম্যান!

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.৭.১৯৪৫

গাঁধী-ঘাট

আজ যদি রাষ্ট্রসংঘ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনতে চান, তা হলে আমাদের কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত কী সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই, এবং সে সংগীত, সর্বাঙ্গসুন্দর করে কে কে গাইতে পারবেন সে বিষয়েও আমাদের মনে অত্যধিক দ্বিধা নেই। তার কারণ আমাদের সংগীত এখনও জীবন্ত— তার ঐতিহ্য কখনও ছিন্নসূত্র হয়নি।

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এককালে ভারতবর্ষে যে অত্যন্ত নয়নাভিরাম ভবন অট্টালিকা ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ— সংস্কৃত কাব্য নাটক— শিল্প-শাস্ত্রে তার ভূরিভূরি বর্ণনা পাওয়া যায়— কিন্তু ঠিক কী করে সেগুলো আবার নির্মাণ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের কারও মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। মোগল-পাঠান

www.pathagar.com

বাদশারা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বুখারাস-মরকন্দ ইরানের শিল্পকলা মিশিয়ে এদেশে বিস্তর ইমারত গড়েছিলেন, কিন্তু তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় মসজিদ, কবর ও দুর্গ নির্মাণে। আজকের দিনে এসব ইমারতের আমাদের প্রয়োজন নেই, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা তাজমহল বা জুমা-মসজিদের দ্বারস্থ হতে পারিনে।

ইংরেজ যখন নয়াদিল্লি গড়তে বসল তখন যে এ সমস্যা তার সামনে একেবারেই উপস্থিত হয়নি তা নয়। ঠিক সেই সময়েই রসজ্ঞ হ্যাভেল সায়েব ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত করেন। তার শেষ পরিচ্ছেদে তিনি ভারতীয় ইংরেজ বড়কর্তাদের সাবধান করে দেন, তাঁরা যেন নয়াদিল্লিতে শিব দিয়ে বাঁদর না গড়েন। হ্যাভেল্ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ স্থপতি-ইঞ্জিনিয়ারদের বলে দেন, 'ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোমাদের কর্ম নয়। যে শহরে দিওয়ান-ই-খাস, জুমা মসজিদ, কুতব্‌মিনার রয়েছে, সেখানে ভারতীয় স্থপতিকে বাদ দিয়ে কোনও কিছু সৃষ্টিকার্য করার দম্ভ কর না।'

কিন্তু হ্যাভেল যখন দেখতে পেলেন যে ইংরেজের স্বাধিকার-প্রমত্ততা তাকে সম্পূর্ণ বধির করে ফেলেছে, তখন তিনি ইংল্যান্ডের গণমান্য ইংরেজদের তরফ থেকে একখানা স্মারকলিপি তখনকার দিনে সেক্রেটারি অব স্টেটকে পাঠান। যতদূর মনে পড়ছে, সে স্মারকলিপিতে বার্নার্ড শ' এবং এচ. জি. ওয়েলসের নামও ছিল।

চোরা ধর্মের কাহিনী শোনে না, কিন্তু ধর্মের কাহিনী না শুনলেই যে মানুষ চোর হবে তার কোনও মানে নেই। সে মূর্খ হতে পারে, শিশু হতে পারে অথবা ইংরেজ বড়কর্তাও হতে পারে। এস্থলে দেখা গেল, ইংরেজ বড়কর্তারা দিল্লিতে বসে শ' সায়েবকে সরাজ্ঞান করলেন— কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ল লন্ডনি শ'র তুলনায় তাঁরা নিজেদের এক একজনকে একশ মনে করেছেন। তার পর দিল্লিতে তাঁরা চিজ প্রসব করলেন পণ্ডিতি ভাষায় তাকে বলে গর্ভস্রাব, ইংরেজিতে Muck, trash বললে তার খানিকটে অর্থ ধরা যায়— শিব গড়তে বাঁদর গড়ার জন্য কোনও জুৎসই কথা ইংরেজিতে নেই, পর্বতের মূষিকপ্রসবও অন্য জিনিস।

তারি অন্য নিদর্শন কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল। এ জিনিসটি ক্রিস্‌মাস কেক্ না শ্বেতহস্তী, এখনও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। এটা নাকি বানানো হয়েছিল তাজমহলের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য। হবেও বা। শূর্পনখাও তো সীতার সৌন্দর্য দেখে হার মেনে নেয়নি। সেকথা থাক্, তবে এইটুকু না বলে থাকা যায় না— তাজ দেখে মনে হয়, চেঁচিয়ে বলি, 'ধর্, ধর্, এক্ষুনি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে।' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল দেখে চেঁচিয়ে বলি, 'বাঁধ্ বাঁধ্ এক্ষুনি ডুবে যাবে।'

* * *

গাঁধীঘাট নির্মাণ করতে গিয়ে তাই স্থপতিকে কোন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি। অজন্তাযুগে ফিরে যাবার উপায় নেই, মোগল স্থাপত্যে ঘাট নির্মাণের উদাহরণ নেই। আর ইউরোপীয় স্থাপত্যের বহু জিনিস আমাদের কাজে লাগে বটে, কিন্তু তা দিয়ে রসসৃষ্টি হয় না, আর হলেও আমাদের ভারতীয় মন চট করে তা দেখে সাড়া দেবে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। (ইউরোপীয় সবকিছু বর্জনীয় সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়— তা হলে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের নভেল বাদ দিতে হয়)।

www.pathagar.com

তা হলে এক হতে পারে— সবকিছু বাদ দিয়ে নিছক কল্পনার হাতে লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তাতে মন সাড়া দেয় না। আমরা কি তবে হটেনটট? আমাদের ভাণ্ডারের কি কোনও ঐশ্বর্য নেই যে আমরা শুধু দু খানা হাত দিয়ে ব্যবসা ফাঁদব?

আর হতে পারে— প্রয়োজনমতো হিন্দু, পাঠান, মোগল ইংরেজ সকলের কাছ থেকে রসবস্তু ধার নেওয়া। যেখানে নিতান্তই অনটন, সেখানে স্থপতি চালাবেন তাঁর কল্পনা। তাঁর নৈপুণ্য তাঁকে শিখিয়ে দেবে কী করে ভিন্ন ভিন্ন রসবস্তুর সংমিশ্রণে এমন জিনিস নির্মিত হয়, যা রসস্বরূপ এবং শুধু তাই নয়— অখণ্ড রসস্বরূপ।

আমার মনে হয়, গাঁধীঘাট অখণ্ড এবং সার্থক রসসৃষ্টি হয়েছে। তার সম্পূর্ণতাটাই আমার চোখে পড়েছে প্রথম এবং আমি তাকে সম্পূর্ণভাবেই রসবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন মনস্থির করলুম যে এ সম্বন্ধে আর পাঁচজনকে বলতে হবে, তখনই বিশ্লেষণ কর্ম আরম্ভ করতে হল এবং তাতেও স্থপতির পরিমাণ-জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়েছি। পাঁটটা মসলা একত্র করা কঠিন কর্ম নয়— হোটেলের পাচকেরা নিত্য নিত্য করে; কিন্তু সার্থক রান্না মা-মাসিরই হাতে ফুটে ওঠে। জগাখিচুড়ি ও মধুপর্ক ভিন্ন জিনিস।

স্মৃতি-সৌধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাই তাকে উচ্চ হতে হয়। স্থপতি সেখানে ঐতিহ্যগত মন্দিরের শরণাপন্ন হয়েছেন। ঘাটে মেয়েদের জন্য কাপড় ছাড়ার ভালো ব্যবস্থা করতে হয় এবং পর্দার কড়াক্কড়ি মোগল-পাঠানরাই করেছে বেশি। তাই 'পাষাণ'-যবনিকা দিয়ে যে গর্ভগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তার অনুপ্রেরণা এসেছে দিল্লি-আগ্রা থেকে। আর সর্বশেষে ঘাটে আশ্রয় পাবে বহু লোক; তাদের জন্য স্থপতি সৌধবক্ষ হতে যে পক্ষ সম্প্রসারিত করেছেন তার শৈলী ইয়োরোপীয় (এবং ইয়োরোপীয়ের আবিষ্কৃত কংক্রিটেই এ বস্তু সম্ভবপর)। আজকালকার দিনে কে না জানে প্রতীক্ষমাণ নরনারী সবচেয়ে বেশি দেখা যায় প্লাটফর্মে এবং প্লাটফর্ম জিনিসটা যখন বিলিতি, তখন তার বেদনা-বোধটা কোথা থেকে আসবে তার জন্য বড্ড বেশি কল্পনাও খাটাতে হয় না।

কিন্তু প্লাটফর্ম দেখে মনে যদি কোনও রসের সৃষ্টি হয়, তবে সে তো বীভৎস রস। আমার মনে হয়, স্থপতি এখানে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই পক্ষ সম্প্রসারণে এমন একটা সরল স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি বা sweep আছে। বামদিকের গর্ভগৃহ ও সৌধ-শিখরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই গতিভঙ্গি এতই সুষ্ঠু হয়েছে যে, সমস্ত স্মৃতি-সৌধটি স্থাণুবৎ না হয়ে গতিবেগ পেয়েছে। মন্দিরটির খণ্ড গম্ভীর— পাষাণ যবনিকা কারুকার্যময়— পক্ষ সম্প্রসারণ পূর্বক আপন বৃক্ষলতা দিয়ে সম্পূর্ণ সৌধের ভারকেন্দ্র রক্ষা করেছে।

তাই মনে হয়, আড়ম্বরহীনতাই এ সৌধের প্রধান ধর্ম। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, গাঁধীঘাটে যে আড়ম্বরহীনতার গোড়াপত্তন করা হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে আমাদের ভবিষ্যতের সব স্থাপত্য প্রচেষ্টা আড়ম্বরহীনতায়ই আপন প্রধান সতর্কতা খুঁজে পাবে। শুধু বলতে চাই, মহাত্মাজির জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতেই হয় তবে তাকে আড়ম্বরহীন হতেই হবে।

কিন্তু আমাদের এসব বিশ্লেষণ হয়তো প্রয়োজন নেই। আমরা শহরে থাকি, গঙ্গাবক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ। মা গঙ্গার বুক বেয়ে যে জনপদবাসী উজান-ভাটা করে, তারা কী বলে সেই কথা জানবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

শৈলীর প্রভাব এ স্মৃতি-সৌধ কতটা বহন করছে বিশ্লেষণ তারা করবে না। তাদের শেষ কথা, ভালো-লাগা মন্দ-লাগা এবং কলা-বিচারে সেই শেষ কথা। তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সম্পূর্ণ বিদেশি বস্তু আমাদের জনসাধারণকে বেশিদিন রস দিতে পারে না। এ সৌধ আমাদের ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে যখন শিরোত্তোলন করেছে তখন আর যা হয় হোক, এ বস্তু নিন্দাভাজন হবে না।

অবিমিশ্র আনন্দের বিষয়, এ ঘাটের পরিকল্পনা করেছেন এক বাঙালি যুবক। তাঁর নাম হবিবুর রহমান। ইনি শিবপুরের কৃতী ছাত্র ও পরে আমেরিকায় গিয়ে অনেক বিদ্যাভ্যাস, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই পুণ্যকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শ্রীমান দেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করবেন।

এ ঘাটে গঙ্গাবক্ষে স্নান করে দেশবাসীর দেহ পবিত্র হোক, মহাত্মার জীবন স্মরণে তাঁদের আত্মা মহান হোক।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

হজরত সৈয়দ নিজাম উদ্-দীন চিশতি

সুলতান উল্-মশায়িখ্ (গুরু-সম্রাট), মহবুব-ই-ইলাহি (খুদার দোস্ত), হজরত সৈয়দ নিজাম উদ্-দীন চিশতি, শেখ উল্-আওলিয়ার (গুরুপতি) ৬৪৬ পরলোক-গমনোৎসব (উর্স্) নিজাম উদ্-দীন দর্গায় মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতি হবেন বলে কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে উর্দুভাষায় একখানি চিঠি লিখে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ জানান এবং শেখ নিজাম উদ্-দীনের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি সচরাচর হিন্দিতে চিঠিপত্র লিখে থাকেন বলে উর্দু-প্রেমী সভাস্থ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টানগণ উর্দুর প্রতি তাঁর এই সহৃদয়তা দেখে ঘন ঘন উল্লাস প্রকাশ করেন।

* * *

আফগান রাজদূত বলেন, শেখ নিজাম উদ্-দীন আফগান এবং ভারতের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক। খুরাসান-হিরাতে একদা সুফিতত্ত্বের যে চিশতি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নিজাম উদ্-দীন সেই 'সম্প্রদায়ে'র অসাম্প্রদায়িক বাণী এদেশে প্রচারিত করেন। আফগান রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত নিজাম উদ্-দীনের পটভূমি এবং ইতিহাস বর্ণন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতিশয় মনোরম হয়েছিল।

মিশরের রাজদূত বলেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী সর্বসম্প্রদায়ের ভেদের অতীত ছিল বলেই তাঁর চতুর্দিকে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমবেত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আজকের দিনের ভারতীয় রাষ্ট্রও সেই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভিত্তিতে গড়া বলে সে রাষ্ট্র ভারতের ভেতরে-বাইরে বিশেষ করে মিশরে এতখানি আদৃত হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ের লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁরা মিশর-রাষ্ট্রদূতের এই উক্তিতে ঘন ঘন করতালি দেন।

ইরাকের রাজদূত বলেন, আজ পৃথিবী আরেক বিশ্বযুদ্ধের সামনে এসে পড়েছে। আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি দরকার শান্তির বাণী প্রচার করা। খাজা নিজাম উদ্-দীন ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি সব সমাজের এতখানি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

ইরাকি এবং মিশরি রাষ্ট্রদূত দুজনেরই মাতৃভাষা আরবি। তাঁরা ইংরেজি ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরান থেকে কয়েকটি 'আয়াত' উদ্ধৃত করেন। দিল্লির হিন্দু-মুসলমান-শিখ অনেকেই আরবি জানেন, অন্তপক্ষে কুরান-তিলাওত (কুরান-পাঠ) শুনতে অভ্যস্ত। এঁদের কুরান উদ্ধৃতি ও মধুর আরবি উচ্চারণ শুনে সকলেই বড় আনন্দ লাভ করেন।

পাকিস্তানের রাজদূত যুক্তপ্রদেশবাসী— তাই তাঁর উর্দু উচ্চাঙ্গের। তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন বলে জনসাধারণের সুবিধে হল। আর উর্দু সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই। পাকিস্তানের রাজদূত বলেন, আমরা নিজাম উদ্-দীনের বাণী জীবনে মেনে নিলে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারব।

সর্বশেষে মৌলানা সাহেব বক্তৃতা দেন। মৌলানা সাহেবের উর্দু ভাষার ওপর যা দখল তাঁর সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। বক্তা হিসেবেও তাঁর জুড়ি এ দুনিয়ায় আমি দু একজনের বেশি দেখিনি। উচ্চারণ, বলার ধরন, শব্দের বাছাই, গলা ওঠানো-নামানো, যুক্তিতর্ক উপমার সিঁড়ি তৈরি করে করে ধাপে ধাপে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে গুরুচণ্ডাল সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এসব তাবৎ বাবদে তিনি ভারতবর্ষের যেকোনো বক্তার সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারেন।

মৌলানা সাহেব বললেন, নিজাম উদ্-দীনের বাণী যে কতখানি সফল হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চোখের সামনেই। এই যে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান এখানে আজ ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর বাণী সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিল— তিনি ইসলামের সেই শিক্ষাই নিয়েছিলেন, যে শিক্ষা কোনও বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ বা ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সে শিক্ষা সর্বধর্মের প্রতি সমান ঔদার্য দেখায়, তার নীতি এবং দণ্ড হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য।

* * *

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল 'নিজাম সাহিত্যসভার' আমন্ত্রণে। এক কাশ্মিরি ব্রাহ্মণ (পণ্ডিত) যুবক সভার সম্পাদক। তিনি বিশুদ্ধ উর্দুতে যে একখানা আমন্ত্রণরচনা পাঠ করলেন, তা শুনে মনে হল অতখানি বাংলা জানলে রায় পিথৌরা বাংলা দেশে নাম করে ফেলতে পারতেন।

* * *

নিজাম উদ্-দীন বাঙলা দেশে বিখ্যাত হয়েছেন 'দৃষ্টিপাতের' মারফতে। গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক শা'র সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য আর 'দিল্লি দূর অস্ত' গল্প এখন সকলেই জানেন।

৬৩৪ হিজরার (ইং ১২৩৬) সফর মাসে নিজাম উদ্-দীন বুদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ, পিতার নাম আহমদ। তার পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা যান, মা তাঁকে মানুষ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দিল্লিতে এসে গিয়াসপুর গ্রামে আস্তানা গাড়েন

www.pathagar.com

(হুমায়ুনের কবরের পুব-উত্তর কোণে এখনও সে ঘরটি আছে: এবং পাক-পট্টনের সিদ্ধ-পুরুষ বাবা ফরিদ শকর-গঞ্জের কাছে দীক্ষা নিয়ে আবার দিল্লিতে ফিরে আসেন।

চিশতি সম্প্রদায়ের তিন মহাপুরুষ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। 'আজমির শরিফের' খাজা মুইন উদ্-দীন চিশতি ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ভারতীয় মুসলমানের কাছে মক্কা-মদিনার পরই আজমির তৃতীয় তীর্থ, বহু হিন্দুর কাছে কাশী-বৃন্দাবনের পরই 'আজমির শরিফ'।

মুইন উদ্-দীনের পরেই তাঁর সখা কুৎব্ উদ্-দীন বখ্তিয়ার কাকি। ইনি সম্রাট ইলতুৎমিসের (অলতমাশ্) গুরু ছিলেন এবং দিল্লির অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস 'কুতুব মিনার' দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুৎব্ উদ্-দীন আইবকের নামে বানানো হয়নি— বানানো হয়েছিল পীর কুৎব্ উদ্-দীন বখতিয়ার কাকির নামে। এঁর দরগাহ্ কুতুবমিনারের কাছেই। সেখানে শেষ মুগল বাদশা'র অনেকেই দেহরক্ষা করেছেন। প্রতি বৎসর সেখানে দরগার চতুর্দিকে ফুলের মেলা বসে।

তাঁর পরই বাবা ফরিদ উদ্-দীন শকর-গঞ্জ।

* * *

সুলতানা রিজিয়ার ভগ্নীপতি গিয়াস উদ্-দীন বল্বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত বহু বাদশাই নিজাম উদ্-দীনের শিষ্য ছিলেন। রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৃদ্যতা তাঁর ছিল আলাউদ্-দীন খিলজি, খিজ্র্ খান (এই খিজ্র্ খান এবং দেবলা দেবীর প্রেমের কাহিনী সম-সাময়িক কবি আমির খুসরো ফারসি ভাষায় লেখেন একথা বাঙালির কাছে অজানা নয়— আকবর বাদশাহ প্রায় তিন শতাব্দী পরে বাঙলা দেশে জলবিহারের সময় এই কাব্য শুনে মুগ্ধ হন) এবং মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে আলাউদ্-দীন খিলজিকে পীর নিজাম উদ্-দীন মঙ্গোল আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দেন— মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার প্রধান কারণ ধর্মশাস্ত্রে উভয়ের গভীর পাণ্ডিত্য। মুহম্মদ তুগলুককে সাধারণত 'পাগলা রাজা' বলা হয়, কিন্তু তাঁর আর যে দোষই থাকুক তিনি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। মোল্লারা তাঁকে জেহাদের জন্য ওসকাতে চাইলে তিনি শাস্ত্রবিচারে তাদের ঘায়েল করে ঠাণ্ডা করে দিতেন।

কিন্তু পীরের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর মিত্র এবং শিষ্য কবি আমির খুসরৌর সঙ্গে। খুসরৌর পরিচয় এখানে ভালো করে দেবার প্রয়োজন নেই। ভারত-আফগানিস্তানের সুরসিক জনমাত্রই তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকার করে থাকেন।

পীর নিজাম উদ্-দীনের সঙ্গে বরঞ্চ জলাল উদ্-দীন খিলজি এবং গিয়াসউদ্দীন তুগলুকের প্রচুর মনোমালিন্য ছিল কিন্তু খুসরৌকে সম্মান এবং আদর করেছেন বল্বন্ থেকে আরম্ভ করে মুহম্মদ তুগলুক পর্যন্ত সব রাজাই। এমনকি যে গিয়াস উদ্-দীন তুগলুক নিজাম উদ্-দীনের কুয়োর কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তিনি পর্যন্ত খুসরৌকে সভাস্থলে বিস্তর ইনাম-খিলাত দেন।

মুহম্মদ তুগলুক পণ্ডিত ছিলেন, তাই তাঁর লাইব্রেরিখানা ছিল বিশাল— মুহম্মদ সেই লাইব্রেরি দেখাশোনার ভার দেন খুসরৌকে। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্-দীন বরণী আর খুসরৌ সঙ্গে না থাকলে মুহম্মদ হাঁপিয়ে উঠতেন। বাঙলা দেশ যাবার সময় মুহম্মদ মিত্র খুসরৌকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং সেখানে লেখনাবতীতে থাকাকালীন খবর পৌঁছল নিজাম উদ্-দীন দেহরক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

* * *

বজ্রাঘাত বললে কম বলা হয়। খুসরৌকে কোনওপ্রকারেই সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। সর্বস্ব বেচে দিয়ে উন্মাদের মতো দিল্লির দিকে রওনা হলেন। সেখানে তাঁর পৌঁছনোর খবর পেয়ে তাঁর অসংখ্য মিত্র ছুটে গেলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। নিজাম উদ্-দীনের পরেই পীর হিসেবে দিল্লির আসন তখন নিয়েছেন খাজা নসির উদ্-দীন 'চিরাগ দিল্লি' অর্থাৎ 'দিল্লির প্রদীপ'— কুতব্ সাহেব আর নিজাম উদ্-দীনের পরেই তাঁর দর্গা দিল্লিতে প্রসিদ্ধ এবং ইনি ছিলেন খুসরৌর পরম মিত্র। তিনি পর্যন্ত খুসরৌকে তাঁর শোক ভুলিয়ে সংসারে আবার ফিরে নিয়ে যেতে পারলেন না।

আচ্ছন্নের মতো খুসরৌ দিবারাত্রি নিজাম উদ্-দীনের কবরের পাশে বসে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ ছয় মাস কাটানোর পর তাঁর প্রতি খুদার দয়া হল। ২৯ জুল কিদা ৭২৫ হিজরিতে (ইংরেজি ১৩২৫) মৃত্যু তাঁকে তাঁর গুরু এবং সখার কাছে নিয়ে গেল।

খুসরৌ বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন বলে হিন্দুর বসন্ত পঞ্চমী উৎসবে প্রতি বৎসর যোগ দিতেন।

এখনও প্রতি বৎসর দিল্লির হিন্দু-মুসলমান বসন্ত পঞ্চমী দিনে নিজাম উদ্-দীনের দর্গায় সমবেত হয়ে খুসরৌকে স্মরণ করে।

* * *

দিল্লির বাদশা মুহম্মদ শা, দ্বিতীয় আকবরের (ইনিই রামমোহনকে বিলেত পাঠান) পুত্র মিরজা জাহাঙ্গির, ঐতিহাসিক বরণী, আকবরের প্রধানমন্ত্রী আতগা খান (হুমায়ুন কৃতজ্ঞ হয়ে এঁর স্ত্রীকে আকবরের 'দুধ-মা' নিযুক্ত করেছিলেন), আকবরের 'দুধ-ভাই' আজিজ কোকল্তাশ্, নাদির শা'র এক পুত্রবধূ যিনি দিল্লিতে মারা যান, এরকম বহু লোক তাঁদের দেহরক্ষা করেছেন পীর নিজাম উদ্-দীনের গোরের আশেপাশে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এঁদের অনেকেরই কবর তুলনীয়— সেকথা আরেকদিন হবে।

* * *

নিজাম উদ্-দীনের দরগায় গোরের জায়গা যোগাড় করা সহজ নয়। সম্রাটনন্দিনী জাহানারার গোর এখানেই। দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এইটুকু জায়গায় জন্য তিনি তিন কোটি টাকা দাম হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন, ভ্রাতার হক দুই-তৃতীয়াংশ টাকার ওপর। তাই তিনি দাম দিলেন এক কোটি।

কবরের কাছে ফারসিতে লেখা :

'বগৈরে সবজে ন' পুশদ্ কসি মজার মরা,
কে কব্র-পুশে গরিবান্ হমিন্ গিয়া বস্ অস্ত্।'
'বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহানারা
সম্রাট-কন্যার।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩.০১.১৯৫২

www.pathagar.com

হ য ব র ল

এক

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অর্থসাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জানকীনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন—'... পূর্বে পরিষদে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দিয়া অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমানে জরুরি অবস্থায় আর্থিক অসুবিধার জন্য সে ব্যবস্থা রহিত করিবার উপক্রম হইয়াছে।' যদি তাহাই করিতে হয় ও মেধাবী ছাত্রেরা সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করে, তবে পরিষদ চলিবে কাহাদের লইয়া? ধনী মেধাবী ছাত্র তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। দেশের বিত্তশালীদের বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি যে, আজও বাজারে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তকরাজি পাওয়া যায়, তাহা কাহার অধ্যবসায়ের ফলে? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের জন্য কতটুকু করিয়াছেন ও এইসব চতুষ্পাঠী, টোল পরিষদ কতটুকু করিয়াছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তো দুইখানা কাব্য তিনখানা নাটক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, ভারতীয় দর্শনের জন্য তো রহিয়াছেন ইংরেজিতে রাধাকৃষ্ণণ ও দাশগুপ্ত। সরকার সাহায্যবর্জিত দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও ইয়োরোপের, বিশেষত জর্মন পণ্ডিতমণ্ডলীই তো সংস্কৃতের শতকরা ৯৫ খানি পুস্তক বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও যাঁহারা 'দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন টুলো আর কয়জন নির্জলা মেড ইন বিশ্ববিদ্যালয়?' উইনটারনিৎস-লেভিকে যেসব হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা তো খাঁটি টুলো। অনেকে ইংরেজি পর্যন্ত জানিতেন না। এ যুগের জ্ঞানীদের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রনাথও তো টুলো।

আশ্চর্য যে, পাঠান-মুঘল যুগের ভিতর দিয়া চতুষ্পাঠী, টোল সুস্থ শরীরে বাহির হইয়া আসিল। পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিলেন, পাণ্ডুলিপি বাঁচাইয়া রাখিলেন, নতুন টীকা-টিপ্পনী লিখলেন আর আজ ধর্মগন্ধ-বিহীন সদাশয় ইংরেজের আমলে, দেশে যখন জাত্যাভিমান বাড়িয়াছে, জাতীয়তাবাদের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য হার্দিক প্রচেষ্টা সর্বত্র জাজ্বল্যমান, তখন অর্থাভাবে আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদি লোপ পায়, তবে এ-ও বলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য বাঁচাইয়া রাখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। কুলোকের বদসল্লায় পড়িয়া সেদিন বায়স্কোপে গিয়াছিলাম একখানা পৌরাণিক ছবি দেখিতে। যাহা দেখিলাম, সে সম্বন্ধে মন্তব্য না করাই প্রশস্ত। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ করিলাম। হিন্দিতে যে সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হয় তাহা বাঙালি শ্রোতা দিব্য বুঝিতেছেন ও অর্ধশিক্ষিতা বাঙালি অভিনেত্রীরাও দিব্য শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে মন্ত্র পড়িতেছেন। তাহা হইলে কি বাঙলা দেশের স্কুল-কলেজে এখনও শুধু সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইবার সময় হয় নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বাঙালিকে বেদমন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সে ঐতিহ্য আজ ক্ষীণ। মফঃস্বলের

www.pathagar.com

ব্রহ্মমন্দিরে সংস্কৃত উচ্চারণে বাঙলা পদ্ধতি আবার আসর জমাইয়াছে। বোম্বাইয়ের স্টুডিয়োর আবহাওয়া যদি বাঙালি অভিনেত্রীকে সংস্কৃত উচ্চারণ শিখাইতে পারে, তবে বাঙলা দেশের স্কুল-কলেজ তাহা পারে না, সে কি বিশ্বাসযোগ্য?

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশবাবুর কোরানের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যে বেশি ছিল; কারণ মুসলমানেরা তখনও মনস্থির করতে পারেন নাই যে, কোরানের বাঙলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের *বিষাদ-সিন্ধু* বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবি-ফারসি শব্দযোগে তাঁদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তার পর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালি হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমনকি, উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জনা বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহিদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, 'কানান' কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজী সাহেব তাঁহার *ধূমকেতু* কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতোমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। তখনও মাসিক *মোহাম্মদী*তে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু *মোহাম্মদী* কিনেন না; বিশেষত পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবি মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'তে সংগৃহীত মুসলমানি আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

বাঙালি-হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোনও মুসলমান শরৎবাবুর মতো সরল ভাষার মুসলমান চাষি ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাংলা তর্জমা এখন হাজার হাজার বিক্রয় হয়— যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য ও মূল আরবি হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই, আর সয়ীদ আইয়ুবের লেখা কোন বিদগ্ধ বাঙালি অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানি কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালি কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরান, হদিস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিসামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থাপত্য শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলদুন), দর্শন, কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি— কত বলিব— সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফারসিতে লেখা বাঙলার ভূগোল-ইতিহাস *বাহার-ই-স্তানে গাইবির* বাঙলা তর্জমা এখনও কেহ করেন নাই।

www.pathagar.com

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচার' বিভাগ আছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানারকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব' 'বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন? লিখিলে কি উজবেকিস্থানের ভাষায় লেখেন?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষা বলেন; কিন্তু একই বই পড়েন না? কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫.৮.১৯৪৫

দুই

এক ইন্দো-আমেরিকান আড্ডায় ছিটকাইয়া গিয়া পড়িয়াছিলাম। আড্ডাধারীরা এ-কোণে ও-কোণে তিন-চার জনায় মিলিয়া ছোট ছোট দ'য়ের সৃষ্টির করিয়া হরেকরকম বিষয়ে আলাপচারী করিতেছিলেন। আর যে কোণে গিয়া পড়িয়াছিলাম সেখানে একজন মার্কিন দুঃখ করিয়া সেই সনাতন কাহিনী বলিতেছিলেন, গাড়িওয়ালারা বিদেশিদের কীরকম ধাপ্পা দেয়, দোকানিরা কীরকম পয়সা মারে, টিকিট কাটিতে হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষটায় বলিলেন, 'অদ্ভুত দেশ, ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে পর্যন্ত মুখ ধুইবার জন্য সাবান-তোয়ালে থাকে না; জিজ্ঞাসা করিলে রেল কর্মচারী বলে, যদি রাখা হয় আধঘণ্টার ভিতর সাবান-তোয়ালে কর্পূর হইয়া যাইবে।' আমি উষ্মার সহিত একটা ঝাঁজালো উত্তর দিব দিব করিতেছি এমন সময় একটি জর্মন মহিলা বলিলেন, 'জর্মনিতে থার্ড ক্লাসেও সাবান-তোয়ালে থাকে ও সেগুলি চুরি যায় না। কিন্তু দুরবস্থার সময় এই নিয়ম খাটে না। ১৯১৮ সনে জর্মনির দৈন্য এমন চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, সাবান-তোয়ালে মাথায় থাকুক গাড়ির সর্বপ্রকার ধাতুর তৈয়ারি রড, হ্যান্ডল, হুক, কব্জা পর্যন্ত উপিয়া গিয়াছিল। জর্মনি হুনরি-কারিগরদের সকলেই ড্রাইভার-স্প্যানার চালাইতে ওস্তাদ। শেষ পর্যন্ত কব্জার অভাবে গাড়িগুলির দরজা পর্যন্ত ছিল না। অথচ সেই জর্মনিতেই ১৯২৯ সালে কেউ যদি ভুলে বাথরুমে হাতঘড়ি ফেলিয়া আসিত তবে নির্ঘাৎ ফেরত পাইত।' উত্তর শুনিয়া মার্কিনের চোখের উলটা দিক বাহির হইয়া আসিল। বলিলেন, 'কই, আমাদের দেশে তো এমনটা এখনও হয় নাই।' আমি বলিলাম 'ব্রাদার, তোমরা আর দৈন্য দেখিলে কোথায়?' মনে পড়িল হেম বাঁড়ুয্যের শেক্সপিয়ারের তর্জমা,

অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই ক্ষতচিহ্ন করি দরশন।

* * *

বাড়ি ফিরবার সময় ওই খেই ধরিয়া অনেক কিছু ভাবিলাম। যান্ত্রিক সভ্যতা তো আমাদের হয় নাই। আমাদের যা কিছু বৈদগ্ধ্য-ঐতিহ্য-সভ্যতা এককালে ছিল তাহা বিরাজ করিত গ্রামের সরল অনাড়ম্বর জীবনকে জড়াইয়া। কৃষ্টির দিক দিয়া গ্রামগুলি তো উজাড় হইয়াছে কারণ গ্রামের কোনও মেধাবী ছেলে যদি কোনও গতিকে বিএ পাস করিতে পারে, তবে সে তো আর গ্রামে ফিরিয়া যায় না। গ্রাম তাহাকে কী চাকরি দিবে? ১২ টাকার স্কুলমাস্টারি, না ১৫ টাকার পোস্টমাস্টারি? এত কাঠখড় পোড়াইয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া,

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য বরবাদ করিয়া বিএ পাস করিল কি কুল্লে ১৫ টাকার জন্য? সে আর গ্রামে ফিরে না। সার শহরে চলিয়া যায়, তুষ ধামে পড়িয়া থাকে। অথচ একশত বৎসর পূর্বেও গ্রামের হিন্দু ছেলে নবদ্বীপ ভট্টপল্লি, কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া গ্রামেই ফিরিত; সেইখানেই বাস করিত। মুসলমান ছেলে দেওবন্দ, রামপুর পাস করিয়া ওস্তাদ-দত্ত মস্ত পাগড়ি পরিয়া সেই গ্রামেই ফিরিয়া আসিত, সেই গ্রামেই বাস করিত। তাঁহারাই গ্রামের চাষি-মজুরকে ধর্মপথে চলিবার অনুপ্রেরণা দিতেন।

গ্রামে শিক্ষাদীক্ষা আজ নাই, তবু তো চাষা-মজুর পশু হইয়া যায় নাই। আমি বহু কর্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই একথা বলেন নাই যে, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের চাষারা কুকুর-বিড়াল খাইয়াছে। কুকুরের সঙ্গে খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে কিন্তু এ সমাধান তাহার মাথায় আসে নাই যে, কুকুরটাকে মারিয়া তো জঠরানল নিবানো যায়! আরও শুনিয়াছি যে, গোরা সিপাহি টিনের খাদ্য ছুড়িয়া দিলে হিন্দু-মুসলমান স্পর্শ করে নাই; পাছে গরু বা শুয়োর খাইতে হয়।

অথচ সভ্যতার শিখরে উপবিষ্ট প্যারিস শহরের বাসিন্দারা নাকি দুর্দিনে কুকুর-বিড়াল ইস্তক চড়ুইপাখি পর্যন্ত সাফ হজম করিয়া ফেলিলেন।

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম; কে সভ্য কে অসভ্য কে জানে?

আনন্দবাজার পত্রিকা ১.৯.১৯৪৫

তিন

সেই ইন্দো-মার্কিন মজলিসের আরেক কোণে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে পৌঁছিলাম, তখন শুনি এক মার্কিন বলিতেছেন, 'যাকে জিগ্যেস কর সেই বলে "টেগোর পড়— গিট্যাঞ্জলি, গাড়না, চিট্টা"; পড়েছি, সুখ পেয়েছি। কিন্তু আমি চিত্রকর, তোমাদের দেশে কেউ ছবি-টবি আঁকে না?' আমি বলিলাম, 'কী অদ্ভুত প্রশ্ন, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার ও নন্দলালের চেলা রমেন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক শিবরাম মশোজি, রামকিঙ্কর বহিজ— এঁদের নাম শোনোনি?' মার্কিন বলল, 'ওই তো বিপদ, সকলেই বলে "নাম শোনোনি?" নাম তো বিস্তর শুনেছি। কিন্তু এদের ছবির অ্যালবাম কই— এক চক্রবর্তী ছাড়া! ১৫ থেকে ২০ টাকার ভিতর তুমি আমাদের যে কোনও গুণীর— দা-ভিঞ্চি, রেমব্রান্ত, সেজান্— যাঁরি চাও উৎকৃষ্ট অ্যালবাম পাবে। ইস্তেক তোমাদের দেশের বাজার এগুলোতে ছয়লাপ করে রেখেছিল, যখন লড়াইয়ের গোড়ার দিকে এদেশে আসি। এই যে এঁদের নাম করলে, দাও না কারু "কমপ্লিট ওয়ার্কস"? বেশি দরকসর করব না— আমরা কারবারি, আদ্ধেকেই দাও না?'

নতমস্তকে ঘাড় চুলকাইয়া টালবাহানা দিলাম, 'লড়াইয়ের বাজার; জাপানি-জর্মন প্রিন্টিং বন্ধ; লড়াইয়ের পরে—।' আমেরিকানটি ভদ্রলোক। লড়াইয়ের পূর্বে অ্যালবাম ছিল কি না সে বিষয়ে অতিরিক্ত অন্যায় কৌতূহল দেখাইয়া আমাকে বিপদগ্রস্ত করিলেন না।

শুনিতে পাই, সেই একমাত্র চিত্রকর যাঁহার অ্যালবাম পাওয়া যায়, সরকারের ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া অধ্যাপকের কর্ম ছাড়ি-ছাড়ি করিতেছেন। 'কারবারি' মার্কিন চিত্রকর চিনে, 'কলচরড' বাঙলা সরকার চিনে না।

www.pathagar.com

* * *

যুদ্ধের ফলে নানা অপকার, নানা উপকার হইয়াছে। তাহার খতিয়ান করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবু একটি জিনিসের কথা ভাবিলেই মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আসাম হইতে চীনে মোটরে যাইতে পারিব।

হিউয়েন সাং মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান, কাবুল হইয়া ভারতবর্ষ আসেন। অসহ্য কষ্ট তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, ত্রিশরণ তাঁহার সহায় না হইলে সে অসম্ভব দুস্তর মরুভূমি, সঙ্কটময় হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তথাগতের পুণ্যভূমিতে পৌঁছিতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে তিনি কাশ্মির, তক্ষশিলা, বিহার হইয়া বারেন্দ্রভূমি পর্যন্ত আসেন। সেখানে কামরূপের হিন্দুরাজার নিমন্ত্রণ পান। প্রথমে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধচিত্তে যাওয়া না-যাওয়া সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করিয়া শেষ পর্যন্ত লোভ সম্বররণ করিতে পারিলেন না।

কামরূপের রাজা তাহাকে উচ্চ পাহাড়ে তুলিয়া পূর্বদিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, 'ওই তো আপনার দেশ। আমার কতবার মনে হয়, আপনার দেশ একবার দেখিয়া আসি— কিন্তু এদিকে কোনও পথ এখন নির্মিত নাই।'

দেশের দিকে তাকাইয়া ভিক্ষু হিউয়েন সাংয়ের হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছিল। এত কাছে, অথচ এত দূরে! দুঃখ করিয়া ভাবিয়াছিলেন পথটি যদি থাকিত, তবে কত শীঘ্র কত অল্প কষ্টে তিনি আত্মজনের কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বর্ষার নির্মম বৃষ্টির অবিশ্রান্ত আঘাতে এই রাস্তার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। তৈয়ারি হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকার সেটিকে চালু রাখিবেন কি না বলিতে পারি না। যদি থাকে, নানা সুবিধার মধ্যে ভারত-চীনে মধ্যস্থতাবিহীন সরল (পথ কুটিল হওয়া সত্ত্বেও) যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রহিবে। আমরা মনের আনন্দে চীন ঘুরিয়া আসিব। হিউয়েন সাংয়ের আত্মা সন্তোষ লাভ করিবে।

* * *

স্থলপথ দিয়া বন্ধ ভারত হইতে আরেকটি জায়গায় অল্পায়াসে যাওয়া যায়— সে কাবুল। শরৎকাল আসিয়াছে, তাই মনে পড়িল। এখন সেখানে ফল পচিতেছে, খাইবার লোক নাই।

ধনীরা শিলং যান, মুসৌরি-সিমলা যান, কাশ্মির পর্যন্ত অনেকে ধাওয়া করেন, কিন্তু কাহাকেও কাবুল যাইতে দেখি না। অথচ যাওয়া যে খুব কষ্টকর তাহা নহে। পেশাওয়ার হইতে কাবুল মাত্র দুই শত মাইল মোটরপথ। প্রথম কুড়ি মাইল, খাইবার পাশের ভিতর দিয়া— সে কী অপূর্ব, রুদ্র দৃশ্য! দুই দিকে হাজার ফুট উচ্চ প্রস্তর গিরি দুশমনের মতো দাঁড়াইয়া— নিচে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়া কত চিত্র-বিচিত্র পোশাক, পাগড়ি পরিয়া কাফেলা-ক্যারেভান কাবুল চলিয়াছে, মাজার-ই-শরিফ চলিয়াছে, আমুদরিয়া পার হইয়া বোখারা যাইবে-আসিবে। এদিকে গজনি-কান্দাহার হইয়া হয়তো হিরাত পর্যন্ত যাইবে-আসিবে। ঘোড়া-গাধা-উটের পিঠে কত রঙয়ের কার্পেট, কত ঝকঝকে সামোভার, কত কারাকুলি পশম। সন্ধ্যায় নিমলা পৌঁছিবেন— সেখানে শাহজাহান বাদশার তৈয়ারি চিনার (সাইপ্রেস জাতীয়) বাগানের মাঝখানে নয়ানজুলির পাশে চারপাইর উপর না-গরম-না-ঠাণ্ডায় রাত কাটাইবেন— জলের কুলকুল শুনিয়া। ব্রাহ্মমুহূর্তে হাজার হাজার নরগিস (নারসিসস) ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে সঞ্জীবিত হইয়া চেতনালোকে ফিরিয়া আসিবেন।

www.pathagar.com

সেইদিন বিকালে কাবুল। পথের বর্ণনাটা আর দিলাম না। যে একবার দেখিয়াছে ভুলিবে না। শরতের কাবুল কোনও হিল স্টেশনের ন্যূন তো নহেই— অনেকাংশে উত্তম। প্রচুর ফল, উৎকৃষ্ট দুম্বার মাংস, হজমি পানীয় জল, রুদ্র-মধুর দৃশ্য ও কাবুলির সরল সহৃদয় বন্ধুত্ব। ঐতিহাসিক চিন্তার খোরাক পাইবেন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বাবুর বাদশাহের দীন ম্লান কবর কাবুলের পর্বতগাত্রে দেখিয়া।

* * *

অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ট্রামে প্রায়ই দেখি অসম্ভব ভিড়, অথচ চারিটি মহিলা চারিটি লেডিজ-বেঞ্চে আরামে বসিয়া আছেন। বসুন, আপত্তি নাই। কিন্তু যদি চারিটি মহিলা দুইখান বেঞ্চিতে বসিতেন, তবে অন্তত মহিলা না আসা পর্যন্ত চারিজন বৃদ্ধ বা ক্ষুদ্র ওই খালি দুই বেঞ্চিতে বসিতে পারেন বা পারে। কোনও কোনও মেয়ে বলেন, ট্রামে-বাসে ছেলেরা অভদ্র; ছেলেরা বলিবে মেয়েরা নির্মম।

লক্ষ করিয়াছেন যে, আজকাল ট্রামে-বাসে ছেলে-বুড়ো কমিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যান কী প্রকারে, এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫.৯.১৯৪৫

চার

মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন হইল কস্তুরবা স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে বলেন, 'গ্রামের কুটিরগুলিতে আলোক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা আনিবার জন্যই কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারের উৎপত্তি। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। বনিয়াদি শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝায়।' মহাত্মাজির প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এই উপলক্ষে আমরা একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি সবিনয় আকর্ষণ করি। যদি গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোনওপ্রকার কুটিরশিল্পও প্রর্বতন করা যায় তবে গ্রামের উৎপাদনী শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। তবে প্রশ্ন এই যে, শহরের উন্নত কলকব্জা দিয়া যেসব জিনিস প্রস্তুত হইবে তাহার সঙ্গে কুটিরশিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। জাপান এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল গ্রামের কুটিরশিল্পের সঙ্গে শহরের কারখানার ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন করিয়া। অর্থাৎ যন্ত্রজাত মালের অনেক ছোট ছোট অংশ এমন আছে সেগুলি গ্রামে বসিয়া অবসর সময়ে হাত দিয়া তৈয়ারি করা যায়— বিশেষ বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। শহরের কারখানাই কুটিরকে কাঁচামাল ও টুকিটাকি যন্ত্রপাতি দেয় ও কারখানাই কুটিরে তৈয়ারি মাল সংগ্রহ করিবার ভার নেয়। কাজেই কুটিরশিল্পী এই ধান্দা হইতেও রক্ষা পায় যে গ্রামের বাজারে তাহার তৈয়ারি মাল কিনিবে কে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত মণিলাল নানাবটী এককালে জাপানে এই সমস্যা সমাধানটি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বাঙলা দেশের কয়েকজন যুবাকেও আমরা চিনি যাঁহারা বহু কলা শিখিয়া আসিয়াছেন। হয়তো তাঁহারাও এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

কস্তুরবা ফাণ্ডের অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনও কুটিরশিল্প প্রবর্তন করা হয় তবে তাহার জন্য আলাদা খবচ করিতে হইবে না। এইটি বিশেষ সুবিধা।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২২.৯.১৯৪৫

পাঁচ

ছেলেবেলার একটি কবিতা মনে পড়িল, প্রাক্‌শরতের বর্ণনা—

অনিচ্ছায় ভিক্ষা দেয় কৃপণ যেমতি
পড়ে জল সুবিরল সূক্ষ্মধার অতি।

সদাশয় সরকার যে কায়দায় রাজবন্দিদিগকে মুক্তি দিতেছেন, তাহাতেই কবিতাটি মনে পড়িল। সেদিন একজন অধুনা-নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জেলে কীরকম দিন কাটিল?' বলিলেন, 'প্রথম তিন বৎসর ভালোই, কারণ মন স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, সরকার যখন আর কখনও ছাড়িবেই না, তখন দুঃখে সুখে এইখানেই বাকি জীবনটা কাটাই। হঠাৎ দেখি সরকার ইঁহাকে ছাড়ে, উঁহাকে ছাড়ে। বন্ধু-বান্ধবীদিগের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া সরকার একবার জেলে পুরিল, তার পর জেলের ভিতরে যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল (তাঁহারাই তো প্রকৃত বন্ধু— চাণক্য বলিয়াছেন, 'রাজদ্বারে যে সঙ্গে তিষ্ঠে সে বান্ধব, এ তো তারও বাড়া একেবারে ভিতরে, কারাগারে) তাঁহারাও একে একে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয়বার বন্ধুবিচ্ছেদ— ডবল জেল। খালাস পাইবার সময় আবার অনেক বন্ধুকে ফেলিয়া আসিয়াছি। এখন তেহারা জেলের সুখ পাইতেছি।'

সরকারের অবৈতনিক মুখপাত্র হিসাবে বলিলাম, 'মেলা বন্ধুত্ব করা ভালো নয়। তোমাদের শঙ্কারাচার্যই বলিয়াছেন।'

বন্ধু বলিলেন, 'বাড়ি গিয়া দেখি, মা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রথম তিন বৎসর ঠিক খাড়া ছিলেন, কিন্তু শেষের একমাস আশা-নিরাশায় দুলিয়া, অপেক্ষা করার ক্লান্তিতে, কে কে খালাস পাইয়াছে, কে কে পায় নাই, তাহাদের সঙ্গে মিলাইয়া আমার মুক্তির সম্ভাবনা কতটুকু হিসাব করিতে করিতে একদিন শয্যাগ্রহণ করিলেন।' সংস্কৃত প্রবাদটি বুঝিলাম যে, অধমের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও সুখ নাই।

শুনিতে পাই বড় কর্তাদের কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন। 'পূজার পূর্বে অথবা পরে সকলেই খালাস পাইবেন।' পূজার বিশেষ করিয়া পূজার পূর্বে ও পরে নিষ্কৃতিতে যে কী নিদারুণ পার্থক্য তাহা বুঝিবার মতো বাঙালি কি বড় দপ্তরে কেহই নাই?'

* * *

মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব সরকারকে হজযাত্রীদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মোগল বাদশাহ আকবর গুজরাট জয় করিলে পর মোগলরা প্রথম সমুদ্র দর্শন করে, প্রথম সমুদ্রবন্দর তাহাদের হাতে আসে। সেই বৎসরই হুমায়ুনের বিধবা মহিষী ও হারেম মহিলারা

www.pathagar.com

সুরট বন্দর হইতে নৌকাযোগে মক্কা যান। স্থলপথে যাওয়া বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া ইতোপূর্বে মোগল মহিলারা কখনও হজ যাইতে পারেন নাই। কিছুদিন পরেই আকবর একজন মির উল হাজ অর্থাৎ হজ অফিসার (ইংরেজ সরকার যেন না ভাবেন যে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এই সৎকর্মটি করিয়াছেন) নিযুক্ত করেন। আহমদাবাদবাসী সম্ভ্রান্ত পীর বংশীয় মির আবু তুরাব বহু হজযাত্রী ও ভারত সরকারের তরফ হইতে দশ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া সুরটের বন্দর-ই-হজ (তাপ্তি নদীতে একটা ঘাট এখনও এই নামে গুজরাতে সুপরিচিত) হইতে পাল তুলিয়া মক্কা পৌঁছোন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ওই অর্থ মক্কার শরিফ (গভর্নর), আলিম উলেমা (পণ্ডিত-শাস্ত্রী) ও দীনদুঃখীদিগকে অতি আড়ম্বরে ও বদান্যতার সহিত বণ্টন করা হয়। মক্কায় ভারতের জয়ধ্বনি উঠে; ভারতের হাজিরা সর্বত্র রাজার আদর পান। ফিরিবার সময় আবু তুরাব্ পয়গম্বরের পদচিহ্নিত একখানা পবিত্র প্রস্তর আনয়ন করেন। 'আকবর নামা'য় বর্ণিত আছে বাদশাহ আকবর সেই প্রস্তরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আপন স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখানি অদ্যাপি আহমদাবাদে আছে।

যতদূর মনে পড়িতেছে, হৃতগর্ব মোগল সম্রাট রফি-উদ্-দরজাতের সময় পর্যন্ত বৎসর বৎসর মির উল হাজ সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ লইয়া মক্কা যাইতেছেন। 'মিরাত-ই-অহমদি' নামক ফারসিতে লিখিত গুজরাতের ইতিহাসে এই সম্বন্ধে অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। পুস্তকখানির লেখক আলি মহম্মদ খান গুজরাত সুবার দেওয়ান বা রাজস্বসচিব ছিলেন। তখনকার দিনে রাজনীতি ও ধর্মনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ছিল বলিয়া এই অর্থব্যয়কে অপব্যয় মনে করা হইত না। আজও পৃথিবীর যেকোনো এম্বেসি বিদেশে ইহা অপেক্ষা বেশি অর্থের অপব্যয় করেন।

ভারত যদি আজ স্বাধীন হইত তবে আকরম খাঁ সাহেবের মতো মৌলানার ধর্মেচ্ছা সরকার সানন্দে পূর্ণ করিতেন। মৌলানা সাহেবকে মুখ খুলিয়া বলিবার প্রয়োজনই হইত না।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৬.১.১৯৪৫

ছয়

লিখিতে মন চায় না। যেসব বন্ধুরা জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের কারাকাহিনী শুনিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে, মনে হয় এই অর্থহীন প্রলাপের কী প্রয়োজন? জানি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অধমের লেখা সহ্য করেন, কেহ কেহ পত্র লিখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু যেসব কাহিনী শুনি, নিষ্কৃতদের যে ভগ্নস্বাস্থ্য দেখি তখন সে কাহিনী, সে অবস্থা সত্যের লেখনী সংযোগে পাঠকের হৃদয়মনে সঞ্চারিত করিতে পারি না বলিয়া বহু বৎসরে যে সামান্য সাধনা-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা পণ্ডশ্রম বলিয়া ধিক্কার দিই।

নিষ্কৃতদের অভিজ্ঞতা এতই সহজ, এতই সরল যে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্যালঙ্কার বিড়ম্বিত, 'মার্জিত' লিখনশৈলী অপমানিত।

সহৃদয় পাঠক এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য মার্জনা করিবেন।

www.pathagar.com

* * *

আমার এক বন্ধু যাহাকে বলে উন্নাসিক। অতি সদর্থে। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এতই প্রবল, দেশের মঙ্গলেচ্ছা এতই অনাবিল যে, বিদেশীয় কয়েকটি সাহিত্যসম্পদে গৌরবান্বিত ভাষা জানা সত্ত্বেও সেসব সাহিত্যের উত্তম উত্তম কাব্য-দর্শন পড়িবার তাঁহার সময় হইত না— নাটক-নভেল মাথায় থাকুন। তুলনামূলক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি— তাহাদের ইতিহাস— ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে তাঁহার সময় ফুরাইয়া যাইত।

কারাপীড়নে অধুনা তিনি আর কিছুতেই চিত্তসংযোগ করিতে পরিতেছিলেন না বলিয়া (সেতারখানাও ফেরত পাঠাইয়াছিলেন) আমার কাছে True Story, Detective Story জাতীয় তরল বস্তু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখে-সুখে মিশ্রিত হৃদয় লইয়া পাঠাই। খবর পাইলাম সদাশয়, I. B. সেগুলি এ যাবৎ তাঁহাকে দেন নাই। সকরকারের এই কি ভয় যে, তিনি ডিকেটটিভ গল্প হইতে আণবিক বোমা বানাইবার কায়দা রপ্ত করিয়া সর্বজনীন দাতব্য কারাগার প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবেন— না ট্রু স্টরি হইতে আদিরসাত্মক গল্প পড়িয়া তাঁহার চরিত্রদোষ হইবে। সরকারের হেফাজতে যখন আছেন, তখন তাঁহার 'চরিত্র রক্ষা' করা তো সরকার-গার্জেনেরই কর্ম!

* * *

আরেক বন্দি ছিলেন অরসিক। তিনি একখানা biology-র প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক চাহিয়া পাঠান। নামঞ্জুর। কয়েকজন রাজবন্দি একযোগে কারণটি অতি বিনয় সহযোগে জানিতে চাহিলেন। উত্তরটি অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতেছি।

'মশাই, আপনারা যে কখন কী চেয়ে বসেন, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ এ biology, কাল ও biology পরশু সে biology!'

রাজবন্দিদের কেহ দার্শনিক, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ নৃতত্ত্ববিদ। সকলেই হতবুদ্ধি; ব্যাপারটা না বুঝিতে পারিয়া একে অন্যের মুখের দিকে তাকান। Biology যে আবার পঁচিশ কেতার হয় তাহা তো তাঁহারা কখনও শুনেন নাই!

রহস্য সমাধান হইল; I. B. নৈরাশ্যের দরদীয়া সুরে বলিলেন, 'কোনদিন যে শেষটার গান্ধীর biology চেয়ে বসবেন না তারই বা ভরসা কোথায়? তখন আমি কোথায় যাই বলুন তো?'

I. B. বিদ্যাসাগর biology ও biography-তে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন।

গুরু সাক্ষী, ধর্ম সাক্ষী, দোষ দিতেছি না। অত পাণ্ডিত্য না ধরিলে বড়কর্তা I. B.-র সেনসর হইবেন কেন? ইহার চেয়ে অল্প বিদ্যায়ও আইনস্টাইনকে রিলেফটিভিটি শিখানো যায়, অফিসারটিকে আমরা সবিনয় সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি হুঁশিয়ার হইয়া না চলেন, তবে একদিন দেখিবেন যে, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষার্থে অক্সফোর্ডের বড়কর্তারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের তখতে বসাইয়া দিয়াছেন।

আরেক বন্দি অতি সুপুরুষ। কাঁচা সোনার বর্ণ, ঢেউ খেলানো বড় বড় কালো চুল, খড়্গে র মতো নাক, আর দরাজি কপাল। যতদিন বাহিরে ছিলেন মাতা ও স্ত্রীর উৎপাতে মাঝে মাঝে দাড়ি কামাইতেন— অর্থাৎ মুখমণ্ডল ঘন-বর্ষার কদম্ব-পুষ্পের সৌন্দর্য ধারণ করিলে পর। জেলে গিয়া পরমানন্দে তিনি দাড়ি গজাইতে আরম্ভ করিলেন। সময় বিস্তর

www.pathagar.com

বাঁচিল, রাগ করিলে উৎপাটন করিবার সুলভ সহজ বস্তু জুটিল— আর চিন্তা-বিক্ষোভের কারণ তো হামেশাই উপস্থিত হইবে।

জেলে যে অতি আরামে আছেন এই বুঝাইবার জন্য তিনি সর্বদাই পত্নীকে রসে টইটম্বুর পত্র লিখিতেন। তাহারই একখানাতে নিজের তরুণ দাড়ির বর্ণনা দিয়া বলিলেন, 'চেহারাটা এখন অনেকটা ক্রাইস্টের মতো হইয়াছে।'

মহারানি ভিক্টোরিয়ার ইস্তেহারের কথা আমরা আর পাঁচজন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সর্ব ধর্মে সকলের সমান অধিকার অথবা এইরকম কিছু একটা ঠিক মনে নাই।

I. B.-র স্মরণশক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়জনক ও হৃদিত্রাস-সঞ্চারক। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। পাছে ক্রাইস্টপন্থি কাহারও মনঃপীড়ার সঞ্চার হয়, এই ভয়ে সেনসার এন্তার দুশ্চিন্তার ভার নামাইলেন ছত্রটি গিলোটিন করিয়া।

সহৃদয় পাঠক গীতা অথবা ওই জাতীয় কোনও পুণ্যগ্রন্থে আছে না, ধর্মসংস্থাপনার্থে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন?

হে biology Biography অভিন্নকরণকারী নটবর সেনসর, তোমাকে বারবার নমস্কার—

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তু তে সর্বত অব সর্ব'

'তোমাকে সম্মুখ হইতে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎ দিকে নমস্কার' তুমি যে 'অনন্তবীর্য' অনন্তবিক্রম ধরো তাহাকে সন্দেহ করিবার মতো যুগ্ম-মস্তক কার স্কন্ধে?

খ্রিস্টধর্ম 'ওয়াজ ইন্ ডেঞ্জার'— তুমি তারে করিলে উদ্ধার।

* * *

বৃথা বাক্যব্যয়। বর্তমান যুগ সাংখ্যের— অর্থাৎ Statistics-এর। তাই শুদ্ধ স্টাটিস্‌টিক্‌স্ নিবেদন করি।

১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে ভদ্রলোক যোগ দেন। ১৯২৭-এ নানাপ্রকারে প্রপীড়িত হইয়া মস্কো চলিয়া যান। ১৯২৮-এ অসুস্থ শরীর লইয়া বার্লিন। ১৯৩৩-এর কয়েক দিবস জর্মন জেল। ১৯৩৪-এ দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৫ এখানে বৌন্ড ডাউন। ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মে গ্রেফতার ও সাত মাসের জেল। ৩৭-৩৮ বাহিরে। সেপ্টেম্বর ৩৯-৪১ জেলে— প্রায় এক বছর। ৪১-৪২ এক বৎসর বাহিরে। ৪২-এর এপ্রিল পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেফতার ও বন্দি— তার পর ফতেহগড়— তার পর বাঙলা দেশের জেল— সর্বকারাগারতীর্থ পরিক্রমা করিয়া এখন তিনি তথাগত— আজও তিনি জেলে। একটানা তিন বৎসর আট মাস। কত রোগশয্যা মৃত্যুদর্শন কত হাসপাতাল, আত্মীয়স্বজনের কত আকুলি বিকুলি কত কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত প্রতিশ্রুতি কত আশানৈরাশ্যের সুখস্পর্শে পদাঘাত।

ইতোমধ্যে পত্নীর ছয় মাস কারাবাস, ভগ্নীর্শনাগতা শ্যালিকার তিন মাস ও নিরীহ পাচকের নয় মাস!

ভদ্রলোকের নাম শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগ্নস্বাস্থ্যবশত ওজন কমায় তিনি এখন ছোটলোক এবং ছোট-লোকের সঙ্গই বাঞ্ছা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.১২.১৯৪৫

www.pathagar.com

সাত

সহৃদয় পত্রলেখকগণের প্রতি আমার সকরুণ নিবেদন এই যে, আমি অতি অনিচ্ছায় অনেক সময় তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিতে অক্ষম হই। তাঁহারা যেসব বিষয় লইয়া আলোচনা চাহেন সেগুলিও সবসময় করিতে সক্ষম হই না। তাহার প্রধান কারণ 'আনন্দবাজার' বাংলা পত্রিকা; অধিকাংশ পাঠক ইংরেজি জানেন না। কাজেই তাঁহারা বহু বিষয়ের রস গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি প্রধানত তাঁহাদিগের সেবা করিতে চাহি বলিয়াই 'আনন্দবাজারে' লিখি। গুণীরা 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে' লেখেন। আবার কোনও কোনও পাঠক শাসাইয়া বলিয়াছেন, 'সত্যপীর সাবান ইত্যাদি সামান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করে কেন, সাবানের আলোচনাও তাহার নিকট হইতে শুনিতে হইবে নাকি?'

আমার বক্তব্য, আমি অত্যন্ত সাধারণ রাস্তার লোক, ম্যান ইন দি স্ট্রিট। দুর্বলতাবশত মাঝে মাঝে পণ্ডিতি করিবার বাস্‌না উদ্রেক হয়। এবং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হই। সহৃদয় পাঠক, আপনার কি সত্য সত্যই এই অভিলাষ যে, অধম প্রতি শুক্র শনি সিন্নি (শিরনি) ও পূজার পরিবর্তে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক তিরস্কৃত হউক?

অতঃপর বক্তব্য 'সাবান' বস্তুটি বুদ্বুদসমষ্টি বলিয়া কি সে সম্বন্ধে আলোচনা বুদ্বুদেরই ন্যায় অসার? গুরুজন, জর্মন পণ্ডিত ও যোগীকে এক সাবানে সম্মিলিত করিতে সমর্থ হইলাম সে কি কম কেরদানি? হায় পাণ্ডিত্য করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হই, সাবানের মতো নশ্বর বস্তু লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াও পণ্ডিতের যষ্টিতাড়না হইতে নিষ্কৃতি নাই। উপায় কী?

ভাবিয়াছিলাম অদ্য ইলিশ মাছ কী প্রকারে 'দম পোখ্‌ত' রান্না করিতে হয় তাহা সবিশদ বর্ণনা করিব। সে অতি অদ্ভুত রান্না। আস্ত মাছখানা হাঁড়িতে রাখিবেন, আস্ত মাছখানা রান্না হইয়া বাহির হইবে। অনভিজ্ঞের কণ্ঠত্রাসসঞ্চারক ক্ষুদ্র কাঁটাগুলি গলিয়া গিয়াছে, বৃহৎ কাঁটাগুলোর তীক্ষ্ণতা লোপ পাইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে কোনও কোনও অঞ্চলে এইপ্রকার রান্নার কায়দা এত গোপন রাখা হয় যে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় শপথ করিয়া যাইতে হয় যে, সে শ্বশুরবাড়ির কাহাকেও পঞ্চম মকারের বাঙালি বল্লভ এই 'ম' কারটার গভীর গুহ্য তত্ত্বটি শিখাইবেন না।

সেই গোপন তত্ত্বটি আজ যবনিকান্তরাল হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির করিব মনস্থির করিয়াছিলাম। সর্বরহস্য সর্বকালের জন্য সমাধান করিয়া বহু মধুর নির্যাতন, পরিবারে পরিবারে দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু গম্ভীর পাঠকের তাড়নায় মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

ফলে ইলিশের কাঁটা আরও এক শত বৎসর বহু অনভিজ্ঞের গলায় বিঁধিবে— কিন্তু আমার তাহাতে পাপ নাই।

বাঙালদের কথাই হউক।

এক বাঙাল বেগুন চাহিতে গিয়া 'বাইগন' বলিয়াছিল; তাহাতে 'ঘটির' রসোদ্রেক হয় ও বারবার ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, 'কী বলিলে হে? কী কথা বলিলে?' বাঙাল লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ নিজের উচ্চারণ লুকাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'বেশ কইছি, বাইগন কইছি, দোষডা কী হইল?' ঘটি আত্মপ্রসাদজাত মৃদুহাস্য করিয়া বলিল,

www.pathagar.com

‘ “বাইগন”! ছোঃ! কী অদ্ভুত উচ্চারণ। আর শোনো তো আমরা কীরকম মিষ্টি উচ্চারণ করি, “বেগুন”!’ বাঙাল চটিয়া বলিল, ‘মিষ্টি নামই যদি রাখবা তবে “প্রাণনাথ” নাম দেও না ক্যান? চাইর পইসার “প্রাণনাথ” দেও। একসের “প্রাণনাথ” দেও। হইল?’

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আদেশ উপস্থিত। পত্রলেখক বলিয়াছেন যে সংস্কৃত উচ্চারণ লইয়া যখন আমি এত মাথা ফাটাফাটি করিতে প্রস্তুত তখন বাঙলাকে অবহেলা করিবার কী কারণ থাকিতে পারে? বাঙলা উচ্চারণ কি সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষাও অধিক জরুরি নহে?

নিশ্চয়ই! কিন্তু মুশকিল এই যে, বাঙলা উচ্চারণ এখন অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছে। প্রধানত রেডিয়োর কল্যাণে। পূর্ববঙ্গে এক ব্যাপক চেষ্টা দেখা যাইতেছে, মোটামুটি যাহাকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ বলা হয় তাহার অনুকরণ করিবার।

অথচ ‘বেগুন’ অপেক্ষা ‘বাইগন’ই আমার কানে মধুর শোনায়। কিন্তু মাধুর্যই তো শেষ কথা নয়। পশ্চিমবাংলা ‘চ’ ও ‘জ’ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের যে মোলায়েম ‘চ’ ‘জ’য়ের গার্হস্থ্য সংস্করণ আছে তাহা অনেক পশ্চিমবঙ্গবাসীরও ভালো লাগে, কিন্তু উচ্চারণ দুইটি যে ঈষৎ অনার্যোচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুল বলিলে ভুল বলা হয় না।

কিন্তু তর্ক ও আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথম প্রশ্ন আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী? বাঙলা প্রাণবন্ত, বর্ধনশীল ভাষা। তাহার নানা উচ্চারণ, নানা বর্ণ, নানা গন্ধ থাকিবে। থাকা উচিত। অথচ চট্টগ্রাম বাঁকুড়াকে বুঝিবে না। মেদিনীপুর শ্রীহট্টকে বুঝিবে না— সেকথাও ভালো নহে।

অধম যখন যেখানে যায় সেখানকার উচ্চারণ শিখিবার চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়। ইহা ছাড়া যে অন্য কোনও সমাধান আছে ভাবিয়া দেখে নাই। পাঠক কী বলেন?

পূর্ববঙ্গের কথা উঠিলেই মনে হয় যে, তাহার লোক-সাহিত্যের প্রতি কী অবিচারই না করা হইয়াছে। এ যাবৎ, সেই অফুরন্ত সাহিত্য হইতে কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে? গীত, বারমাস্যা ছাড়াও ‘আমির হামজা’ ‘গুলে বাকওয়ালি’ প্রভৃতি বিদেশি কেচ্ছার পূর্ববঙ্গীয় রূপান্তর যে কী আনন্দদায়ক তাহা সুরসিক মাত্রই জানেন। ‘লয়লা-মজনু’ শুষ্ক মধ্য আরবের নায়ক-নায়িকা, যেখানকার কবি গাহিয়াছেন— ‘হে প্রিয়া, প্রার্থনা করি পরজন্মে যেন তুমি এমন দেশে জন্মাও যে দেশের লোক জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার মতো বিলাস উপভোগ করিতে পারে।’

সেই শুষ্ক আরবের নায়িকা লায়লি পূর্ববঙ্গের কেচ্ছায় অন্য রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। নৌকায় চড়িয়া— উটে নহে, প্রিয়সন্দর্শনে যাইতেছেন। ছৈয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া কমল তুলিতেছেন, সিঙ্গাড়া তুলিতেছেন। পদ্ম খোঁপায় গুঁজিতেছেন।

পূর্ববঙ্গের কবির সাহস অসীম যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অপূর্ব।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.১.১৯৪৬

ঘরে-বাইরে

প্রতি সোমবার তোমাদের আনন্দমেলার জানালার বাইরে বসে তোমাদের কথাবার্তা শুনি আর ভাবি ‘হায়, আমাকে কেউ ভেতরে ডেকে নেয় না কেন?’ জোর করে সবাই আমাকে বসিয়ে রেখেছে গুরুজনদের সঙ্গে, বয়স আমার বেশি বলে। কেউ জানে না, আমার বয়স ‘কমতির’

www.pathagar.com

দিকে; বয়স কমতির দিকে কী তার মানে জানো না? কেন সুকুমার রায়ের হ য ব র ল পড়নি? ওরকম বই দু খানা হয়নি। তাতে টেকো বুড়ো জিগ্যেস করছে, 'বয়স কত?' ছেলেটি বলল, 'আট'। টেকো জিগ্যেস করল, 'বাড়তি না কমতি?' ছেলেটি বলল, 'সে আবার কী?' টেকো বলল, 'তা-ও জানো না? এই মনে কর আমার বয়স চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ হচ্ছে, তখন "বাড়তি"। বিয়াল্লিশে পৌঁছতেই ঘুরিয়ে দিলুম, তখন ফের একচল্লিশ, চল্লিশ, ঊনচল্লিশ হয়ে "কমতিতে" চলল। তা না হলে বুড়ো হয়ে মরি আর কি? এখন আমার বয়স চোদ্দ। "কমতি" চলছে!' শুনে ছেলেটি হেসেই খুন— টেকো বুড়োর বয়স নাকি চোদ্দ!

হেসো না, সত্যি বলছি আমার বয়স কমতির দিকে। সেদিন দেখি 'চিঠির থলি'তে তোমাদেরই এক বন্ধু নদীয়ার সভ্য (১৪৪১৬) সত্যপীরের লেখা নিয়ে 'মৌমাছি'র সঙ্গে আলোচনা করেছে। জানালার পাশে বসেছিলুম, তখুনি ডিঙিয়ে এসে 'আনন্দ-মেলা'র খেলাঘরে ঢুকে পড়লুম। ভাবলুম অসভ্য থেকে সভ্য হয়ে গিয়েছি; এইবার দুনিয়ার নানাদেশ ঘুরে যে নানাগল্প যোগাড় করে রেখেছি তারই এক একখানা ছাড়ব আর তোমরা বুঝে নেবে আমার বয়স 'কমতির' দিকে কি না।

পয়লা নম্বর এই বেলা শুনে নাও।

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। জগদানন্দ রায়ের নাম শোনোনি, বই পড়নি? তবে ভুল করেছ। তিনি একদিন ক্লাসের একটি ছেলের কান মলে দিচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ভেতরে অবশ্যি মারধোর করা বারণ, কিন্তু একদম কেউ যদি সে আইন না ভাঙে তবে লোকে জানবে কী করে যে আইনটা আদপেই আছে। তাছাড়া তিনি তাকে কানে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন— সে তো তখন আর আশ্রমের ভেতর নয়— উপরে। আশ্রমের ভেতরেই তো মারধোর বারণ। তা সে আইনের কথা থাক— জগদানন্দবাবু ছেলেদের এত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন যে কেউ কখনও ওসব জিনিসে খেয়াল করত না।

কিন্তু ঠিক ওই সময় বড়বাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন। 'বড়বাবু' কে জানো? তিনি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়দাদা। গুরুদেব, গান্ধীজি ওঁকে বড়দাদা বলে ডাকতেন। গেল শতক আর এই শতক নিয়ে হিসাব করলে আমাদের দেশে দু জন সত্যিকার দার্শনিক জন্মেছেন— একজন বড়দাদা, আরেকজন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ব্যাপারটা দেখে বড়বাবু বাড়ি গিয়ে জগদানন্দবাবুকে একটা দোহা লিখে পাঠালেন,

'শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব, অশ্বেরে পিটিলে হয় সে গাধা!'

আমরা তো হেসেই খুন। 'গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না', সেকথা তো সবাই জানতুম, কিন্তু ঘোড়াকে পিটলে যে সে গাধা হয়ে যায় এটা বড়বাবুর আবিষ্কার! আর জগদানন্দ দাদার সঙ্গে গাধা শব্দের মিল শুনে আমাদের খুশি দেখে কে?

জগদানন্দবাবু মনের দুঃখে সেদিন থেকে কানমলা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪.৯.১৯৪৫

www.pathagar.com

ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঐতিহ্য

হটেনটট এবং ভারতবাসীতে পার্থক্য কোথায়?

শিক্ষাবিদ পণ্ডিতেরা সমস্বরে বলেন, 'কোনও পাথর্ক্যই নেই। উত্তম বাতাবরণে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে প্রাপ্তবয়স্ক হটেনটট ও ভারতীয়ে কোনও পার্থক্য থাকে না।'

কিন্তু ঐতিহাসিক বলেন, 'পার্থক্য বিলক্ষণ আছে। হটেনটট যখন তার শিক্ষাদীক্ষা সমাজ এবং রাষ্ট্রনির্মাণে নিয়োগ করে, তখন পদে পদে তার কাছে ধরা পড়ে, যে ঐতিহ্য যে সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে উন্নত সমাজ আগুয়ান হয়, তার সে ঐশ্বর্য নেই। এবং নেই বলে তাকে যে প্রতি সমস্যায় অন্য সংস্কৃতি থেকে ধারই শুধু করতে হয় তা নয়, তার সম্পূর্ণ ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দিতেও সে তখন অসমর্থ হয়।'

দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা সরল হয়ে যায়। বেদ উপনিষদের ঐতিহ্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হওয়া সম্ভবপর হত না, যোগচর্চার ঐতিহ্য না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানৈশ্বর্য না পেলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনকে মোহিত করতে পারতেন না। বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বপ্রেম এদেশে না থাকলে মহাত্মাজি যুযুৎসু-ইংরেজকে অহিংস পদ্ধতিতে পরাজিত করতে পারতেন না।

যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের এই যে ঐতিহ্য, একে অবহেলা করেই ইংরেজ তার আপন শিক্ষাপদ্ধতির বিকৃত অনুকরণ এদেশে বিস্তার করেছিল। যে সম্পদে আমাদের গৌরব, ইংরেজ সে সম্পদ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেনি, ধরলে আজ আমরা এতদূর আত্মবিস্মৃত হতুম না।

শুধু তাই নয়, সংস্কৃত-চর্চা যদি শুধু ইংরেজের স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে আমাদের ঐতিহ্যের পনেরো আনা এতদিন লোপ পেয়ে যেত। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত কয়খানা সংস্কৃত বই প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে এক নির্ণয়সাগর প্রেসের তুলনা করলেই ইংরেজ স্থাপিত বিদ্যায়তনের দৈন্য ধরা পড়ে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরেজের অবহেলা, ইংরেজ রাজত্বের অর্থনৈতিক নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের ভট্টপল্লি, কাশী, পুণা, মাদুরা এখনও লোপ পায়নি।

হটেনটটের সঙ্গে এখানেই আমাদের পার্থক্য। আমরা ভারতবর্ষে যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছি, তার জন্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে ঐতিহ্যগত অফুরন্ত সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদ কাজে লাগাবার কোনও লক্ষণ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। রাষ্ট্রভাষা কী হবে, শিক্ষার

www.pathagar.com

মাধ্যম কী হবে সে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এবং সে সংস্কৃতির প্রধান বাহন টোল-চতুষ্পাঠী কী প্রকারে আমাদের প্রধান প্রধান শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের শিক্ষাকে ঐতিহ্যলোকমণ্ডিত সর্বাঙ্গসুন্দর করবে, তার তো কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

জানি, শুধু টোল-চতুষ্পাঠীর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাচর্চা সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা জানি, দেশের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা বৃহত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রস্তুত করতে পারবে না।

তথাকথিত প্রগতিপন্থিরা হয়তো বলবেন, 'অতীতের "জঞ্জাল" বাদ দিয়ে "মুক্ত মনে" অগ্রসর হও।'

উত্তরে নিবেদন করি, ১৯১৯ সালে রুশও এই কথাই বলেছিল। অতীতের 'জঞ্জাল'কে বিসর্জন দিতে গিয়ে তখন সে যে শুধু ধর্মকে নিষ্পেষিত করেছিল তা নয়, টলস্টয় পুশকিন টুর্গেনিভের মতো লেখকের ঐতিহ্যও বাদ দিয়ে সে 'নতুন সংসার' পেতেছিল। কিন্তু যেদিন জর্মনি তার সে সংসারে আগুন ধরাল তখন দেখা গেল, সে সংসার বাঁচাবার জন্য আগ্রহের বড়ই অভাব। তখন আবার খোলা হল গির্জাঘর, আবার ডাক হল অনাদৃত ঐতিহ্য-পন্থিদের, আবার চিৎকার করা হল 'পবিত্র রাশিয়া'র (Holy Russia) নামে, আবার আহ্বান প্রচারিত হল টলস্টয়, পুশকিনের দেশকে বাঁচাবার জন্য।

রুশ সেদিন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'জয়তু ইভান দি টেরিব্‌ল্।' 'জয়তু ঐতিহ্যঘন মার্কস' বলেনি।

ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করবে কে? ভারতীয় ইতিহাসের সে ধারার সন্ধান কোথায়— যে ধারা বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু আর্য, বহু অনার্যকে এক করে নিয়ে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে বিশ্বমানবকল্যাণের সাগরসঙ্গমের দিকে বিজয়গর্জনে অগ্রসর হয়েছিল?

ঐতিহ্যগত সে সংস্কৃতিধারার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সংযুক্ত না হয়, তবে হটেনটটে-ভারতীয়ে কোনও পার্থক্য থাকবে না।

দৈনিক বসুমতী

'৪২—'৪৫

কেহ বলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই; কেহ বলেন আন্দোলন কংগ্রেসের ছিল না, ফলপ্রসূ হইল কি না তাহাতে কংগ্রেসের লজ্জিত বা মর্মাহত হইবার কিছুই নাই; কেহ বলেন, না, আন্দোলন কংগ্রেসেরই এবং বহু দেশপ্রেমিক তাহার সর্ব দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছেন।

এসব তো তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল লইয়া হাতিবাগানের নৈয়ায়িকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক। জিজ্ঞাসা করি, আগস্ট মাসে সমস্ত দেশব্যাপী জাগরণে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা কি উকিল ডাকিয়া আইন মিলাইয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন? মনে পড়ে বোম্বাই শহরের স্কুল-কলেজের ছেলেরা সেদিন উৎসাহের আবেগে কী কাণ্ডটাই না

www.pathagar.com

করিয়াছিল। যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহার কোনওটাই হয়তো স্বরাজের পথ সুগম করিয়া দেয় নাই, পক্ষান্তরে হয়তো স্বরাজ সাধনার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু সেই রাসায়নিক বিশ্লেষণই তো শেষ কথা নয়। গরুড়ের ক্ষুধা লইয়া মানুষ যখন জাগে, তখন কি তার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা বোধ থাকে? কিন্তু ক্ষুধাকে নমস্কার করি, সেই জাগরণকে দেশের চরম মোক্ষ বলিয়া জানি, স্বরাজ আজ পাইলাম অথবা দশ বৎসর পরেই পাইলাম। ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষের মুখপাত্র। কংগ্রেসের আন্দোলন দেশের আন্দোলন, ও স্বরাজ লাভের জন্য দেশের জনসাধারণের ব্যাপক আন্দোলন মাত্রই কংগ্রেসের আন্দোলন— সে স্বতঃস্ফূর্তই হউক আর ধৈর্যচ্যুতিবশতই হউক।

কারণ, এই জাগরণই কি সত্য নয়? এই জাগরণের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা প্রাণ দিলেন তাঁহারা কি স্বরাজ পান নাই? তাঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর-লোকে যায় নাই? রাজার রাজা যিনি তাঁহার ক্রোড়ে কি তাঁহারা আসন পান; স্বরাজ যেদিন আসিবে সেদিন দুই মুষ্টি অন্ন হয়তো বেশি পাইব; হয়তো রমণীরা আরও বেশি অলঙ্কার পরিবেন; হয়তো পণ্ডিতেরা আরও বেশি পুস্তক লিখিবেন, হয়তো বিসূচিকায় কম প্রজা মরিবে, কিন্তু মুখ্য যাহা পাইব তাহা তো স্বাধীনতা; এবং নিশ্চয়ই জানি সে স্বাধীনতার প্রথম যুগে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত দেশকে গড়িতে গিয়া আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক দৈন্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তবুও যাহা আসিবে তাহা স্বরাজ।

সেই স্বরাজ কি তাঁহারা পান নাই— যাঁহারা প্রাণ দিলেন, যাঁহারা কারাগারে উৎপীড়িত হইলেন? জাগ্রত হইয়া মরিবার পূর্বে যে কয়দিন, যে কয় দণ্ড তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের মনে, তাঁহাদের সর্ব অস্তিত্বে, সর্বচৈতন্যে তো তখন স্বরাজ। তখন তাঁহারা পুলিশের এ আইন মানেন নাই, কানুন ভাঙিয়াছেন, রাজাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, রাজপুরুষের হুঙ্কারের সম্মুখে অট্টহাস্য করিয়াছেন। তাঁহারা তো তখন দেহমনে মুক্ত পুরুষ। তাঁহারা তো চলিয়াছেন, চলার পথে—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

পুষ্পিণৌ চরতো জঙ্ঘে ভুষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ
শেরেহস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক হইতেও তাহার অপূর্ব শোভা পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হইতে থাকে; এই তো মস্ত ফল। তার পর তাহার চলার শ্রমে চলিবার মুক্ত পথে তাহার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

www.pathagar.com

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো না তন্দ্রয়তে চরন্ ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাই হইল অমৃত লাভ, চলাই তার স্বাদু ফল, চাহিয়া দেখ ওই সূর্যের আলোকসম্পদ যিনি সৃষ্টির আদি হইতে চলিতে চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ভারতের সংস্কৃতি, পৃ. ১৩। ৪)

চলা ও পৌঁছা সে মৃত্যুঞ্জয় বীরদের এক হইয়া গিয়াছিল। কে বলিবে তাঁহারা শুধু কর্মই করিয়াছিলেন, ফল পান নাই। স্বাধীন জাতি যে আনন্দ ভোগ করিবার সুযোগ কখনও পায় না— অধীনতা হইতে স্বাধীনতা অর্জনের যে আনন্দ, বিরহের পর রাধার কৃষ্ণমিলনের যে আনন্দ— সেই আনন্দ সেই অমৃত মৃত্যুক্ষণে তাঁহারা পান করিয়া অমর হইলেন।

আর যাঁহারা অধর্ম অন্যায়ের স্বহস্তনির্মিত কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে সঙ্গীহীন বন্ধুহীন কর্মহীন জীবনযাপন করিলেন, তাঁহারা তো আরও নমস্য। স্বরাজ তাঁহারা কারারুদ্ধাবস্থায় অন্তরে অন্তরে হারাইলেন না তাঁহাদের আত্মত্যাগ রুদ্ধগতি অন্তর্মুখী হইয়া পর্বতকন্দরে আবদ্ধ বর্ষার স্রোতের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া স্ফীত হইয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। এই মাত্র বলিতে পারি, কর্তব্যকর্ম উপেক্ষা না করার যে বিবেকানন্দ, তাহা তাঁহারা সকলেই পাইয়াছেন— আজ যাঁহারা নষ্ট স্বাস্থ্য, ভগ্নোৎসাহ, হৃতআদর্শ হইয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহারাও তো কিয়ৎকালের জন্যও পরমহংস হইয়াছিলেন। আজ যদি তাঁহাদের কেহ কেহ নির্জীব, প্রাণহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। আমরা যাহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াই নাই, সে রাজাধিরাজদের হাত ধরিয়া সম্মুখে চলি নাই, আমরা যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে, ক্ষুদ্র ভয়ের ভ্রুকুটিতে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম। শ্যামল নির্মল কোমল উত্তরীয় বিছাইয়া নিদ্রালস নয়নে দেখিলাম প্রসারিত হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, শুনিলাম চরৈবেতি, চরৈবেতি, কিন্তু উঠিলাম না। তবু জানি, সে হস্ত আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছিল— তাঁহারা তো স্বরাজ পাইয়াছেন; এই পাপীদের জন্যই তো তাঁহাদের আত্মদান, বলিদান।

কারাগারে কি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই, আশা করেন নাই যে, আমরা, তাঁহাদের ভ্রাতা-বন্ধুরা তাঁহাদের দেবত্বের এক কণাও অন্তত পাইয়াছি? বিদেশি রাজের দয়ায় যেন একদিন তাঁহাদের নিষ্কৃতি পাইতে না হয়। তাঁহারা কি আশা করেন নাই যে, একদিন আমরা তাঁহাদিগকে মাথার মণি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিব? এখনও যাঁহারা মুক্তি পান নাই, তাঁহাদের জন্যই বা আমরা কী করিতেছি?

তার পর আসিল দুর্ভিক্ষ। তাঁহাদের অভাব আমরা যে তখন কী নিদারুণভাবে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাংলা দেশ কখনও ভুলিবে না। অন্নাভাবে মরিল বহু লোক, কিন্তু তাহারও বেশি লোক মরিল প্রয়োজনীয়, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে। এক বিদেশি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কোটি কোটি জনগণের মধ্যে সামান্য যে কয়টি দেশসেবক জেলে আছেন, তাঁহারা ছাড়া দেশে কি অন্য কর্মী নাই?' শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলাম, 'নাই, এই হতভাগা দেশে ভগবান যে-কয়টি মানুষ নির্মাণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্বগুণই

www.pathagar.com

অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদের কেহ কবি, কেহ চিত্রকর, কেহ দার্শনিক, কিন্তু সকলেই সেসব গুণ উপেক্ষা করিয়া দেশসেবাকে প্রধান স্থান দেন। কবিকে কবি বলিলে কবি লজ্জিত হন, দার্শনিককে দার্শনিক বলিলে তিনি আর বন্ধুর মুখদর্শন পর্যন্ত করিতে চাহেন না; তিনি হয় হইতে চান স্বাধীনতা জেহাদের সিপাহি নতুবা শহিদ। কাব্যে-দর্শনে যেসব কৃতিত্ব পূর্বে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলিকে অবান্তর, অপরিপক্ব বালসুলভ চপলতা বলিয়া ধিক্কার দেন, বিদেশিকে বলিয়াছিলাম, ইঁহারাই আমাদের সাত রাজার ধন মানিক, সর্পের মণি। মণি অপেক্ষা সর্প অনেক বৃহৎ, কিন্তু মণিহারা ফণী, আর আমাদের দেশপ্রেমী কর্মী ব্যতীত দেশ একই অভিসম্পাত।

জানি, কেহ কেহ সস্তায় দেশের জনসাধারণের মন কাড়িবার জন্য কাজের ভান করিয়াছিলেন, অথবা যেখানে ভান করিতে সক্ষম হন নাই, সেখানে ঈষৎ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-ও জানি, তাঁহাদের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের ফলেই বহু দেশপ্রেমিককে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল— সেকথা ভুলি নাই, ভুলিবার ইচ্ছাও রাখি না। তবে সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই।

তার পর ছিন্নভিন্ন কর্মীদের মধ্যে অবসাদের যুগ আসিল। পলায়িত, পুলিশতাড়িত ইঁহারা এই গৃহে ওই গৃহে আশ্রয় খুঁজিলেন। আমরা অধঃপাতের শেষ সীমায় পৌঁছাই নাই বলিয়া ইঁহারা আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উদ্যমহীন ভগ্ন জীবন দেখিয়া অন্তরে অন্তরে কী যাতনাই না ভোগ করিয়াছি। এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, তুমি তো এককালে ভালো কবিতা লিখিতে, লেখো না দুই-একটি; আমার বাড়িতে কি অমনি অনুধ্বংস করিবে? মনে আছে আমার রুগ্‌ণ বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর বাড়ি দেখি জেলের চেয়েও খারাপ। জেলেও তো সরকার বিনা পয়সায় খাইতে দেয়, তুই যে কবিতা চাস। না হয় তোর বাগানে জল ঢালিয়া দিব।' আশ্চর্য হইলাম, মাসের পর মাস গ্রাম হইতে গ্রাম অনশনে, পথশ্রান্তিতে, মানসিক উদ্বেগে কাটাইয়াও তাহার সেই বিমল রসিকতা করিবার ক্ষমতাটি যায় নাই। আশা আছে; তাহা হইলে আশা আছে— ইঁহাদের মেরুদণ্ড কোনও রাজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে পারিবে না। ইঁহাদের অবসাদ ক্ষণিক, ইঁহাদের স্থিতি মায়া, মিথ্যা। ইঁহারা আবার অগ্রসর হইবেন।

এখনও আমাদের আত্মজনরা কারাগারে আছেন। নিষ্কৃতি তাঁহারা পাইবেন কিন্তু তাহা মুক্তি নহে। তাঁহাদিগের মুক্তি দানের সম্মান আমাদের হাতে ছিল; আমরা খোয়াইয়াছি।

বোম্বায়ের সম্মেলনে ইঁহাদের অশরীরী সত্তা উপস্থিত থাকিবে। আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা করি যাহাতে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগে অথবা তাহাদের কর্তব্যবোধের বিপক্ষে যায়। নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কর্মীরা ইঁহাদের সঙ্গে এতদিন কারাগারে কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের কপালে কারাগারের লাঞ্ছনা-লাঞ্ছন অঙ্কিত, তাঁহারাই ইঁহাদের চিনেন; তাঁহারাই যেন সেখানে প্রধান হোতা প্রধান বক্তা হন।

আর যাহারা অগ্রদানী হইয়াছিল, তাহারা যেন সে সভায় প্রবেশাধিকার না পায়।

আর যাঁহারা পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে রাজায়-প্রজায় ভেদ নাই, যেখানে আলিপুর, দমদম নাই, যেখানে পূজার থালাতে ভাইয়ের রক্ত ছিটাইবার লোক নাই, সেখানে হইতে তাঁহাদের আত্মা এই সম্মেলনের কর্মকর্তাগণকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

'দেশ' পত্রিকা. ২২.৯.১৯৪৫

www.pathagar.com

একদা যাহার বিজয় সেনানী

দিল্লি যে অত্যন্ত 'দূর অস্ত্' সে খবর প্রবাদবাক্যের ভিতর দিয়ে আমরা বহুকাল পূর্বেই জানতুম। সে খবর নতুন করে হৃদয়ঙ্গম করলুম যখন সেদিন শুনতে পেলুম দিল্লিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগ এবং বিদেশে ভারতীয় রাজদূতাবাসের কর্মচারীদের জন্য ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। দিল্লি 'দূর অস্ত্'. বলেই খবরটা এত দেরিতে পৌঁছল।

দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ সব বিষয়েই কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষের কোনও শহর কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বা শিগ্‌গিরই যাবে, এ সংবাদ শুনলে আমার চিত্ত অধীর হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতাকে অবাঙালিরা নাম দিয়েছেন 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা', 'দেমাক' 'স্নবারি'। হবেও বা। 'কোনও গুণ নাই—' লেখকের কর্ণে যে এসব কটুকাটব্য মধু বর্ষণ করে, সেকথা 'বসুমতী'র পাঠক নিশ্চয়ই এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছেন। 'জিন্দাবাদ ইস কিস্‌মকি সংকীর্ণতা।'

অর্ধশিক্ষিত কাবুলিরা বলে, 'কাবুল বে-জর্ শওদ, লেকিন্ বে-বর্ফ ন বাশদ' অর্থাৎ 'কাবুল স্বার্থহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।' কারণ কাবুলিরা জানে, বরফ-গলা জল না পেলে গম ফসল ফলবে না, আর শুধু সোনা চিবিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কলিকাতা শিক্ষাদীক্ষায় অন্তত কাবুলের চেয়ে শ্রেয়ঃ, তাই বলি 'কলকাত্তা বে-জর্ শওদ, লেকিন বে-ইল্‌ম্ ন্ বাশদ।' 'কলকাতা স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই (যেটুকু স্বর্ণ আছে তা-ও তো বাঙালির হাতে নয়), কিন্তু বিদ্যাহীন যেন না হয়।'

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র 'Advancement of learning'। শুনেছি, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অন্ধানুকরণ করতে চান না বলে Learning কথাটার 'এল' হরফটি বাদ দিয়ে 'মৌলিকতা' এবং 'নিজস্বতা' বজায় রেখেছেন। তাঁদের 'Earning-ও জিন্দাবাদ!'

দিল্লিতে যে নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তার প্রধান অঙ্গ নানা বিদেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়া। বিবেচনা করি, এই শিক্ষার ফলে একদিন দিল্লিতে বহু ভাষা শিক্ষার আবহাওয়া নির্মিত হবে এবং ফলে চাকরি পাবার পরীক্ষায় বাঙালি ছেলেরা হেরে যাবে।

অথচ এই কলকাতাতেই বহুবার বহু চেষ্টা হয়েছে ফরাসি জর্মন ইত্যাদি ভাষাকে ব্যাপকভাবে চালু করবার। বিশ্ববিদ্যালয়, Y.M.C.A., সিনজেভিয়ার আমারই জানা মতে বহুবার ফরাসি জর্মনের নৈশ বিদ্যালয় খুলেছেন, ততোধিকবার বন্ধ করেছেন। বাঙালি ছেলের মন পাননি বলে।

আর সবাই তাই নিয়ে বাঙালি ছেলেকে বিস্তর কড়া কথা বলেছেন কিন্তু আমরা বলিনি। কারণ বাঙালি ছেলে যদিও আর পাঁচটি ছেলের তুলনায় জ্ঞানান্বেষণ করে বেশি, তবু তারও তো একটা সীমা আছে। তার ওপর আরেকটি তত্ত্বও ভুললে চলবে না। বাঙালি ছেড়ে স্বর্ণলোভী নয়, কিন্তু অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন তারও আছে। ফরাসি, জর্মন তাকে এতদিন চাকরির পথে কোনও সুবিধা করে দিতে পারতেন না।

এখন হাওয়া বদলেছে অথবা দু তিন বৎসরের ভিতরই হাওয়া বদলাবে। শুনেছি, পণ্ডিতজি নাকি আপসোস করে বলেছেন, 'বিদেশি বিভাগের জন্য, যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত

www.pathagar.com

লোক পাওয়া যায়নি।' বিবেচনা করি, ভাষা বাবদে ভারতীয়েরা যে অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা পশ্চাৎপদ, সে খবর পণ্ডিতজির কাছে অজানা নয়।

এস্থলে একটি বিষয় সবিস্তর নিবেদন করি। পররাষ্ট্র বিভাগ ও বিদেশের রাজদূতাবাসের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করবার সময় প্রধানত দেখা হয় প্রার্থী কয়টি ভাষা জানে। উপস্থিত একই প্রার্থী ফরাসি, জর্মন, উভয় ভাষাই জানে এরকম লোক পাওয়া যায়নি। তাই এখন কোন নীতির মাপকাঠি মেনে চাকরি দেওয়া হচ্ছে জানিনে। তার মানে নানারকম সন্দেহ আছে— সেগুলো প্রকাশ করলে সরকারের বিরাগভাজন হবার সমূহ সম্ভাবনা।

তা সে যাই হোক, কিন্তু একথা নিশ্চয় জানি, বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবনা হবে। আজ যেসব ভারতীয় রাজদূত প্যারিস, জিনিভা, চিলি, মস্কোতে আছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশি ভাষা শিখছে। এসব রাজদূতেরা আবার ঘন ঘন বদলি হন। আজ যিনি পিকিং-এ কাল তিনি ওসলোতে, তিন বৎসর পর তিনি রোমে, পাঁচ বৎসর পর তিনি হয়তো হেলসিঙ্কিতে। তাই তাঁর ছেলে-মেয়েরা দশ-বারো বৎসরের ভিতর গোটা চার-ছয় ভাষাতে সড়গড় হয়ে যায়। বিশ-ত্রিশ বৎসর পর এরা চাকরির বাজারে নামবে।

যে ছেলে সমস্ত ছাত্রজীবন কলকাতা বা বর্ধমানে কাটাল, সে ভাষা বাবদে যতই মেধাবী হোক না কেন, তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব উপযুক্ত রাজদূতের ছয় ভাষা জাননেওয়ালা ছোকরার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ফরেন আপিসে বা বিদেশি রাজদূতাবাসে চাকরি পাওয়া। তাই বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে সেইসব পরিবারের ছেলেরাই এসব চাকরি পাবে, ভবিষ্যতের জন্য তাবৎ বিদেশি চাকরি এবং ফরেন আপিস সেইসব প্রদেশের একচেটিয়া হয়ে যাবে। বাঙালিরা যদি এখন এসব চাকরিতে কিছুটা না ঢুকতে পারে, তবে বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে তার পক্ষে নাসিকাগ্র ঢোকানোও সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

পরিস্থিতিটার যে বর্ণনা দিলুম সেটা কাল্পনিক নয়। অন্যান্য সব দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেলায় যা আমাদের বেলাও তাই।

তাই বলি, সাধু এখন থেকেই সাবধান। বাঙালি যদি এই বেলা কলকাতাতে বিদেশি ভাষা শেখাবার ব্যাপক ব্যবস্থা না করে, তবে আপন ঘুম ভাঙলে দেখতে পাবে, দিল্লির কৃপায় এক খানদানি চক্করের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে চক্রব্যূহ ভেদ করা তখন আর বাঙালির পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

পাঠক হয়তো বলবেন, 'এই আড়াইখানি চাকরির জন্য অত চেল্লাচেল্লি করছ কেন?'

আড়াইখানা চাকরির কথাই শেষ কথা নয়। ফরেন আপিস ও বিদেশে স্থাপিত অগুনতি রাজদূতাবাস যে কী বিশাল শক্তি ধারণ করে, তার খবর বেশির ভাগ লোকই জানে না। কারণ এদের ক্রিয়াকলাপ আইনত 'গোপনীয়'— স্ট্রিক্টলি 'কন্‌ফিডেনশিয়াল'। যখন এদের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক হয়ে যায়, তখন হঠাৎ কোনও কোনও সময় কেলেঙ্কারি কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়ে। 'কেটোর' 'গিল্টিমেন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, একমাত্র লন্ডন ফরেন আপিস গত যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী।

বাঙালি যদি গবেট না হত ফরেন আপিসে তাদের স্থান করার জন্য আমাদের এত কান্নাকাটি করার প্রয়োজন হত না।

www.pathagar.com

তাছাড়া, ভারতীয় সভ্যতা বৈদগ্ধ্যের প্রতিভূ হওয়ার জন্য বাঙালির হক অনেকের চেয়েও বেশি। ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ। এঁদের বাণী বিদেশে প্রচার করার হক এঁদের মাতৃভাষার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের কিছুটা আছে বৈকি! তাই প্রশ্ন, দিল্লির ফরেন আপিসে আমরা এ যাবৎ ক'টি স্থান পেয়েছি? এবং ভবিষ্যতে যাতে পাই, তার জন্য কলকাতার কী ব্যবস্থা করেছি? বিশ্ববিদ্যালয় কী করছেন?

মাসিক বসুমতী

জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি অথবা হিন্দুস্থানি (অথবা অন্য যে কোনও নামেই ডাক না কেন) হবে একথা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু (এস্থলে বাঙালি পাঠককে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম আমরা এখনও ঠিক বানান করতে শিখিনি। এ বড় পরিতাপের বিষয়। পণ্ডিতজির নাম 'জওহর' নহে— যদিও তাঁর নাম এই শব্দেরই রূপান্তর। পণ্ডিতজির নাম 'জওয়াহির'— দেবনাগরী অক্ষরে 'জবাহির' বা 'জবাহর' লেখা হয়— এবং এই শব্দটি প্রাচীন পুহবি শব্দ 'জওহরের' বহু বচন। কথাটা আসলে 'গওহর' কিন্তু আরবি ভাষাতে 'গ' অক্ষর নেই বলে আরবরা তৎপরিবর্তে 'জ' অক্ষর ব্যবহার করে। 'জওহর' শব্দের অর্থ মূল্যবান প্রস্তর কিন্তু আসল অর্থ essence অথবা নির্যাস। পণ্ডিতজির নাম 'জওয়াহির' বলেই ইংরেজিতে Jawahar লেখা হয়— Jawhar লেখা হয় না। এস্থলে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি হিন্দিতে 'জবাহির' লেখা হয়, তবে ইংরেজিতে পণ্ডিতজি Jawahar না লিখে Jawahir লেখেন কেন? তার কারণ, সর্বশেষ স্বরবর্ণটি এতই হ্রস্ব যে, তার উচ্চারণ ঠিক 'i' না 'a' শোনা যায় না বলে 'a' ব্যবহার করা হয়েছে— অবশ্য আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'i' হরফটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) বহু উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে যেসব মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেগুলো আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত।

কিন্তু আমাদের— অর্থাৎ সাধারণ বাঙালির— প্রধান বিপদ এই যে, হিন্দি, হিন্দুস্থানি এবং উর্দু— এই তিন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কী, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। মোটামুটি জানি যে, হিন্দি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়, আর উর্দু আরবি বা ফারসি অক্ষরে। কিন্তু এই হিন্দুস্থানি বস্তুটি কী, এবং সেটি লেখা হয় কোন অক্ষরে?

সেকথা বুঝতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন খাঁটি হিন্দি এবং খাঁটি উর্দুর স্বরূপ চেনা। হিন্দি ভাষা বাঙলারই মতো প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশের ফল— উর্দু তাই। অর্থাৎ অতি সাধারণ হিন্দি এবং উর্দুতে কোনও পার্থক্য নেই। 'তুম কব আয়োগে?' 'মৈঁ কল কানপুর জাঙ্গা' ইত্যাদি সরল সাধারণ কথায় হিন্দি-উর্দুতে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু চিন্তা এবং অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে যখন বলি, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন' তখন হিন্দি বাঙলার মতো প্রধানত সংস্কৃতের স্মরণ নিয়ে বলে, 'ভারতবর্ষ কি রাজনৈতিক

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকে লিয়ে অর্থনৈতিক উনতিকি প্রয়োজন হৈ' এবং উর্দু সেস্থলে আরবি-ফারসির শরণ নিয়ে বলে 'হিন্দুস্থান কি সিয়াসতি আজাদিকে লিয়ে ফিস্‌কি তরকিকি জরুরৎ হৈ।'

ভাষার দিক দিয়ে এই হল প্রধান পার্থক্য।

বাঙলার সঙ্গে এই আলোচনাটা মিলিয়ে নিয়ে তাকালে দেখি বিদ্যাসাগরি বাঙলা হিন্দিরই মতো, আর 'আলালের ঘরের দুলাল' অনেকটা উর্দুর কাছে চলে যায়। কিন্তু বাঙলার সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা আজ বিদ্যাসাগরি এবং আলালি উভয় ভাষাই বর্জন করেছি অথবা বলতে পারি আমরা দুটোই গ্রহণ করেছি। 'পরশুরাম' প্রয়োজন মতো কখনও সংস্কৃত ঘেঁষা কখনও ফারসি ঘেঁষা বাঙলা লিখে যে অপূর্ব রস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, সে রস বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমরা বাঙলা লিখতে এখন আর এ বিচার করিনে, কোন শব্দ আসলে ফরাসি আর কোন শব্দ সংস্কৃত।

দিল্লি এবং যুক্তপ্রদেশে এক কালে উর্দুর প্রাধান্য ছিল বলে হিন্দিতে বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকতে পেরেছে— বাঙলার তুলনায় অনেক অনেক বেশি। কিন্তু বাঙলায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ভাষা বাবদে যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন, হিন্দিতে সেরকম কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। তাই হিন্দি ভাষা-ভাষীদের মধ্যে কিছুদিন হল এক 'ছুৎবাই' বা puritan আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা। শান্তিনিকেতন সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মুখে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে হিন্দিতে এক ভাষণ দেন। ওঝাজি আধ ঘণ্টাটাক বক্তৃতা দেন— আমি অবিহিতচিত্তে সে বক্তৃতা শুনি। লক্ষ করলুম যে, সেই বক্তৃতাতে তিনি একটি মাত্র অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেন না। যেসব আরবি-ফারসি শব্দ, হিন্দির সঙ্গে মিশে গিয়ে বহুকাল হল এক হয়ে গিয়েছে (বাঙলাতে যেরকম 'অকুস্থানের' 'অকু', ময়না-তদন্তের 'ময়না', 'সবুজ' 'সবজি', 'গরিব' ইত্যাদি শব্দের জাত-বিচার আজ আর কেউ করে না) শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেগুলো পর্যন্ত বর্জন করে বক্তৃতা দিলেন। এমনকি 'ইসকে বাদ' না বলে 'ইসকে পশ্চাৎ সে' বললেন!

উপসংহারে শ্রীযুক্ত অমরনাথ বললেন, 'হমলোগোঁকি রাষ্ট্রভাষা "সংস্কৃতময়ী" হিন্দি হোগি' অর্থাৎ হিন্দি-উর্দুর দ্বন্দ্বের আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। হিন্দুস্থানিও না, এমনকি আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি থেকেও অসংস্কৃত সর্বপ্রকার শব্দ বাদ দিয়ে তাকে সংস্কৃতের পর্যায়ে তুলতে হবে।

বাঙলার সঙ্গে মিলিয়ে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে, 'পরশুরামি সুকুমার রায়ি বাঙলা তো নয়ই, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথি বাঙলাও না, আমরা এখন সবকিছু বলব এবং লিখব বিদ্যাসাগরি বাঙলায়।'

মহাত্মাজি এ জাতীয় অতিশুদ্ধ, কট্টর হিন্দির নিন্দা করেছেন, অতিশুদ্ধ উর্দুকেও ঠিক তেমনি নিন্দা করেছেন। মহাত্মাজি চেয়েছিলেন, এই দুইয়ের সংশ্লিষ্টে গড়ে-ওঠা, নবীন নবীন চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম, তার জন্য নতুন শব্দ গ্রহণে অকুণ্ঠিত, প্রাণবন্ত সজীব ভাষা। সে ভাষা শেষ পর্যন্ত কী রূপ নেবে সে সম্বন্ধে মহাত্মাজি কিছু বলেননি, কিন্তু উপস্থিত সে ভাষার শব্দসম্পদ দেখাবার জন্য তিনি স্বয়ং একটি অভিধান নির্মাণ করেছিলেন ও সপ্তাহে সপ্তাহে আপন সাপ্তাহিকে সেটি প্রকাশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

এই ভাষার নাম হিন্দুস্থানি। এ ভাষা তেজবাহাদুর সপ্রুর অতিশুদ্ধ উর্দু নয়, পণ্ডিত মালবিয়ের (মালব্য নয়) অতিশুদ্ধ হিন্দি নয়— হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসি-মুসলমান-খ্রিস্টানির মহাশঙ্খ রাষ্ট্রভাষা।

পণ্ডিত জওয়াহিরলাল এই জাতীয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চান। পণ্ডিতজি ভাষাবিদ্ অথবা শব্দতাত্ত্বিক নন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছেন যে, আমাদের রাষ্ট্রভাষা যখন শেষ পর্যন্ত তার জন্মভূমি যুক্তপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ সর্বত্রই সে ভাষা ব্যবহৃত হবে তখন সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য। ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষে এসে Dawk, Juggernant, Choroot প্রভৃতি কত শব্দ গ্রহণ করেছে তার হিসাব নেই— যে দেশে গিয়েছে সেখানেই নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

তাই আজ ইংরেজির সঙ্গে শব্দ-সম্পদে পাল্লা দিতে পারে এমন ভাষা পৃথিবীতে নেই। ফরাসি ভাষা বিদেশি শব্দ গ্রহণে অত্যন্ত বিমুখ, তাই ফরাসি ভাষা ইংরেজির তুলনায় গরিব। পণ্ডিতজি উদারচিত্ত, গভীর দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছেন ভারতবর্ষের আদর্শ কী, সে আদর্শে পৌঁছতে হলে কী প্রকারের ভাষার প্রয়োজন।

বিশাল ভারত, বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন যাঁরা দেখতে চান, একমাত্র তাঁরাই মহাত্মাজির বাণী, পণ্ডিতজির আবেগ বুঝতে পারবেন।

অটোপ্রমোশন

বহুকাল ধরে আমি স্বদেশবাসীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের নামের পূর্বে 'ঋষি' অভিধা যোগ করতে পারতুম না বলে কেমন যেন ঈষৎ সংকোচ অনুভব করতুম। তার পর হঠাৎ (ঢাকাতে এদানির রংদারি ভাষায় 'হঠাৎ করে') এক শুভপ্রাতে আমার জনৈক মুরুব্বি পথে যেতে যেতে শুনতে পেলেন আমি তারস্বরে পরীক্ষার জিওমিট্রি মুখস্থ করছি। এক লহমার তরে থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন, পরক্ষণেই কণ্ঠস্থ করছি এলজেব্রার ফরমুলা, তার পর আরবি টেক্সটের ইংরেজি অনুবাদ, তার পর সূর্যগ্রহণের শুভঙ্করী— ক্ষণে এটা, ক্ষণে ওটা, ক্ষণে সেটা। সমুচা বছরটি কাটিয়েছি হেথা হোথা সর্বত্র গ্যাংজাম করার মোকা পেলেই তার ন্যায্য, হকসম্মত হিস্যেটি উপভোগ করে— এ তত্ত্বটি আমার মজবুর মুরুব্বিটি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এখন যে আসন্ন পরীক্ষার সামনে দিশেহারা হয়ে ক্ষণে এ সবজেক্ট ক্ষণে ও সবজেক্ট খামচাচ্ছি সেটা হৃদয়ঙ্গম করতেও তাঁর রত্তিভর তকলিফ বরদাস্ত করতে হল না। জানালা দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভর্তি কদম্ববদনখানা গলিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'ওরে ভাল্লুক, তোর সর্বাঙ্গে যে চুল। তেড়ি কাটবি কোথায়?'

হঃ!— দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সেই খাট্টা হর্‌হক্ তত্ত্বটা গিলে নিয়ে ভাবলুম, 'হায়, দু একটা সবজেক্ট হেথা হোথা নেগলেক্ট করে থাকলে মামেলা এত্‌না ঝামেলাময় হোত না। হয় টুকলি মেরে, নয় গুডবয় মেজদাকে খুঁচিয়ে তার মদৎ-কাঁকুই দিয়ে না হয় ডবল

www.pathagar.com

তেড়ি কেটে পরীক্ষার হল্ সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতুম ড্যাং ড্যাং করে। কিন্তু ওই যে পাড়ার ভেটকি-লোচন, বদনা-বদন, গাড়ু-গঠন মুরুব্বিটা যে উপমাটা দিয়ে তত্ত্বকথা বলল তার দাওয়াই কই? হ্যাঁ— সব্বাঙ্গে যখন ঘা তখন মলম লাগাই কোথায়?

কাটা ঘায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে, দিলদরাজ মেকদারে আইডিন ছিটিয়ে যাবার বেলা মুরুব্বি বললেন, 'জানিস্, বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছেন?—

ছাত্রজীবন ছিল
সুখের জীবন
যদি না থাকিত, রে,
এ-গ্-জা-মি-নে-শ-ন!'

তদ্দণ্ডেই চড়াক্সে আমার মাথায় খেলে গেল, কেন আর সব্বাই বঙ্কিমের নামের পূর্বে 'ঋষি' খেতাব এস্তেমাল করেছেন। তিনি নাকি বিএ না কী যেন কোন পরীক্ষায় ফার্স্ট না সেকেন্ড হয়েছিলেন। আমি ম্যাট্রিকের সামনেই মুক্তকচ্ছ, বে-এক্তেয়ার। হাড়ে হাড়ে বুঝলুম, কী গব্বযন্তনার ভিতর দিয়ে বিএ'র বাচ্চা তিনি বিইয়ে ছিলেন— নইলে এমনতরো একখানি টালমাটাল গর্দিশের বয়ান জুৎসই চারটি পদে প্রকাশ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়, মাইরি।

সেই অবধি আম্মো বঙ্কিমকে ঋষি নামে ডাকি— বিশেষ করে অগুনতি যেসব পরীক্ষায় দফে দফে ফেল মেরেছি তার পূর্বে এবং পরে।

বস্তুত ওই কম্মে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে আমাকে পয়লা নম্বরি স্পেশালিস্ট বলে গণ্য করা হয়েছে।

তাই বলে বিদ্যা-তন্দুর পাঠক মোটেই ভেব না, টুকলি মারা বা টুকলি মেরেও ফেল করাটা খুবই একটা ফ্যালনার ব্যাপার। কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

বহু যুগ হয়ে গেছে, যাত্রাগান বা থিয়েটার দেখতে যাইনি। তাই বলতে পারব না এখনও নাট্যজগতে 'এন্কোর এন্কোর' অর্থাৎ 'ফিন্সে'-র রেওয়াজ আছে, না উঠে গেছে। কথাটা ফরাসি 'আঁকোর'-এর বিদেশি শব্দের উচ্চারণ বিগড়ানো বাবদে অলিম্পিক-শিকারি ইংরেজি উচ্চারণ— না, বলা উচিত ছিল দুরুচ্চারণ। কোনও একটা সিন নাট্যামোদীগণকে বেহদ খুশ করে দিলে তাঁরা ঘন ঘন করতালি দিতে দিতে চিৎকার করতেন 'এনকোর, এনকোর', 'আবার অভিনয় করো, ফিন্সে বাৎলাও।' এমনকি ভীষণ গদাযুদ্ধের শেষে দুর্যোধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর 'এনকোর এনকোর' পড়লে তাকেও ফের আকাশছোঁয়া লম্ফ মেরে ফিন্সে ষষ্ঠত্ব পেতে হত— একবার মরেছে তো কী হয়েছে!

আমি যথারীতি একবার ফেল মেরেছি। পাড়ার হাড়েটক সেই জ্যাঠার সঙ্গে আচানক দেখা। বিটকেল হাসি হেসে বললেন, 'কিরে! ফেল মেরেছিস তো?'

আমি ভিট-কিলিমির একখানা সরেস হাস্যে তাঁকে ঘায়েল করে বললুম, 'বলেন কী, স্যার! অ্যামন খাসা খাসা অ্যানসার ছেড়েছিলুম যে এগজামিনার বলল, এনকোর। তাইতে ফের আসছে বছর ম্যাট্রিক দিচ্ছি।'

কিন্তু কী দরকার এসব বখেড়ার? আমি তাই অটোপ্রমোশনের দারুণ চ্যাম্পিয়ান। প্রথমেই দেখুন 'অটো' দিয়ে যেসব জিনিস তৈরি হয় তার সবকটাই অত্যুত্তম। গ্রিক 'অটো' (আসলে 'আউটো') আর সংস্কৃত 'স্বতঃ' একদম একই শব্দ। কবিগুরুর সর্বাগ্রজ তাই অটোমবিল কার

www.pathagar.com

(মোটরগাড়ির) অনুবাদ করেছিলেন স্বতঃচল = স্বতশ্চল শকট। এখন, পাঠক, তুমিই বল নিজের থেকে চলে স্বতশ্চল শকট ভালো, না ঠেলাগাড়ি ভালো! এই যে তুমি ন' মাস ধরে লড়াই লড়লে সে সময় লাখ খানেক 'অটোমেটিক' স্বতঃক্রিয় রাইফেল পেলে। আল্লাকে পাঁচ শুকরিয়া জানাতে বেশি, না লাখ মাজল লোডার, গাদা বন্দুক? এই যে তুমি স্বাধীনতা পেয়েছ, তোমার প্রধান লক্ষ্য কী? নিশ্চয়ই 'অটো+আর্কেইন' অর্থাৎ 'অটার্কি', অর্থাৎ 'স্বতঃ সম্পূর্ণ' অর্থনীতি— যাতে করে তামাম দুনিয়াটা চষে হাতির দরে ছাগল কিনতে না হয়। কিংবা ধরো 'অটোবায়োগ্রাফি'। আমার সে ক্ষ্যামতা থাকলে আমি কি আমার অটোজীবনী লিখতুম না?— নিজেকে আসমানে চড়িয়ে নিদেন তখৎ-ই-তাউসে বসিয়ে একটি ছবি যা আঁকতুম, মাইরি। চেহারায় উত্তমকুমার, গানে হেমন্ত মুখো, নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সংগ্রামে ওসমানী! অবশ্য আমার জীবনী কেউ লিখবে না। কিন্তু 'পাপিষ্টের অপমৃত্যু' নাম দিয়ে আর পাঁচজনকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমার উদাহরণ দেখিয়ে কেউ যদিস্যাৎ লিখে ফেলে? তবেই তো চিত্তির! টুকলি মারতে গিয়ে কবার যে টার্ন আউট হয়েছি সেটাও ফাঁস করে দেবে যে।

তাই বলি, অটোপ্রমোশন বা স্বতঃ উন্নয়ন অত্যুত্তম প্রস্তাব।

তবে হ্যাঁ; আমার একটা শর্ত আছে।

অধ্যাপক রোল কল করে (না করলেও খয়র!) একটু জিরোবেন। আমরা যে যার খুশিমতো ক্লাস থেকে বেরিয়ে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াব, জেবে রেস্ত থাকলে অবশ্যই মরহুম মধুর মধ্বালয়ে; যে কটা মূর্খ নিতান্তই পড়াশোনা করতে চায়, তারা তাঁর লেকচার শুনবে, পরীক্ষা দেবে, পাস করবে। যারা ফেল মারবে তারা পাবে আমাদের মতো অটোপ্রমোশন। কিন্তু চাকরির বেলা কি অটো, কি খেটো (খেটে যারা পাস করেছে) সবাই পাবে সমান চান্স। যে মহাপুরুষ সর্ব প্রথম অটোপ্রমোশনের প্রস্তাব করেছেন তিনি সাতিশয় হক কথা বলেছেন— যে, চাকরি-দেবার বেলা যে চাকরি দেয় সে তো বাজিয়েই নেয়। সে তো পরীক্ষা নেবেই। তবে দু দু-বার পরীক্ষা কেন, বাওয়া? একটা লোকের ফাঁসি হয় কবার? একই অপরাধে তো দু দু-বার সাজা হয় না। আমার কথায় পেত্যয় না মানলে শুধোন গে পাকিস্তানের প্যারা ব্যারিস্টার ভুট্টোকে! সে জানে বলে তার দেশে আটক বাঙালিদের প্রথম ডিসমিস করে, পরে জেলে পোরে।

আর কে সে গুণরাজ খান আপনাকে ভ্যাচর ভ্যাচর করে আপ্তবাক্য শুনিয়েছে যে, সে পরীক্ষায় খেটোরা ত্রিং ব্রিং করে পয়লা দোসরা হবে আর অটোরা গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরে তৌবা-তিল্লা করবে? আমি কথা দিচ্ছি, বিস্তর খেটো ভেটোতে না-মঞ্জুর হবেন আর এন্তের অটোর ফটো তুলবে প্রেস ফটোগ্রাফার।

এ বাবদে প্রকৃত সত্যটা এই বেলা শুনে নিন :

'পরীক্ষার জন্যে সর্বোত্তম প্রস্তুত ক্যান্‌ডিডেটের কাছেও পরীক্ষা হিমালয় পর্বতবৎ। ইহসংসারে গাড়লস্য গাড়লও এমন সব প্রশ্ন শুধোতে পারে যার উত্তর পণ্ডিতস্য পণ্ডিতও দিতে পারেন না।'

Examinations are formidable even to the best prepared for the greatest FOOL may ask more than the wisest man can answer— CORLTON.

পরীক্ষা মাত্রই লটারি— বাংলা কথা।

'বেতার বাংলা', ঈদ সংখ্যা— ১৪ কার্তিক ১৩৭৯

www.pathagar.com

নট গিলটি

সদ্য-সম্প্রতি কিয়জ্জনের কৃপাধন্য মশকুর এ অধমের ছোট্ট একটি রচনা কলকাতার অন্যতম সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। আমি স্ফীতমুণ্ড ন্যাজমোটা লেখক নই; তাই বিবেচনা করি সেদিন সে পত্রিকার চরম দুর্দিন ছিল। কথায় বলে, 'অভাবে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়।' রচনা-বাড়ন্তের সে কুগ্রহে প্রাগুক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রবাদটি স্মরণে এনে অধমের নাকিস লেখাটি প্রকাশার্থে প্রেস বাগে চিড়িয়াপারা উড়িয়ে দিলেন, অর্থাৎ দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লেন।

কলকাতার নাগরিকসুলভ বিদগ্ধজন আমার লেখা বড় একটা পড়েন না। পণ্ডিতজন আদৌ না, অর্থাৎ উৎকট সংকটেও মাছি ধরে ধরে খান না। যে দু একজন ভিন্ন গোয়ালে বাস করেন তেনারা দু চার ছত্র পড়ে তাচ্ছিল্যিভরে সুনিন্দিত রায় দেন 'আস্ত একটা ভাঁড়'।

আমি শ্রীরাধার ন্যায় সে নিন্দা

'চন্দন মানিয়া অঙ্গেতে লেপিনু
চরম আনন্দ ভরে।'

কেন? সেকথা আরেকদিন হবে।

অপিচ, মহানগরীতে পাওনাদারদের তাড়ায় হেথায় পালিয়ে এসে শুনি, সে খাকছার ধূলির ধূলি ভাঁড়ামিটা এতদ্দেশীয় অপর্যাপ্ত গুণিন্ তথা কবিকুল পড়েছেন এবং মর্মাহত হয়েছেন— তবে আমার যে আত্মজন এ সন্দেশটি পরিবেশন করলেন তিনি তিল ব্যাজ না সয়ে তড়িঘড়ি যোগ দিলেন 'সে মর্মবেদনা উষ্মাসহ নয়, অতিশয় সবিনয়।'

শোনা মাত্রই আমার মন-বন-উপবনের ভিতর দিনে যেন কোনও অভিসারিণী হাওয়া হাওয়ায় ভেসে গেল। আমার রক্তে তার নূপুরের রিনিরিনি যেন ঝিল্লির ঝিনিঝিনি হয়ে বেজে উঠল।

মুর্শিদের দিব্যি গিলে বলছি, আমি পীড়া-সন্তোষী নই। এই খানদানি ঢাকা শহরে আমার লেখা পড়ে যদি একটি মাত্র গুণিন্ ক্ষণতরে রত্তিভর পীড়া অনুভব করেন তবে তাই নিয়ে আমি উল্লাস অনুভব করব, এমনতরো বিঘ্ন-সন্তোষী পিচেশ আমি নই। আমি উল্লাস বোধ করেছি দশরথের ন্যায়। 'পুত্র হবে রে, পুত্রসন্তান হবে আমার'— এই একটি বাক্য পুনঃ পুনঃ চিৎকার করতে করতে মুক্তকচ্ছ হয়ে সোল্লাসে তিনি নৃত্য জুড়ে দিয়েছিলেন। পুত্র-বিরহের শোকে যে তাঁর মৃত্যু হবে সে শাপটি তিনি তখন বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। আম্মো তাই 'লৃত্য' জুড়েছি আর চিৎকার করে পাড়ার পাঁচজন রক-এর পাঁচো ইয়ারকে শোনাচ্ছি, 'পড়ে হে পড়ে; এখনও লোকে আমার লেখা পড়ে।' সমুচা ভুলে গিয়েছি, আমার লেখা তাঁদের মর্মবেদনার কারণ হয়েছে।

কিন্তু হায় সব নেশারই একটা অবসান আছে। তার পর আসে খুম্মারের খোঁয়ারি। তখন মাথাটা করে তাজ্জিম মাজ্জিম; উডহাউসের নায়ক উস্টার দেখতে পেত সারি সারি গোলাপি হাতি তার বেডরুমের মধ্যিখান দিয়ে সবুজ শুঁড় নাচাতে নাচাতে পিল পিল করে জিভস্-এর প্যানট্রি বাগে এগোচ্ছে। আমারও ফাঁপানো, মোটা ন্যাজটা যখন ধীরে ধীরে চুপকে যেতে লাগল তখন খোঁয়ারির শিকার খৈয়ামের মতো দহিল হৃদয়বন তীব্র ক্ষোভানলে। মনে মনে

www.pathagar.com

আন্দেসা করলুম, এ তো বড় আশ্চর্যি! ভাঁড় আমি। আমার ভাঁড়ামি পানসে হতে পারে কিন্তু বেদনা দেবে কোন তাগতে? তা হলে যে মারা যাবে তার 'আব ও দানা',

দুইটি বস্তু প্রতি মানুষেরে
টানিতেছে জোর জোর।
দানা-পানি টানে একদিকে আর
আর দিকে টানে গোর ॥

দো চিজ আদ মরা
কশদ জোর জোর
এক-ই আব-দানা
দিগর খাক-ই গোর ॥

পূর্বেই নিবেদন করেছি, পাওনাদারদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা ছেড়েছি। এখানেও আমার লেখা যদি গুণিনদের বিরাগভাজন হয় তবে সম্পাদক আমার লেখা ছাপবেন কোন দুঃখে, 'আব ও দানার' কড়ি ঢালবেন কোন গরজে? এবং অতি অবশ্যই হেথাকার পাওনাদার গুষ্টিও আমার হালটা চটসে মালুম করে নিয়ে লাগাবে হুনো। তখন হয় ভুট্টো সাহেবের মতো চুপসে পলায়ন, নয় 'খাক-ই-গোরই' 'আব ও দানার' সঙ্গে টাগ-অব-উয়োরে জিতবেন। আমিও, 'বিনাপত্যে' সুড় সুড় করে সীতা দেবীর মতো 'ধরণী গো মা, স্থান দাও কোলে' ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের 'ইন্নালিল্লাহি'— যাক গে, বাকিটা থাক। কিন্তু একটা পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে আমি পুল-সিরাতের দিকে রওয়ানা হব— যেসব গুণিনকে আমি অজানতে পীড়া দিয়েছি তাঁরা আদল-ইনসাফসহ 'ফি নারি' পড়তে পারবেন।

কিন্তু সর্ব-সাকুল্যে যে দু পাঁচটি উটকো পাঠক এই আষাঢ়ের সজল ছায়ায় মেঘে ভরা বৃষ্টি ঝিল্লিমন্ত্রে মুখরিত সন্ধ্যায় আমার প্রতি অহেতুক সদয় হয়ে এ লেখাটি পড়ছেন তাঁরা হয়তো এতক্ষণ বেসবুর হয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'এত্তা ধানাই-পানাই কী ঝামেলা নিয়ে সেইটে খুলেই কও না, মাইরি। মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গেল।'

'তাই কইচি, গুরু, তাই কইচি। তোমরাই বিচার কর।'

গবিতা, অর্থাৎ মডার্ন কবিতা, গদ্যকবিতা যার নাম। গদ্যকবিতার বেশভূষাতে চোখে পড়ে, এতে মিল নাই, অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসিক কবিতাসুলভ ছন্দও থাকে না, ততোধিক ক্ষেত্রে ছত্রগুলোও একই দৈর্ঘ্যের নয়। বাইরের বেশভূষা অর্থাৎ বাহ্যরূপ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই মনের চোখে ধরা পড়ে, ক্লাসিক বা প্রাক গবিতাতে যেরকম প্রতি ছত্র এবং সম্পূর্ণ কবিতাটির সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা অর্থ পাওয়া যায় গবিতাতে তা নেই। এক-একটা ছত্রের অর্থ হয়তো পরিষ্কার কিন্তু গোটা কবিতার মূল অর্থ, 'লাইট মোতিফ' যে কী সেটা অধিকাংশ স্থলে বিলকুল ধরা যায় না, হয়তো আদৌ নেই। গবিতা পড়ে সনাতনপন্থিরা সোজাসুজি বলেন, 'এর তো মানে বুঝতে পারলুম না আদৌ। এর তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।' যদ্যপি আমি খাক-ই-গোরের প্রত্যন্ত প্রদেশে দণ্ডায়মান তথাপি আমি এ সম্প্রদায়ের সদস্য নই।

গবিতা কথাটা উভয় বাঙলায়ই চাউর হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গবিতা যাঁরা রচনা করেন, পড়ে আনন্দ পান, প্রশংসা করেন তাঁরা এ শব্দটা ব্যবহার করেন না। তাঁরা মনে করেন, শব্দটা

www.pathagar.com

তাচ্ছিল্যজাত ব্যঙ্গসূচক। কিন্তু ইতিহাসে এমন উদাহরণও আছে যেখানে পরদেশি দত্ত অবজ্ঞাসূচক নাম বা পদবি পরে ওই দেশের লোক গ্রহণ করেছে। কবিগুরু রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে মাত্র তিনটি নিতান্তই অবর্জনীয় বিদেশি শব্দ আছে— 'মুসলমান ও খ্রিস্টানি' এবং আরেকটি শব্দ পরে আসছে। প্রথমটি আরবি দ্বিতীয়টি গ্রিক। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল রগড় জাতীয় সঙ্গীতের 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে। চলন্তিকার মতো অতি সংক্ষিপ্ত অভিধানও বলছেন, 'হিন্দু' শব্দটি ফারসি। এ শব্দটি সংস্কৃতে নেই, যদিও আসলে 'সিন্ধু' থেকে এসেছে। ফারসিতে 'হিন্দ্' বলতে কালো বোঝায় এবং বিলক্ষণ তুচ্ছার্থে। অর্থাৎ ইরানিদের মতে ভারতীয়রা আর্যেতর, কারণ ব্যাটারা 'কেলে' 'কেলে'। কিন্তু এই হিন্দ্ এবং তৎনির্গত একাধিক শব্দ তৎসাময়িক আন্তর্জাতিক জগতে এমনই ছড়িয়ে পড়ল যে শেষটায় ভারতীয়রাই নিজেদের 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করল। ওদিকে অবশ্য ফারসিতে মূল তুচ্ছার্থটা লোপ পেল। কিন্তু অতদূরে যাই কেন? মরহুম মুহম্মদ আলি ভাই ঝিঁড়া ভাইয়ের 'ঝিঁড়া' শব্দের গুজরাতিতে অর্থ 'ক্ষুদে' (যেমন ক্রিকেটার বিনু মাঁকড়ের মাঁকড় শব্দের অর্থ পিঁপড়ে) এবং কিঞ্চিৎ তুচ্ছার্থে। ঝিঁড়া নাম দেবার উদ্দেশ্য সরল। এত ক্ষুদে ঝিঁড়া, যে মৃত্যুদূত তাকে দেখতেই পাবে না। আমাদের ক্ষুদিরাম, নফর চট্টো, এককড়ি, তিনকড়ি এসব একই ঝোপের চিড়িয়া। আকছারই কিন্তু এককড়ে, ক্ষুদে বা কেষ্টা কেউই নামটা তুচ্ছার্থে না অন্যার্থে সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ঝিঁড়াভাই যখন মুসলিম লীগের সর্বাধিকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন আরবি-ফারসির বিস্তর কদরদানরা বড্ডই সংকোচ অনুভব করলেন। ঝিঁড়াকে তখন 'জিন্নাহ'-এ রূপান্তরিত করেন। অর্থাৎ পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধু না হয়ে স্বপাড়াতেই মধুসূদন হয়ে গেলেন। পাছে লোক 'জিন্নাহ' শব্দটির গাঁইয়া মূলরূপটি ধরে ফেলে তাই জিন্নাহ শব্দের 'হ-টি' হে 'হুত্তি' দিয়ে লেখা হল দো-চশমি সাদামাটা 'হে' দিয়ে নয়। কারণ প্রথম 'হে'-টি শুধুমাত্র একদম খাঁটি ন'সিকে আরবি শব্দেই ব্যবহার করা হয়। ওই একই সময় লীগের আরেক মহাজন আবদুর রহমান সিদ্ধি রাতারাতি হয়ে গেলেন আবদুর রহমান স্বিদ্দিকি!... তা সে যাক গে— এইসি গতি সংসারমে। প্রভু খ্রিস্টর প্রধান শাকরেদ (সেন্ট) পিটার গ্রিক নামের অর্থ পাথর— প্রাণহীন (ইংরেজি 'পেট্রিফাইড' শব্দ তুলনীয়)। তাঁর প্রাণ হরণ করবে কোন শয়তানের যুবরাজ বিয়েলজবাব্ বা তার খাস প্যারা ডিয়াবলস (ডেভিল)। অথচ পিটারকে পাষাণহৃদয় বা সনগ্‌দিল রূপে ভাবলে নিশ্চয়ই সেটা সম্মানসূচক নয়। ইনজিল গ্রন্থে আছে, প্রভু ইসা মসিহ পিটারকে বলেছিলেন, 'তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী (গির্জা) গাঁথিব।' এরপর কোন খ্রিস্ট-ভক্ত পিটার নামকে হেনস্তা করবে? প্রস্তর, পিটারকে ফরাসিতে বলে পিয়ের এবং ওই দেশে সে নামটি যে কতখানি জনপ্রিয় সবাই জানেন। বোমা রোঁলা তাঁর সবচেয়ে রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী 'পিয়ের এ ল্যুস'-এর নায়কের নাম বেছে নিয়েছেন পিয়ের— যে নাম আমাদের ফিরোজ বা কেষ্টার ন্যায় প্রতি গ্রামে বর্ষায় ব্যাঙচির মতো কিলবিল করে।... আর শেক্সপিয়র, খাতিম উল ইসম রূপে বলেই গিয়েছেন,

'নামে কী করে?
গোলাপে যে নামে ডাকো,
গন্ধ বিতরে।'

(হেম বন্দ্যো'র অনুবাদ)

www.pathagar.com

আমার অপরাধ ফৌজদারি আইনে নয়, আলংকারিক বা নন্দন শাস্ত্রী-রূপে কবিগুরুর ভাষায় 'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারায় অপরাধের কোঠায়' পড়া উচিত— অবশ্য সমসাময়িক কতিপয় মডার্ন কবিই এস্থলে ফরিয়াদি, কবিগুরু নন, আমি নামকরণে গুবলেট করে ফেলেছি। 'পদ্মলোচন' নাম যার প্রাপ্য তাকে দিয়ে বসেছি 'ভেটকি লোচন', 'চন্দ্র-বদন'কে দিয়েছি 'বদনা-বদন', 'রতি-গঠনকে' বলেছি 'গাড়ু -গঠন'।

আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ আমি গবিতা রচকদের 'গবি' বলে উল্লেখ করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, আমি 'প্রবীণ' 'বহু জনমান্য মুরুব্বি' লেখক। কোনও চ্যাংড়া লেখক এ হেন বাক্য বললে তাঁরা গায়ে মাখতেন না। মুরুব্বিজনের সামান্যতম পদস্খলন স্বচ্ছ নীরে একটি মাত্র কৃষ্ণ কুন্তলের মতো চোখে পড়ে, পক্ষান্তরে চ্যাংড়া-চিংড়ির আবিল জলে বিরাট প্রস্তরখণ্ড হর-হামেশা ঘাপটি মেরে আত্মগোপন করে থাকে।

অতএব আমাকে এখন সাফসফা বলতে হবে আমি দোষী না নির্দোষ।

ধর্মাবতার পাঠকগণ!

ইতোপূর্বে একাধিক পাঠক পাকি ওজনে, ন'সিকে কর্কশ কণ্ঠে আমাকে 'গণ্ডমূর্খ' খেতাব দিয়ে আমাকে পাঠক-পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটা অপ্রমাণ করার জন্য হুলিয়া শমন জারি করেছেন, এ-পার গঙ্গায় আমার স্বধর্মীজন আমার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া ঝেড়েছেন (তেনাদের প্রাণঘাতী ফতোয়ার চেয়ে তেনাদের বিজাংগা বিটকেল বাংলা রচনা আমাকে ঘায়েল করেছে ঢের ঢের বেশি); ওনাদের অত্যুৎসাহী জনৈক ফকিহ প্রবর ওই মর্মে প্যামফলেট ছাপিয়ে মেলাতে ফেরি করে বিলক্ষণ টু'পাইস কামিয়েছেন; ওপার গঙ্গায় আমাকে হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী, সনাতন ধর্মের অপমানকারী প্রতিপন্নার্থে দৈনিকে কঠোর মন্তব্য করেছেন জনৈক উত্তেজিত লেখক। এর কঠোরতর উত্তর অবশ্য দিয়েছেন কলকাতাবাসী পাবনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের এক ব্যঙ্গনিপুণ পণ্ডিত; পক্ষান্তরে আমি মুসলমানের কলঙ্ক— এর প্রতিবাদ পুব বাংলার কেউ করেননি, না করে ভালোই করেছেন; আমি বঙ্গভাষা জননীকে প্যাঁজ-রসুন (আরবি-ফারসি যাবনিক শব্দ এস্তেমাল করে) খাইয়ে মা-জননীকে ধর্মচ্যুতা করবার পাপ-প্রচেষ্টায় অষ্টাহ্ন সচেষ্ট কেষ্ট-বিষ্ণুবৎ-ইত্যাকার অভিযোগ ঝাড়া সিকি শতাব্দী ধরে আমার বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। যেসব অভিযোগ ওপার বাঙলার কোনও সম্পাদকই ছাপাতে রাজি হননি সেগুলো ব্যক্তিগত পত্ররূপে সরাসরি ডাক-মারফত, মমালয়ে হানা দিয়ে টিটিক্কার দিয়েছে, আমি পাকিস্তান দরদী ইয়াহিয়া-ভুট্টোর স্পাই। পক্ষান্তরে এপার বাংলায় আমি হিন্দু মহাসভার স্পাই এ অভিযোগ কখনও শুনিনি। কিন্তু এদের তুলনায় আমার প্রতি অহেতুক মেহেরবান পাঠক বেশুমার, বিস্তরে বিস্তর। এঁদেরই নীরব দোওয়ার বরকতে এ অধম চাঁদখানা চেহারা করে মুখ বুজে সুখ-নিদ্রায় দিব্য কালযাপন করেছে, ভান উইন-কলকে হার মানিয়ে সিকি শতাব্দী ধরে। সর্বপ্রকারের সাফাই মাথায় থাকুন, কোনওপ্রকারে তর্কাতর্কিতেও নামেনি।

কিন্তু আমি উভয় বঙ্গের নিরীহতম পাঠকের ও মর্মদাহের নিমিত্ত হতে পারি— সম্মানিত মডার্ন কবিদের তো কথাই ওঠে না— আমার বিরুদ্ধে এহেন বেদরদ, বেইনসাফ অকরুণ ফরিয়াদ কস্মিনকালেও ক্ষীণতম কণ্ঠেও মর্মরিত হয়নি। নগণ্যতম পত্রিকার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অক্ষরেও ছাপা হয়নি।

www.pathagar.com

আমি মর্মবেদনায় অভিভূত, মোহ্যমান।

কারণ কাজী কবি কর্তৃক অনূদিত ওমর খৈয়াম রচিত রুবাইয়াতের ভূমিকা লেখবার জন্য কবির আত্মজন তথা প্রকাশক পরিবেশক আমাকে যখন অনুরোধ করে আমার অকিঞ্চন জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন তখন নতমস্তকে সে অবতরণিকার সর্বশেষে সে যে-রুবাঈটি সর্বান্তঃকরণে সসম্মানে তুলে ধরে সেটি সংসারের যাত্রাপথে তার প্রিয় সহচর :

কারুর প্রাণে দুখ দিও না,
করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি
বাড়িও না তার মনস্তাপ।

অতএব, ধর্মাবতারগণ, পুনরায় সম্বিতস্থ হয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কিয়দ্দিনের মহলাৎ কামনা করে মোকদ্দমা মুলতুবি রাখার হুকুম ভিক্ষা করি।

মুচলিকাবদ্ধ হচ্ছি, 'গুণরাজ খান' নিক্সনের মতো হালফিল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত, নানাবিধ কৌটিল্যসুলভ সুচতুর মুষ্টিযোগ (ডিপ্লোমেটিক কূ) প্রসাদাৎ মোকদ্দমাটা প্রলম্বিত করে করে জনগণের দিলচস্পি একদিন যখন ঔদাসীন্যে পরিণত হবে তখন তারই ফায়দা উঠিয়ে চুপসে বেমালুম কেটে পড়ার মতো এলেম আমার পিতৃপিতামহের উদরে 'কস্মিনশ্চিত' সত্যযুগস্য শুভলগ্নেও ছিল না, বর্তমান বা ভবিষ্যে আমার পেটে এটম বোমা মারলেও বেরুবে না।

বিচিত্রা পত্রিকা, ঢাকা

অবনীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতকের বাঙালি অন্তত এই সত্য জানিত যে সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লাঘার বস্তু। সেই যুগে ভারতীয়ের আত্মমর্যাদাকে ইংরেজ নানাপ্রকারে ক্ষুণ্ন করা সত্ত্বেও পৃথিবী তখন স্বীকার করিয়া নিয়াছে যে সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য— যে গ্রিক সাহিত্য লইয়া ইউরোপ এত গর্ব করে, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এবং লাতিন অপেক্ষা সে বহুলাংশে বিত্তবান।

বাঙ্গালার অনুপ্রেরণা সংস্কৃত হইতে আসে; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালির অল্পবিস্তর আশ্বাস ছিল। তদুপরি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদন যখন সর্বভাষা বর্জন করিয়া বঙ্গভাষায় সার্থক রস সৃষ্টি করিলেন, তখন বাঙালির আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

কিন্তু অন্যান্য কলাসৃষ্টিতে বাঙালি তথা ভারতীয়ের কণামাত্র উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। বাঙালি যে চিত্রে কিংবা ভাস্কর্যে নিজস্ব কোনওপ্রকারের রসনাভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে কিংবা বিশ্বের সম্মুখে নিজস্ব চারুকলা উপস্থিত করিয়া বিশ্বজনের প্রশস্তি অর্জন করিতে পারিবে এই বিশ্বাস যে বাঙালির ছিল না তাহাই নহে, সামান্য যাহা বাঙালির নিজস্ব

www.pathagar.com

কলাশিল্পরূপে তখনও বিদ্যমান ছিল বাঙালি তাহার সম্মুখে লজ্জায় অধোবদন হইত। কালীঘাটের পটকে সম্মান দেওয়া দূরে থাকুক বাঙালি তখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অচেতন।

তাই অবনীন্দ্রনাথের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হই। আজ অজন্তা আর্ট, মোগল চিত্রশিল্প বিশ্বরসিকের কাছে সুপরিচিত। আজ চিত্রকলার প্রামাণিক ইতিহাস পুস্তক পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই প্রকাশিত হউক না কেন তাহাতে অজন্তা-মোগল চিত্রের উল্লেখ না থাকিলে যে পুস্তক অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হয়, গ্রন্থকারের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ রসবোধ নিন্দিত হয়। কিন্তু যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যাগত কলাশিল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া রসসৃষ্টির নব নব অভিযানে বহির্গত হইলেন, সে যুগেও অজন্তা বঙ্গদেশে ন্যায্য সম্মান পায় নাই। আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রই স্মরণ করিতে পারিবেন, অজন্তা চিত্র প্রকাশ করার জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকাকে কতখানি হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। সেই বিড়ম্বিত অজন্তা সেই লাঞ্ছিত মোগল চিত্রের আদর্শ সম্মুখে লইয়া চিত্র অঙ্কন করিবার মতো দুঃসাহস অসাধারণ পুরুষেই সম্ভব।

জানি, অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কন না করিলেও অজন্তা-মোগল একদিন তাহাদের ন্যায্য-সম্মান পাইত, কিন্তু একথা আরও নিশ্চয়রূপে জানি, অবনীন্দ্রনাথ না থাকিলে অজন্তা মোগল নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের শতশত শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করিতে পারিত না। নবভগীরথ অবনীন্দ্রনাথ কলাক্ষেত্রে যে জাহ্নবী অবতরণ করাইলেন তাহার 'সোনার ধান' বঙ্গদেশের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিয়া এখন সমস্ত ভারতবর্ষের অন্নদান আনন্দদান করিতেছে।

আজ যে ভারতবর্ষের সুদূরতম প্রান্তে ভারতীয় শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিবার 'ভাষা' পাইয়াছে, তাহার পশ্চাতে অবনীন্দ্রনাথের কী অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অবিচল নিষ্ঠা ছিল সেকথা কয়জন শিল্পী কয়জন শিল্পরসিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কিংবা সশ্রদ্ধ স্মরণ করে?

অবনীন্দ্রনাথ প্রথমযৌবনে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করেন এবং পরবর্তী যুগে নিজস্ব শৈলীতে রসবিকাশ করিয়া স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন একথা সকলেই জানেন, কিন্তু নিজস্ব শৈলী নির্মাণের জন্য তিনি যে চীন-জাপান প্রত্যেক প্রাচ্য দেশের শিল্পে বৎসরের পর বৎসর গভীর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান তাহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন আজ কয়জন শিল্পী-ঐতিহাসিক?

জাপানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী টাইকান ভারতবর্ষে আসেন প্রথমযৌবনে— অবনীন্দ্রনাথও তখন যুবক। একদিকে টাইকান যেরকম অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে ভারতবর্ষে সর্ব চারুকলাবিকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আপন শৈলী সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সমর্থ হন ঠিক সেইরকম অবনীন্দ্রনাথও জাপানি শৈলী হইতে এমনসব কলাকৌশল আয়ত্ত করেন যাহার প্রসাদে তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি বহু রসের সংমিশ্রণে অপূর্ব সামঞ্জস্য ধারণ করে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব ছিল এইখানে। যেকোনো কলানিদর্শন, দেখামাত্রই তিনি তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিতেন এবং সেই নিদর্শন হইতে কোন বস্তুটি তাঁহার শৈলীতে সম্পূর্ণ এক হইয়া তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিবে সে রসবোধ ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাই যখন অবনীন্দ্রনাথের চিত্র বিশ্লেষণ করি তখন আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না যে এই সঙ্কীর্ণ মানবজীবনে একজন মানুষ কী করিয়া এতখানি কলাকৌশল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইল।

www.pathagar.com

তাই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের কৃতী শিষ্যগণ এত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করিয়া বঙ্গদেশের কলাজগৎকে এতখানি চিত্রবিচিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে গুরু বহুবিধ সাধনা করিয়া সত্যরস পাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রত্যেক শিষ্যের আপন বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে সেই পন্থাতেই কত নব নব অভিজ্ঞতা কত নব নব বিকাশ আছে তাহার সন্ধান দিতে পারেন। সার্থক চিত্রকার এই জগতে অনেক আছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মতো সার্থক গুরু এই সংসারের সর্বত্রই সর্বযুগেই বিরল। আজ ভারতবর্ষে এমন প্রদেশ নাই যেখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য বিরল; কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলালের কাছে যাঁহারা কলাশিল্প আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের গর্বের অন্ত নাই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গুরুর গুরু।

স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়া মৃত্তিকা স্বর্ণ হয়, কিন্তু সেই স্বর্ণ তো স্পর্শমণির মতো অন্য মৃত্তিকাকে স্বর্ণরূপ দিতে পারে না। অথচ যে প্রদীপ অন্য প্রদীপ হইতে একবার অগ্নিশিখা আহরণ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়াছে সে পৃথিবীর সর্বপ্রদীপকে প্রজ্বলিত করিতে পারে। সাধনাতে সিদ্ধিলাভ সংসারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার স্বর্ণরূপ প্রাপ্তির ন্যায়। তিনি কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন অন্যকে দিতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথের সাধনা দীপ্ত সাধনা। তিনি আপন জীবনে যে রসের সন্ধান পাইয়া নিজেকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশিখা দিয়া বহু শিষ্য আপন আপন অণুদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আজ তাই বঙ্গদেশে তথা তাবৎ ভারতবর্ষে চারুকলার যে অনির্বাণ দীপান্বিতা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার প্রথম প্রদীপ অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা-বিশ্লেষণ অদ্যকার কর্ম নয়। তাঁহার রসবোধ, তাঁহার চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি আধুনিক ভারতীয় চারুকলাকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে সে আলোচনা করিবার দিন এখনও আসে নাই। কারণ তাঁহার অনুপ্রেরণা আরও বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিবে— তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে পারে, এমন কোনও পুরুষকে এখনও দিকচক্রবালে দেখিতে পাইতেছি না।

কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অদ্ভুত আস্বচ্ছ রূপ আছে— এ রূপ পৃথিবীর অন্য কোনও চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অবর্ণনীয় রূপ তিনি সঙ্গীত হইতে গ্রহণ করিয়া চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন অবনীন্দ্রনাথ বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীত ধ্বনি দৃষ্টিবহির্ভূত; তিনি ধ্বনিকে রূপায়িত করিয়াছেন— তাই তাঁহার চিত্রের এই আস্বচ্ছ শৈলী।

অদ্যকার দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি :

'যখন আমি ভাবি বাঙলায় শ্রদ্ধালাভের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি কে তখন প্রথমই আমার যে নামটির কথা মনে আসে, তাহার হইতেছে অবনীন্দ্রনাথের। দেশকে তিনি আত্মগ্লানির পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অপমানের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশকে তিনি উহার ন্যায্য সম্মানজনক স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিল্পচেতনার পুনরুন্মেষণার মধ্য দিয়া ভারতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। এবং তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র ভারত নতুন করিয়া তাহার পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাঁহার সাফল্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গলা গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছে।'

www.pathagar.com

ভরত-নাট্যম

শ্রীমতী যোগম ও মঙ্গলমের ভরত রীতিতে নৃত্য দেখিয়া আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। বিশুদ্ধ নৃত্যরস ও আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহার পূর্ণ বিশ্লেষণ গুণীরা করিবেন। আমরা অন্যান্য নানা আনন্দের সঙ্গে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি রসের ভিতর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টিগত সাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া।

উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে আমরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি শৃঙ্গার রসের দ্বারা। আমাদের পদাবলিতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের প্রেম শ্রীরাধার বিরহের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। এ রস উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে কিন্তু বিষ্ণু-নারায়ণের রাম অবতার সেখানে তুলসীদাস প্রধানত ভক্তিরসের দ্বারা জনগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যুবক-যুবতীর প্রেমবেদনা শ্রীরাধার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশের পদকীর্তনে ও রাজপুতনার মীরাবাঈয়ের ভজনে।

কিন্তু পদাবলিতে কি শুধু শৃঙ্গার? শৃঙ্গার প্রধান রস বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে কী সূক্ষ্ম ভক্তিই না মিশ্রিত আছে!

তোমার চরণে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

তোমার 'পরানে' আমার 'পরানে' নয়, তোমার 'চরণে' আমার 'পরানে'। কিন্তু চরণে ও পরানে বাঁধা হয় ভক্তি ও স্নেহবন্ধন অথচ কবি বলিলেন— প্রেমের ফাঁসি। ভক্তির সঙ্গে প্রেম, না প্রেমের সঙ্গে ভক্তি, কী বলিব?

এই প্রেমের সূক্ষ্ম ভক্তি মিশ্রিত আছে বলিয়াই তাহার প্রকাশ করিতে পারেন বিদগ্ধ কীর্তনিয়ারা। রাধার বিরহ গাহিতে গাহিতে যখন তাঁহাদের চক্ষু নিবিড় বেদনায় প্লাবিত হয় তখন সে বেদনার কতটুকু গায়কের নিজের যৌবনের প্রিয়া-বিরহের স্মরণে আর কতটুকু বার্ধক্যের তীব্র অনুভূতি— শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অস্তিত্বের পরম সত্তা শ্রীভগবানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে না পাওয়ায়! জীবনের বহু দহনে দগ্ধ হইয়া যে বৈদগ্ধ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহার অভাব হইলে শৃঙ্গার হইতে ভক্তি লোপ পাইয়া যে রস থাকে তাহা অনেক সময় সম্পূর্ণ পার্থিব হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করে।

শ্রীমতীদ্বয়ের গৌর (কৃষ্ণ) চন্দ্রিকায় এই ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইল 'চরণ' ও 'পরানে'র ফাঁসিতে যে ব্যঞ্জনা তাহা কাব্যের গুঞ্জরন কুঞ্জবন ত্যাগ করিয়া শ্রীমতীদের অঙ্গে সঞ্জীবিত হইল— চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপ ধারণ করিল। কাব্যে ভক্তি ও শৃঙ্গারের মিলন অপেক্ষাকৃত কঠিন, নৃত্যাভিনয়ে অপেক্ষাকৃত সরল। চোখে-মুখে বিরহের বেদনা অথচ করদ্বয় ভক্তিনমস্কারে যুক্ত। দুই রসের অবর্ণনীয় সম্মেলন। অভিনয়ে এই সম্মেলন অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়াই মনে হয় শ্রীমতীরা অল্প বয়সেই তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নটরাজের বাঙলা কাব্যে প্রবেশ অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথের শঙ্খ ঘোষণায়। নটরাজ 'দুঃসাহসী যৌবনকে উদ্ধার' করেন; কবি যখন নৃত্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার 'পদে পদে' যেন

www.pathagar.com

নটরাজের 'চঞ্চল চরণ ভঙ্গি' পড়ে এই প্রার্থনা করেন; কবি দেখেন নটরাজের নৃত্য 'বিদ্রোহী পরমাণুকে সুন্দর' করিয়া তোলে। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে এই রস রূপ গ্রহণ করিয়া নবীন রসের সৃষ্টি করিল আর নবীন ব্যঞ্জনা পাইলাম নটরাজকে রসস্বরূপে আরাধনা করিবার। 'হে চিদম্বরমের প্রভু, ত্রিলোক ও কামের ধ্বংসকর্তা নটরাজ, তুমি কি আমার দ্বারপ্রান্তে একবার ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইবে না, আমাকে আহ্বান করিবে না।'

নৃত্যের সঙ্গে দ্রাবিড় গীতের সঙ্গত শুনিয়া আমাদের মনে পড়িল 'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে।' সে তো চাহিবে না, তাহার রথের চাকা আমার দরজায় দাঁড়াইবে না, তবু চিদম্বরমের পরম প্রভুকে ক্ষণেক দাঁড়াইবার জন্য মানুষের কী আকুল ক্রন্দন নিবেদন। শ্রীমতীদ্বয়ের নৃত্যে কৃষ্ণ নটরাজের প্রতি ভক্তি শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তিই যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা হয়তো ইহাদের নৃত্যে তালবোল সম্বলিত জটিল আঙ্গিকে শুদ্ধ রস পাইয়াছেন; আমার বাল্যকাল হইতে কীর্তন রসে আপ্লুস বলিয়া এই রসই প্রধানত লক্ষ করিয়াছি। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করিলাম যে, উত্তর-দক্ষিণের দেবদেবী যে একই তাহা নহে— সে তো সকলেই জানেন— অধিকন্তু আমাদের রসপূজার সঙ্গে তাঁহাদের রসপূজার স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়প্রকারের যোগ আছে। আমাদের পূজাকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য দক্ষিণের ভরত নৃত্য উত্তরে প্রচারিত হউক।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১২.৮.১৯৪৯

নর্তকী

মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণতম প্রান্তে সমুদ্রের গা ঘেঁয়ে বাড়িটি। চওড়া বারান্দা— আর সে এতই চওড়া যে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ বাড়ির ঘরগুলো বারান্দা বানানোর উপলক্ষ মাত্র। বারান্দাটাই মুখ্য, ঘরগুলো না থাকলে চলে না বলেই নিতান্ত এক পাশে কোণ ঠেসে পড়ে আছে।

বারান্দাতেই জীবন-যাত্রা। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন ছাড়া অন্য কোনও সময়েই ঘরের ভিতরে যাবার প্রয়োজন হয় না— মাদ্রাজ উপকূলের তির্যকতম বর্ষায়ও না। খাটটা একটুখানি ঠেলে নিয়ে নিম নারকোল কালোজাম গোলমোহরের দাপাদাপির এক পাশে দিব্য আরামে ঘুমানো যায়।

সমুদ্রের গর্জন অষ্টপ্রহর লেগে আছে বলে সবাই কথাবার্তা কয় গলা বেশ চড়িয়ে। কোনওদিন যদি হঠাৎ একটুখানি গর্জন কমে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করি সবাই কীরকম খামখা চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলছি। আমার বন্ধু গৃহস্বামী কনকপ্রসাদ রাও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাউকে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনলেই আমাকে কানে কানে বলতেন, 'লোকটার জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই সমুদ্রপারে। তার সপ্তকের মধ্যমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে— কিছুতেই নামতে পারছে না।'

কনকপ্রসাদের সেই ফিসফিসও রেস্তোরাঁর আর সবাই স্পষ্ট শুনতে পেত। তিনি ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রপারে।

www.pathagar.com

কনকপ্রসাদ ডাক্তার, আর আমি রোগী। মাদ্রাজ উপকূলে গিয়েছি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগাবার আশায়। কনকপ্রসাদের হুকুম মাফিক পাকা একটি ঘণ্টা সমুদ্রপারে শুধু পায়ে পাইচারি করতে হয়, চারটে কাঁচা আণ্ডা গিলতে হয়, গোনাগুনতি এক ডজন কমলানেবু খেতে হয়, আরও কত কী এটা-ওটা-সেটা তার হিসাব জানেন কনকপ্রসাদের বউ। গিন্নি আমাকে এসব গেলান ভটাচায বামুনের বউ যেরকম বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শাস্ত্রের বিধান গেলায় ভট্টচাষের চেয়েও বেশি— কারণ ঠাকুর বরঞ্চ জানেন 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়', কিন্তু ব্রাহ্মণীর কাছে নিপাতন বলে কোনও জিনিস নেই। ডাক্তার জানে, দুটো নেবু একদিন কম খেলে আমি কিছু শয্যাশায়ী হব না; ভটচাযও জানেন, সরস্বতী পূজার দিনে বই ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু ডাক্তারের বউ ভটাচায-গিন্নি ওসব বোঝেন না। আমাকে বারোটা কমলানেবু খেতে হত তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার মতো, রিচুয়াল হিসেবে।

ঘড়ি ধরে সূর্যাস্তের ঠিক কুড়ি মিনিট আগে হুকুম হত সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি তদারক করতেন— আমি পিচ-ঢালা কালো রাস্তার ফালি ওপার হয়ে, সবুজ মাঠের ফালি পেরিয়ে গিয়ে, সোনালি বালুতে ধাক্কা খেতে-খেতে সমুদ্রপারে পৌঁছে মাকুটার মতো উত্তর-দক্ষিণ করছি কি না।

করতুম। 'পড়েছি যবনের হাতে'-র যবনকে যখন আর কারও হাতে পড়ে খানা খেতে হয়, তখন আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কনকপ্রসাদ-গৃহিণী কী ধরনের মানুষ ছিলেন।

পাইচারি করতুম আর হিংসেয় আমার বুক ফেটে টুকরো টুকরো হত একটি তামিল ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপারে একটা জেলে নৌকার গা ঘেঁষে আরাম্‌সে বসে থাকতে দেখে। মাদ্রাজ শহরের শেষ-প্রান্ত বলে এখানে কেউ বড় একটা বেড়াতে আসে না— তাই মাসের আঠাশ দিন এই তামিল ব্রাহ্মণ আর আমাতে মিলে এ রাজত্বে পুরুষ-প্রকৃতির মতো সৃষ্টি চালাতুম। ব্রাহ্মণটিই পুরুষ, কারণ তিনি নির্বিকার, নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর আমি প্রকৃতি— শাটল কর্কের মতো কখনও হেথায়, কখনও হোথায় গুত্তা খেয়েই যাচ্ছি, একটানা দশ মিনিটের বেশি জিরোবার হুকুম নেই। সেশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষের উপরেও আছেন আরেকজন। তিনি ডাক্তারের বউ।

ব্রাহ্মণের সামনেই আমি মাকু চালাতুম। কখনও কখনও ঘাড় বাঁকিয়ে দেখেছি, তিনি আমার দিকে একবারের তরেও তাকান কি না। উহুঁ। তাঁর দৃষ্টি সমুদ্র পেরিয়ে সোজা দিগ্বলয়ের দিকে। হয়তো তিনি কোনও মারাত্মক রকমের সাধনা নিয়ে পড়ে আছেন— শুনেছি কোনও কোনও বিশেষ সাধনা যেমন গুহাগহ্বরে করতে হয়, কোনওটা নাকি তেমনি করতে হয় সিন্ধু-পুলিনে, নির্জনে, গুরুগম্ভীর গর্জনের মাঝখানে। সাধকরা বলেছেন, লোকালয়ে বহু শব্দ, অরণ্যেও পশু-পক্ষীর অহেতুক কলরব; সমুদ্রের গর্জন আর সব ধ্বনি ডুবিয়ে দেয় বলে ওই গম্ভীর মন্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পয়লা ধাপ অতি অনায়াসে পার হওয়া যায়।

তা হয়তো যায়, ব্রাহ্মণ হয়তো হয়েছেন। আমার তাতে কোনও হিংসে নেই— হিংসে হয় শুধু দেখে, ভদ্রলোক কীরকম আয়েশে গা ডুবিয়ে দিয়ে সিন্ধুর গর্জন গান শুনে, আকাশে রঙের নাচ দেখে, ইস-পার উস-পার জুড়ে যে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি লাগে তারই দিকে আপন-ভোলা হয়ে তাকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

লোকটি সুপুরুষ। শ্লেটার সায়েব দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ নাকি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাকে যেন প্রলোভনে ফেলা না হয়, আর তারই উত্তরে নাকি ভগবান তামিল রমণী সৃষ্টি করেছেন। দোহাই ধর্মের, এ মত আমার নয়, শ্লেটার সায়েবের, কারণ আমি তো বুঝে উঠতে পারিনে তামিল রমণী যদি সৌন্দর্যহীনাই হবে তবে এরকম সুপুরুষ ব্রাহ্মণ জন্ম নিল কার গর্ভে?

কী অপূর্ব কাঁচা সোনার রঙ। সমুদ্রের নীল জলে ধোওয়া সোনালি বালু যেরকম ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভদ্রলোকের রঙ। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের পাশে তাঁর মুখ, হাত-পা যেরকম আপন তেজে অপ্রকাশ হয়ে থাকত, তা তাঁকে সমুদ্র পারে না বসিয়ে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। খুব কাছে গিয়ে দেখিনি তবু দূর থেকেই লক্ষ করেছি তাঁর শান্ত চোখ, ছোট একটুখানি মুখ, চওড়া কপাল আর গোল করে কামানো মাথার মাঝখানে একঝুঁটি মিশকালো চকচকে চুল। তামিল ব্রাহ্মণদের এরকম ঝুঁটিবাঁধা চুল দেখলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষ ইচ্ছে করে নিজেকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করে কেন? কিন্তু এঁর চুল দেখে এই প্রথম বুঝতে পারলুম, তামিল নটবর কোনও শিব গড়তে গিয়ে কোন বাঁদর মাথায় তুলে নিয়েছে। এই বিদ্‌ঘুটে ঢঙের কামানো মাথায় ঝুঁটিবাঁধা চুলও যে কী আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে, তা আমি দেখলুম এই প্রথম আর এই শেষ।

পরনে লুঙ্গির মতো করে ধুতি, মাদ্রাজি ধরনের কুর্তা, পায়ে চপ্পল্ কাঁধে তোয়ালে— যাকে বলে ন'সিকে মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ; নস্যি নিতে দেখিনি, বাদ পড়েছে মাত্র এইটুকু।

এ সবেতে আমার হিংসে হয় না, আমার হিংসে হত তার বসার ধরনটুকু দেখে। মুখে দুশ্চিন্তার লেশ নেই, বসেই আছেন বসেই আছেন, সূর্য ডুবল, চাঁদ উঠল, তাঁর কাছে যেন সবই সমান। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, আকাশে মেঘ জমলেও বৃষ্টির ভয়ে তাঁকে আপন আসন ত্যাগ করে ব্যস্ত হতে কখনও দেখিনি।

পাকা তিনটি মাস ধরে আমি পুলিনবিহারী, আর তিনি পুলিনাসীন হয়ে রইলেন। আমি তাঁকে লক্ষ করলুম নিত্যি নিত্যি— এরকম সৌমকান্তি লোককে অবহেলা করা কঠিন। তিনি আমাকে লক্ষ করলেন কি না, বলতে পারব না। কারণ আর যে দু চারজন মাঝে মাঝে এদিকে বেড়াতে আসেন, তাঁদের কাউকেও ওঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। তাই অনুমান করলুম, কাউকে লক্ষ করা এঁর অভ্যাস নয়, না হলে নিশ্চয়ই কারও না কারও সঙ্গে এঁর আলাপপরিচয়, অন্তত নমস্কারম্‌টা হয়ে যেত।

আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল কি না ঠিক বলতে পারব না। কারণ আমি জানি, এরকম শান্ত ধীর সংযত সংহত লোকের সামনে চপল মানুষ লজ্জা পায় আপন চপলতা নিয়ে, আর সেটা ঢাকতে গিয়ে চপলতা বেড়ে যায় আরও বেশি। অথচ আলাপ করবার লোভও যে হয়নি, সেকথাও বলতে পারিনে।

তবু হয়ে গেল একদিন যোগাযোগ। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় শুনেছি, কিন্তু বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত হয় এ তত্ত্ব আমার জানা ছিল না। আমি ছিলুম একদৃষ্টে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে। কবি নই, তবু মনে মনে ভাবছিলুম, এই যে দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে ঢেউগুলোর বিগলিত আত্মনিবেদন এর ঠিক যুতসই তুলনা কী বললে ঠিক ঠিক ওৎরাবে। মনে মনে ভাবছিলুম দুত্তোর ছাই, কবিরা বাড্ডিল বাড্ডিল

www.pathagar.com

তুলনা ছাড়ে কথায় কথায় আর আমার মাথা এমনি নিরেট যে, একটা পর্যন্ত তুলনা খুঁজে খুঁজে বের করতে পারছিনে! ভাগ্যিস, এ যুগের পরীক্ষায় কবিতা রচনা করতে হয় না, না হলে বাবাকে পরীক্ষার ফিজ দিতে দিতে ফতুর হতে হত।

হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি। ছুট ছুট ছুট। এ বৃষ্টিতে ভিজলে আমার তিন মাসের মেহন্নতে জমানো স্বাস্থ্য তিন টুকরো হয়ে যাবে। সেই নৌকাটার পাশ দিয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় দেখি তামিল ভদ্রলোকটি আমার দিকে ইঙ্গিত করছেন— সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করা মানুষের কর্ম নয়। আমি কাছে যেতেই বললেন, 'নৌকার উপরে উঠে বসুন, আমি পাল দিয়ে আপনার গা ঢেকে দিচ্ছি। একটু পরেই আমার চাকর ছাতা নিয়ে আসবে।'

এছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। যত তেজেই ছুট মারি না কেন, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে কাঁই হয়ে যাব।

গা বাঁচিয়ে বসার পর উত্তেজনা কাটতেই খেয়াল গেল, তামিল ভদ্রলোক কথা বলেছেন পরিষ্কার রাঢ়ী বাঙলায়! কী করে হল? এক মুহূর্তেই ভুলে গেলুম, এরকম শান্ত সংহত লোককে হড়হড় বলে প্রশ্ন জিগ্যেস করা অনুচিত— চিৎকার করে পালের তলা থেকে শুধালুম, 'এরকম বাঙলা বিদেশি বলতে পারে না। আপনার বাড়ি কোথায়?'

ভদ্রলোক শুনতে পেলেন কি না, জানিনে। আমি কোনও উত্তর না পেয়ে বৃষ্টি-বাদল ভুলে গিয়ে ভাষা সমস্যার সমাধানে লেগে গেলুম। অসম্ভব! এরকম অতি পরিষ্কার নদের বাঙলা মাদ্রাজি শিখবে কী করে? কিন্তু বাঙালি এরকম পাকা সেরী ওজনের কট্টর মাদ্রাজি বেশভূষাই বা পরতে যাবে কেন? তা-ও না হয় বুঝলুম, কারণ বাঙালি বিদেশি ভূষা গ্রহণে হামেশাই তৈরি, কিন্তু মাথা ন্যাড়া করে ঝুঁটি বাঁধতে তো বাঙালির রাজি হওয়ার কথা নয়। ফরাসি পণ্ডিত ফুশে সায়েব গণপতির মাথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, গণপতি অর্থাৎ গণ অর্থাৎ যূথ অর্থাৎ হাতির রাজা। এককালে তিনি পুজো পেতেন সাদাসিধে হাতিরূপেই— আজও যেমন হনুমানজি, বৃষরাজ পান। তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর নিচের দিকটা বদলে গিয়েছে— কিন্তু মাথাটি তিনি বদলাতে রাজি হননি, কারণ শিরাভরণ মানুষ সহজে বদলাতে চায় না। ফুশের কথাটি ঠিক— পূর্ব বাঙলার মুসলমান ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরে, পাঞ্জাবি শিখ পাঠান স্যুট পরে পাগড়ির সঙ্গে। তার ওপর আরেকটা তত্ত্ব আমার বিলক্ষণ জানা আছে— বাঙালি আপন শরীরের অবহেলা করুক আর নাই করুক, চুলটিকে সে কেতা-দুরস্ত রাখবেই। তাই তো গেঁয়ো কবিতায় আছে,

বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি
খেতে মাখতে তেল জোট না।
কেরাসিনে বাগাও তেড়ি।

কেরাসিন দিয়ে কেশ-প্রসাধন করবে, তবু চুলের মায়া ছাড়ে না যে বাঙালি, সে মাথা ন্যাড়া করে পরতে যাবে মাদ্রাজি ঝুঁটি!

কিন্তু নদের বাঙলা!

শুনলুম, 'ছাতা বরসাতি নিয়ে চাকর এসেছে, আপনি বাড়ি যান।'

আমি বেরিয়ে এসে শুধালুম, 'আর আপনি?'

www.pathagar.com

'ঠিক আছে' বলে কী ঠিক আছে, সেটা ভালো করে না বুঝিয়েই তিনি রওয়ানা দিলেন উত্তরমুখো হয়ে সমুদ্রের পারে পারে আর আমি পশ্চিম দিকে, বালু, ঘাস আর পিচের রাস্তা পেরিয়ে বাড়িমুখো।

অভদ্রতা হল অস্বীকার করিনে, কিন্তু তর্কাতর্কি করলে নেমকহারামি হত। যে হাত ছাতা এগিয়ে দেয় সেটাকে তো আর কামড়ানো যায় না।

অপরিচিত মনিব সম্বন্ধে চাকরকে প্রশ্ন করা আরও বেশি অভদ্রতা। তাই কিছু জিগ্যেস করলুম না। বেশিক্ষণ সে সঙ্গে ছিলও না— সবুজ ফালির মাঝখানেই অখণ্ড সৌভাগ্যবতীর পাঠানো ছাতা-বরষাতির সঙ্গে দেখা। বাড়ি পৌঁছে গেল মাথার উপর দিয়ে আরেক ঝড়। কনকপ্রসাদ ছাতা ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শোনে কে? অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বারে বারে বলেন দোষ তাঁরই, ছাতা পাঠিয়ে আমাকে এত্তেলা দেওয়া উচিত ছিল তাঁরই, কিন্তু ধমকটা দেন আবার আমাকেই। মেয়েদের বোধহয় এইরকমই স্বভাব। বাচ্চা সংসারে আনেন ওনারাই আবার বাচ্চাকে গালাগাল দেন তেনারাই।

তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

দক্ষিণমুখো হয়ে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। বাঁ দিক থেকে আসছে সমুদ্রের কান্নার শব্দ— শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডান দিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি— যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনের আকাশে মোমবাতির ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

তামিল না বাঙালি, বাঙালি না তামিল?

এবং তার চেয়েও বড় সমস্যা, কাল দেখা হলে পরে তাঁর সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা কইব, না উপেক্ষা করে যাব? কোনটা বেশি শোভন হবে?

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বুঝলুম, অল্প জ্বর। খবরটা কিন্তু চেপে গেলুম। আমাকে আজ বিকেলে যে করেই হোক সমুদ্রপারে যেতে হবে। যদি না যাই তবে পুলিনাসীন হয়তো ভাববেন আমি ইচ্ছে করেই তাঁকে কাট্ করেছি আর তারই ফলে তিনি চিরতরে কেটে পড়বেন।

অন্যদিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়িই বেরুলুম।

সমস্যার ঝটিতি সমাধান হয়ে গেলে নিজের কাছে তখন নিজেকে কেমন যেন বোকা বনতে হয়। মানুষ তখন ভেবেই পাই না, এই সামান্য, সরল জিনিস নিয়ে সে আপন মনে এত তোলপাড় করেছিল কেন? আমার হল তাই। পরদিন সমুদ্র পারে পৌঁছনো মাত্রই ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন প্রসন্ন বদন দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে। কিছু না বলে আমার পাইচারিতে যোগ দিলেন এত সহজে যেন তিনি নিত্যি নিত্যি এমনি ধারা আমার সঙ্গে জোড়া-সান্ত্রির টহল দেন। চলার ধরনটিও সুন্দর। হাত দু খানি পিছনে নিয়ে মাথাটি নিচু করে পায়ের দুটি পাতা একদম সোজা ফেলে ফেলে।

সিন্ধুপার আর ড্রইং-রুম এক জিনিস নয়। ড্রইং-রুমে দু জন লোক যদি চুপ করে বসে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই বেখাপ্পা বলে মনে হয়। সমুদ্রপারে হয় না।

বয়সে আমার চেয়ে যখন উনি বড় তখন পরিচয় ঘনানো না ঘনানো তো তাঁরই হাতে।

আমার জিরোবার সময় এসে বললেন, 'চলুন, নৌকোটার পাশে গিয়ে বসি।' আমি তাঁর বাঁ দিকে বসতে যাচ্ছিলুম— বললেন, 'না, ডান দিকে বসুন। নৌকোটা তা হলে আপনার দৃষ্টি ঢেকে দেবে না।'

www.pathagar.com

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন, 'আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন?'

আমি বললুম, 'না, তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কলাম লিখি।'

'কবিতা লেখেন না? এখানে তো তার বিস্তর মাল-মশলা।'

আমি বললুম, 'সমুদ্র আকাশ আর বালু-পাড় এ তিনটে জিনিসই আমার কাছে এতই সহজ আর সরল বলে মনে হয় যে মনে মনে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজতে গিয়ে বারে বারে হার মেনেছি!'

বললেন, 'কথাটা ঠিক। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,

"অপরিচিতের এই চির পরিচয়,
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সেকথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি"।'

আমি শুধালুম, 'আপনি সাহিত্য-চর্চা করেন?'

বললেন, 'দেশে থাকতে করতুম। কোন বাঙালি ছেলে করে না? আর আমাদের আমলে বাঙালির ছিল ওই একমাত্র ব্যসন, আর কিঞ্চিৎ ধর্মচর্চা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ!'

সেদিন আর বেশি কথাবার্তা হল না। বাড়ি ফেরার জন্য যখন উঠলুম তখন বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি বয়সে বড় তাই আপনাকে আমি আমার আপন পর্যবেক্ষণ থেকে একটি কথা বলি। আকাশ সমুদ্র বালু-পাড় এগুলো আপনার কাছে এখন এতই সহজ ঠেকছে যে আপনি সেগুলোকে প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছেন না। আরও কিছুদিন যাক, তখন আকাশের থমথমানি আর সমুদ্রগর্জনের ভাষা একদিন আপনার কাছে অনেক নতুন কথা বলতে আরম্ভ করবে।'

আমার লোভ হচ্ছিল জিগ্যেস করতে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেন কি না, কিন্তু চেপে গেলুম।

পরদিন বেড়াতে গেলুম অনেকগুলো প্রশ্ন এমনি কায়দা করে বানিয়ে নিয়ে যে তিনি কিছুটার উত্তর দিতে বাধ্য হবেনই হবেন। কিন্তু আমারই হিসাবে ভুল। ভদ্রলোক আমার পাইচারিতে যোগ না দিয়ে আপন আসনে চুপ করে বসে রইলেন নিত্যিকার মতো। আমার মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

কিন্তু ঠিক বাড়ি ফেরার সময় তিনি উঠে এসে আমাকে বললেন, 'দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি হয়তো নিঃসঙ্গ ভ্রমণ পছন্দ করেন তাই ইচ্ছে করেই আজ আমি দূরে ছিলুম। আমার কিন্তু দুই-ই সমান। আপনার ইচ্ছে হলেই আমার সঙ্গে এসে কথাবার্তা বলবেন আর আমি যখন চলা-ফেরাটা পছন্দ করিনে তখন আপনার ইচ্ছে হলেই একা একা পাইচারি করতে পারবেন।'

ব্যবস্থাটা আমারও মনঃপূত হল।

তার পর দশ দিন ধরে রোজ বিকেলে বৃষ্টি। পাইচারি তখন মৌতাত হয়ে দাঁড়িয়েছে—বাধা পড়ায় হন্যে হয়ে উঠলুম। অনভ্যাসের ফোঁটা অভ্যেস হয়ে যাওয়ার পর ফোঁটা না কাটলে চড়চড় করে আরও বেশি।

www.pathagar.com

এগারো দিনের দিন উঠল কড়া রদ্দুর। বাড়ির বারান্দা থেকেই দেখতে পেলুম, দুপুর হতে না হতেই সমুদ্রপারের বালু শুকিয়ে গিয়েছে। মনটা আশ্বস্ত হল— ভেজা বালুতে বসা যায় না বলে পাকা একঘণ্টা একনাগাড়ে পাইচারি করা সহজ কর্ম নয়।

দশ দিন ধরে মনে মনে প্রশ্নগুলো আরও গুছিয়ে নিয়েছি।

বিকেলবেলা তারই একটা অতি সন্তর্পণে জিগ্যেস করতেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি আমি কে, কী বৃত্তান্ত জানবার জন্য আপনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীতে একরকম মানুষ আছে যারা সামান্যতম প্রহেলিকার সামনেও "যাক্" গে ছাই, আমার কী?" বলে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন পথে চলে যেতে পারে না। আপনি সেই ধরনের। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিও স্থির করেছি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব এবং এমন আরও কিছু বলব যা আপনার প্রশ্নেরও বাইরে।

'আমিই বলে যাই, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপন অজানাতেই আপনি জেনে যাবেন।

'পুদুকোট্টাই থেকেই আরম্ভ হোক। তার আগের পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বলবার মতো বিশেষ কিছু নেই। জন্মেছি কৃষ্ণনগর, পড়াশোনা করেছি কলকাতায়, আর বিস্তর ছুটি কাটিয়েছি হয় শিলঙে না হয় ব্রহ্মপুত্র-পদ্মায় ডিসপাচ জাহাজে। বাবা কাঠের ব্যবসা করতেন এবং আমা দ্বারা ব্যবসা হবে না জানতেন বলেই মরার পূর্বেই আমার জন্য ভালো শেয়ার কিনে রেখে যান।

'তাই শ্রাদ্ধাদি চুকিয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে ভ্রমণে বেরোবার পথে কোনও বাধাই ছিল না। প্রথমে দেখলুম উত্তর ভারত তন্ন তন্ন করে— আমার ইতিহাসে শখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা ইতিহাসের কঙ্কাল তক্ষশিলা, কাশী, দিল্লি, আগ্রা গিয়ে রক্তমাংস পেয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তখন ইচ্ছে হল দক্ষিণ দেখবার। ওয়ালটোয়ার, রাজমহেন্দ্রী, বেজওয়াড়া সেরে এলুম মাদ্রাজ— তার পর কাঞ্চিবরম্, চিদম্বরম, মাদুরা, তাঞ্জোর করে শেষটায় পৌঁছলুম গিয়ে পুদুকোট্টাই।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'পুদুকোট্টাই দেশি রাজ্য কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আমার মনে পড়ছে না।'

বললেন, 'না পড়ারই কথা। তবু জায়গাটার নাম মাঝে মাঝে কাগজে বেরোয়। আমাদের যেমন কুচবিহার, খাস দক্ষিণ অঞ্চলের তেমনি পুদুকোট্টাই। কিন্তু বাঙলা দেশের মাহাত্ম্য জানতে হলে যেমন কুচবিহার যাবার দরকার নেই, এদেশে এসে তেমনি পুদুকোট্টাই না গেলেও চলে।'

'আমার ওখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ আমার এক তেলুগু সতীর্থের পিতা সেখানে মহারাজার প্রাইভেট-সেক্রেটারি ছিলেন। য়লমঞ্চলি মাদ্রাজে এসে আমাকে একরকম জোর করে পুদুকোট্টাই ধরে নিয়ে গেল।'

ভদ্রলোক থামলেন।

সেদিন ষোড়শী। চাঁদ উঠবে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর। বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম চাঁদের আলোতে বাড়ি ফিরব। পুবের আকাশে তখন অল্প অল্প চিলিক্ লেগেছে— আমার চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার আর তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনধ্বনি। তার ভিতর দিয়েও আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম ভদ্রলোক তাঁর গল্পের, তাঁর জীবনের এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে এগোবার সময় ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

www.pathagar.com

চাঁদ উঠল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'আপনি পিয়ের লোতির "ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ" পড়েছেন? আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদের কথা জিগ্যেস করছি।'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! আজ সকালের ডাকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি পেয়েছি। আর আজ সকালেই আমি লোতির পণ্ডিচেরি-বর্ণন পড়ছিলুম।'

অতি শান্ত স্বরে বললেন, 'সবই যোগাযোগ। মানুষ তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে কী করে যতক্ষণ না যোগাযোগের ওপর তার কর্তৃত্ব লাভ হয়? কিন্তু আজ আর না। বাড়ি ফিরে আমাকে একগাদা প্রুফ দেখতে হবে। কাল সকালেই ফেরত পাঠাবার কথা। আপনি কাল আসবার সময় লোতির বইখানা সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

দুই

আমি জিগ্যেস করলুম, 'লোতির বইয়ের কোন অংশের কথা আপনি ভাবছিলেন?'

বললেন, 'পণ্ডিচেরি বাসের সময় তিনি যে ভরত-নাট্যম্ দেখেছিলেন, তার বর্ণনাটা পড়ুন।'

আমি বললুম, 'আপনিই পড়ুন। আপনার উচ্চারণ আমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার— আর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার গলা চড়াতে গেলে কষ্ট হয়, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ি।'

হেসে বললেন, 'গলা নামিয়ে নিলেই হয়।'

তখন লক্ষ করলুম, এ ভদ্রলোক যে কটি বার কথা বলেছেন, সবসময়ই গলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে। কনকপ্রসাদ তা হলে জানেন না যে, সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা কইতে হলে যেমন চড়িয়ে বলা যায়, তেমনি নামিয়ে বলতেও বাধা নেই, অত্যন্ত দ্রুত বাজিয়ে যেরকম তবলচিকে কাবু করা যায় তেমনি অত্যন্ত বিলম্বিত লয় নিলেও তাকে হার মানানো যায় আরও সহজে।

"দীর্ঘায়ত-নেত্র-বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ— ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরিব্যঞ্জক মুখ, তিমির-রাজ্যের সুখ— খুব লঘু ভাবে, তাড়াতাড়ি একবার এগিয়ে আসিতেছে— আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণমণির মতো কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে— এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তারা আমার চোখের উপর সমানভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে।...

"জনতার মধ্যে এই রমণীকে ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতেছি না— উহার ওই সিঁথিবিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। রমণী, হীরক-মাণিক্য-খচিত বলয়-কেয়ূরাদি ভূষণে আস্কন্ধ-বিভূষিত বাহুযুগকে ভুজঙ্গ গতির অনুকরণে কতরকম করিয়া বাঁকাইতেছে— কিন্তু না, সর্বাগ্রে উহার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্যন্ত এমনভাবে ভেদ করিতেছে যে, আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; ওই চোখে নানাপ্রকারের ভাব খেলিতেছে— কখনও পরিহাসের ভাব, কখনও স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব... উহার মণিরত্নখচিত শিরোভূষণের ও কর্ণ-নাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ওই উজ্জ্বল

www.pathagar.com

সোনার সিঁথিটি এমন পরিপাটি রূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে যে, তাহাতে ওই সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কী জানি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে— আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

"এই নর্তকী নৃত্যশালার এক প্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল— সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত। কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষ-কষায়িত-নেত্র হইতে আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ-বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কী একটা অপরাধ করিয়াছি— তাহারই জন্য যেন সে স্বর্গ-মর্ত্যকে সাক্ষী রাখিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে...

"তার পর, নর্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি, জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভর্ৎসনা যেমন কৃত্রিম, এইরূপ উপহাসও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক নকল— চমৎকার নকল।

"নর্তকী, কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে, তাহার হাসি— মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পমান বক্ষ দিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে হাসি দুর্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

"আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এইভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্তকী দ্রুত পদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল। আমার উপর তাহার প্রবল ভালোবাসা পড়িয়াছে, সে সর্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া কর-জোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছে, আমাকে তাহার সর্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুকরোগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সে চায়— সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি, সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার কম্পিত বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল, সে চুম্বকমণির মতো, সর্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম, কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল।

"আবার সেই ভর্ৎসনা, সেই দুর্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গিতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান...।"

ভদ্রলোক থামলেন। আমি বললুম, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা সবসময়ই আমার কাছে কেমন জানি একটুখানি আড়ষ্ট বলে মনে হত। কিন্তু আপনার পড়ার ধরনটি এমনি সুন্দর যে সেটা আর কানে বাজে না।'

বলেই বুঝতে পারলুম, রসভঙ্গ করা হল।

কিন্তু ভদ্রলোক বিচলিত হলেন না। বললেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো আর রবীন্দ্রনাথের গড়ে-তোলা ভাষার সুযোগ পাননি। এমনকি আমার মনে হয়, তিনি যেন বঙ্কিমকেও এড়িয়ে যেতেন— বরঞ্চ তিনি যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের লঘু-শৈলীর দিকে একটু নজর দিতেন তা হলেও হয়তো তাঁর ভাষা খানিকটা গতি-বেগ পেত।'

www.pathagar.com

তার পর জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ভরত-নাট্যম্ দেখেছেন?'

আমি বললুম, 'দেখেছি, কিন্তু লোতির চোখ দিয়ে দেখিনি। এখন যদি আবার দেখতে পাই তবে তার থেকে অনেক বেশি রস বের করতে পারব। আমার লজ্জাবোধ হয় যে বিদেশি লোতি প্রথম দর্শনেই ভরত-নাট্যমের এতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পেল আর আমি এদেশের লোক হয়েও বিদেশির সাহায্য নিয়ে আপন নৃত্য চিনতে যাচ্ছি।'

'রসের ব্যাপারে দিশি-বিদেশি বলে কোনও পার্থক্য তো নেই। আর অন্যের সাহায্য নিতেই বা আপত্তি কী?

"ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত-কেশে আঁচলখানি দোলে"

শোনার পরই তো আমি প্রথম লক্ষ করলুম, দূর-দূরান্ত থেকে যখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা ধেয়ে আসে গ্রামের দিকে তখন তার সৌন্দর্য আমার কোনও চেনা জিনিসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয় ভরে দেয়। বেশির ভাগ লোকই তো প্রকৃতিকে চিনতে শেখে কবির সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। আপনি যদি ভরত-নাট্যম্ লোতির সাহচর্যে শেখেন, তবে তাতে আর আপত্তি কী? কিন্তু আপনাকে একটুখানি সাবধান করে দিই এইবেলা— লোতির বর্ণনাতে কোনও জিনিসের অভাব লক্ষ করেছেন কি?'

আমি খানিকটা ভেবে নিয়ে বললুম, 'না তো।'

'কেন? লক্ষ করেননি, লোতি দেখেছেন প্রধানত অভিনয়ের দিকটা। নাচের দিকটা তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। যে অঙ্গ-সঞ্চালন যে পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে সমস্ত নৃত্যটি তার রূপ পেল, যে রূপ আমার হৃদয়ের ভিতর তার ছাপ মেরে রসসৃষ্টি করল সেই তো আসল নৃত্য— অভিনয় তো তার সামান্য একটি অংশ মাত্র। মনে করুন, আপনি "মেঘ" শুনছেন— তাতে বর্ষার খানিকটা বর্ণনা থাকে কিন্তু সেইটেই তো সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস নয়। তা হলে তো আসল রাগটি আপনাকে এড়িয়ে গেল— সত্যকার রসটি আপনি পেলেন না। রসের মা-ও বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখতে চান বর্ণনার ঝুমঝুমি দিয়ে— যে বাচ্চা তখনও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও বেশি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় মা তাকে শেষ পর্যন্ত রসের স্তন্য না দিয়ে থাকতে পারেন না।

'আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে যে নাচ দেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই খাঁটি রসটাকে ধরতে পেরেছিলুম। আমি দম্ভ করছিনে, আর এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। দেখেননি, গাঁয়ের কত রাখাল ছেলের ভিতরেও এমন রসবোধ থাকে যে প্রথম শ্রবণেই তারা অজানা-অচেনা রাগ-রাগিণী চিনে ফেলে। শুধু তাই নয়, আপন বাঁশি দিয়ে বিনা কসরৎ বিনা মেহন্নৎ সেগুলো শুনিয়েও দেয়। তাই যখন প্রথম ভরত-নাট্যম্ দেখলুম—'

আমাকে বাধ্য হয়ে বাধা দিতে হল। শুধালাম, 'কোথায়?'

'ওহ্! আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, পুদুকোট্টাই থেকে আমার কাহিনী আরম্ভ হওয়ার কারণ আমি ওখানে প্রথম ভরত-নাট্যম দেখি। পুদুকোট্টাই মহারাজার সেক্রেটারির ছেলে য়লমঞ্চলি ভেঙ্কটরাও রামেশ্বরাইয়া চৌধুরী— আমার সতীর্থ— পুদুকোট্টাইয়ে আমার "শুভাগমন উপলক্ষে" ভরত-নাট্যমের ব্যবস্থা করেন। গাইয়ে বাজিয়ে নর্তকী আনানো হয় বিশেষ তোয়াজ করে মদুরা থেকে। লোতির জন্য যেমন করে পণ্ডিচেরির লোক বিশেষ নাচের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেছিল আমার জন্য তেমনি য়লমঞ্চলি মদুরার তরুণী নর্তকীদের সবচেয়ে নামকরাকে মুজরার জন্য ডেকেছিল। পুদুকোট্টাইয়ে দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নেই— একমাত্র অজন্তা শৈলীতে আঁকা কিছু গুহাচিত্র ছাড়া, অবশ্য সে অপূর্ব জিনিস, অজন্তাকেও ছাড়িয়ে যায়— তাই য়লমঞ্চলি আমাকে এমন কিছু দেখাতে চাইল যা আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। স্কটিশে পড়ার সময় বিদেশি য়লমঞ্চলিকে আমি যে সামান্য হৃদ্যতা দেখিয়েছিলুম সে যেন তারই শোধ দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল।

'কী বলছিলুম? হ্যাঁ— আমি প্রথম দর্শনেই ভরত-নৃত্যমে রস পেয়ে গেলুম। য়লমঞ্চলি আমাকে অভিনয় আর মুদ্রাগুলো পাশে বসে বুঝিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার প্রাণ নেচে উঠল নর্তকীর রসসৃষ্টির শুদ্ধ নৃত্যের দিকটা অনুভব করতে পেরে। লোতির বর্ণনায় শুনলেন, নর্তকী প্রেমের কত চিত্র-বিচিত্র অভিনয় করল— লোতি নৃত্যের দিকটা লক্ষ করেননি বলে তার আসল রস, তার মূল রস ধরতে পারেননি। সেটা এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে— "প্রেম"। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর যেমন একটা মূল বক্তব্য থাকে, প্রত্যেক ছবির যেমন একটা মূল বিষয়বস্তু বা "লাইট-মতিফ" (Leit motif) থাকে, ঠিক তেমনি সে রাত্রের ভরত-নৃত্যে আমি যে মূল রসটি ধরতে পারলুম সেটি অলঙ্কারবিবর্জিত শুদ্ধ "প্রেমে"র অনুভূতি।

'লোতি বলেছেন, নর্তকীর আহ্বান শুনে দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ক্ষণেকের তরে তিনি নর্তকীর অনুসরণ করেছিলেন; আমিও ঠিক তেমনি একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। য়লমঞ্চলি আমার কোটের আস্তিনে সামান্য টান দিতেই আবার স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। শুনলুম বলছে, "সুন্দরম্"— '

আমি শুধালাম, 'সুন্দরম্ তো বাংলা নাম নয়।'

বললেন, 'আমার নাম রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। য়লমঞ্চলি মাঝখানের "সুন্দর"টা নিয়ে মাদ্রাজি রসমের "ম" লাগিয়ে সেটাকে দ্রাবিড়স্থ অর্থাৎ "ভদ্রস্থ" করে নিয়েছিল।

'য়লমঞ্চলি বলেছিল, "সুন্দরম্, নৃত্যটা তা হলে তোমার মতো অরসিককেও চঞ্চল করে তুলেছে; আমার মেহনত সফল হল।" আমি বলেছিলুম, "এ মেয়েটির নাচ আমাকে আরও দেখতে হবে।" য়লমঞ্চলি বলেছিল, "সিনেমাতে প্রত্যেক ট্রেলার দেখার সময় যেরকম মনে হয়, ও ছবিটা আমাকে দেখতেই হবে আর তার পর ট্রামে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ট্রেলারের কথা বেবাক ভুলে যায়, ভরত-নৃত্যমের বেলাও তাই। কাল-পরশুর ভিতরেই তুমি সবকিছু ভুলে যাবে"।'

'আমি কিছু বলিনি, কারণ যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তির জন্য সুদ্ধমাত্র তুলনার ওপর নির্ভর করে সেখানে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। ট্রেলার তো চেষ্টা করে চোখের ওপর কৌতূহলের চটক লাগাবার— তাই মানুষ দু মিনিট পরেই সে ভেল্কি-বাজির কথা ভুলে যায়। ভরত-নাট্যম তো আমাকে দিল এক অভিনব রসের সন্ধান, যে রস আপন গৌরবে "স্বে মহিম্নি", ক্ষুদ্র কৌতূহল জাগাবার যার কোনও প্রয়োজন নেই।

'নাচ শেষ হয়েছিল রাত প্রায় একটার সময়। বাড়ি ফিরে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। পুদুকোট্টাই শহরে কোনওপ্রকারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই কিন্তু রাজবাড়ি এবং সেক্রেটারির বাংলোর মাঝখানের পাঁচিল-ঘেরা লনটি সত্যই মনোরম। বাংলোর একপাশে জলের চৌবাচ্চা। বারান্দার ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলোয় দেখলুম রাজার পোষা

www.pathagar.com

হরিণ জোড়ায় জোড়ায় এসে জল খেয়ে গেল— নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারণে। চাঁদ হেলে পড়তে লাগল, সারিবাঁধা গাছের ছায়া দীর্ঘতর হল, রাজার হরিণ আলো-ছায়ার আলিঙ্গনের মাঝখানে একে অন্যের গা ঘেঁষে পূর্বাকাশে আলোর আভাস লাগার পূর্বেই মিলিয়ে গেল।

'আমার মন এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠল।'

রামেন্দ্রসুন্দর থামলেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশের লাল আভা মিলিয়ে যাওয়ার দরুন সমুদ্রের বেগুনি জল আবার গাঢ় নীল হয়ে শেষটায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। এখন আর দেখাই যায় না। আজ চাঁদ উঠবে অনেক দেরিতে।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, 'পরদিন সন্ধেয় আমার মাদ্রাজ ফেরার ট্রেন। য়লমঞ্চলি স্টেশনে এল এগিয়ে দিতে। রাজাকে প্রজা যত না ডরায়, তার চেয়েও বেশি ডরায় তার সেক্রেটারিকে এবং সবচেয়ে বোধহয় বেশি ডরায় তার বড় ব্যাটাকে। য়লমঞ্চলি দুঃখ করে বলল, "ওই দ্যাখো, আমি আসব বলে ওয়েটিংরুম প্ল্যাটফর্ম ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের মধ্যিখানে তুমি বসবে ট্রাঙ্কটার উপর, আমি হোল্ডলটা চেপে, আইসক্রিমটা-পানটা খাব, আড়নয়নে এদিকে-ওদিক তাকাব, তা না। চলতে গেলে সামনে পাইক, পিছনে বরকন্দাজ। কারও দিকে যদি সিকি-নয়নেও তাকাই সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে যাবে, য়লমঞ্চলি কোডাই-কানাল গেছেন 'হনি-মুন' করতে। তোমাকে যে ইম্প্রেশনটা ভালো করে দেখাব তারও উপায় নেই।" এরকম অনবরত বকর-বকর করে য়লমঞ্চলি আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদটা কাটাবার চেষ্টা করছিল।

'কিছু ভুলও বলেনি। কারও শুভাগমন উপলক্ষে সিঁড়ির উপর যে লাল কাপড় পাতা হয় সেটা দেখে আমারও ভয় লাগে। মনে হয়, ওয়েটিংরুম রাক্ষসীর লাল জিভ লকলক করে বেরিয়েছে রাস্তা পর্যন্ত অতিথি অভ্যাগত সবাইকে গিলে ফেলবার জন্য।

'য়লমঞ্চলি বলল, "চল, প্ল্যাটফর্মে শেষের দিকে— যদি কিছু দেখবার মতো থাকে।" পাইক-বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বলল, "তোরা সব বস গিয়ে ওয়েটিংরুমে— আমরা আসছি।"

'দূর থেকেই দেখতে পেলুম একগাদা বাজনার যন্ত্রপাতি। কাছে আসতেই জন পাঁচেক লোক দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের নমস্কার করল। নর্তকী পিছন ফিরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আমার দিকে চোখ যেতেই আমি তাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করলুম। লজ্জায় তার মুখ-কান লাল হয়ে গেল। আরও ভ্যাবাচাকা খেয়ে কী যে করবে বুঝেই উঠতে পারল না— তার পর হঠাৎ যেন লুপ্ত বুদ্ধি ফিরে পেয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে নর্তকীদের কায়দায় আমাকে বারবার সেলাম করল।

'য়লমঞ্চলি বলল, "চল।" একটু দূরে এসে বলল, "পুদুকোট্টাই ভিন্ন অন্য যে কোনও জায়গা হলে আমি তোমাকে পঙ্কজমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম।"

'পঙ্কজম্' 'পঙ্কজম্'— 'ম' যোগ করলে যে শব্দের সৌন্দর্য বাড়ে তা এই প্রথম লক্ষ করলুম।

'লোতি বলেছেন, "জনতার মাঝখানে নর্তকীকে দেখাচ্ছিল পথ-হারা পরীর মতো।" আমার মনে হয়েছিল, "নৃত্যের ভিতর দিয়ে যে রমণী সুধা-পারাবারের সন্ধান পেয়েছে, যার প্রতি পদক্ষেপ প্রতি হস্তবিন্যাস অফুরন্ত রসের ধারা বইয়ে দেয় প্রতিক্ষণে, সে তার ধ্যানলোক থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে আর পাঁচজনের সঙ্গে কথা কয় কোন ভাষায়, খায়-দায়, ওঠে-বসে কী প্রকারে? খান আব্দুল করীম খান সাহেবের গান শোনার পর কখনও কল্পনা করা যায় যে তিনি ওই গলা দিয়েই দৈনন্দিন কথাবার্তা বলছেন? নৃত্যের বশে যে-পদযুগ

www.pathagar.com

প্রজাপতির ডানা হয়ে আকাশে-বাতাসে উড়তে থাকে সেই পা-দু খানি কী করে চলতে পারে শানবাঁধানো প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে?"

'পঙ্কজমের নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল নাচের মজলিসে কিন্তু স্টেশনে মুগ্ধ হলুম পঙ্কজম্‌কে দেখে। ভরত-নাট্যমের বেশ আমার কাছে সবসময়ই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজপুত-মোগলাই নর্তকীরা পরে চুড়িদার টাইট পাজামা আর তার উপর মলমলের ঘাগরা। পাজামা বড় অপ্রিয়দর্শন জিনিস— সেটাকে আস্বচ্ছ ঘাগরা কিছুটা ঢেকে দেয় বলে উত্তর ভারতের নর্তকীর সজ্জায় খানিকটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু ভরত-নাট্যমের নর্তকী পাজামার উপরে পরে মারাঠি ধরনের কাছা-মারা শাড়ি— দুটো জিনিসই বাঙালির চোখকে বড্ড বেশি পীড়া দেয়। উরু আর পদবিন্যাস দেখাবার জন্য মোগলাই পাজামার প্রয়োজন সেকথা বুঝতে পারি, কিন্তু সেটার উপর মারাঠি শাড়ি চাপিয়ে যে নর্তকীর কোন সৌন্দর্যবর্ধন হয় সেটা আমি আজও বুঝতে উঠতে পারিনি।

'স্টেশনে পঙ্কজমের পরনে ছিল মিলের মামুলি শাড়ি আর বাঙ্গালোর সিল্কের কাঁচুলি। কিন্তু নাচের সময় যে-নর্তকীর প্রতি-অঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা সমঝদারের কর্তব্য, সেই যখন আটপৌরে কাপড় পরে নাচের বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন তার দিকে তাকানো শালীনতার লক্ষণ নয়। লোতি নর্তকীর দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "তার গাত্র ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ"— আর আমি এক পলকে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলুম তার স্মরণে আজ বলতে পারি, সে গাত্রে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ ছিল না, এমনকি কোমর আর কাঁচুলির মাঝখানের অনাবৃত স্থলেও না।

'আমার বয়স তখন কম, তাই আমি যে লজ্জা করে দুবার তাকাতে পারিনি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু নর্তকীও যে লজ্জা পেল সেইটে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হল। কত লোক তাদের দিকে তাকায় প্রতিদিন, কই, তারা তো লজ্জায় জড়সড় হয় না? তবে কি আমার সঙ্কোচ-ভরা তাকানোটাই তার মুখে ব্রীড়ার ভাব এনে দিয়েছিল?

'সেটা ঢাকবার জন্যই বোধ করি একটুখানি হেসেছিল।

'আমি জানি, সাদা চামড়ার প্রতি বাঙালির দুর্বলতা আছে কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দাঁতের আসল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে শ্যামবর্ণের ভিতর দিয়ে— বিদ্যুল্লতার শিহরণ তো কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকেই।'

আমি বললুম, 'তুলনাটি বেশ।'

বললেন, 'সাহিত্য-সৃষ্টি যে করে না তার পক্ষে খুব মন্দ নয়। কিন্তু আমি তো কিছুমাত্র বানিয়ে বলছিনে। আর তা করলেও বিশেষ কোনও ফল হবে না। কারণ সাহিত্যরস সৃষ্টি করবার জন্য যে খাটুনির প্রয়োজন তার উপযুক্ত সময় আমার আদপেই নেই। আমি যে কাজ নিয়ে পড়ে আছি তাতে সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে গেলেই সমঝদার পাঠক সন্দেহ করবে, তথ্যের অভাব আমি বাক-চাতুরি দিয়ে ঢাকতে চাই। থাক্ সে কথা।

'সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি। অস্বীকার করব না, পঙ্কজমের নাচ আমাকে মুগ্ধ করেছিল আগের রাত্রিতে, আর আজ সন্ধ্যায় আমাকে মুগ্ধ করল তার মামুলি আটপৌরে ভাব— সাধারণ মেয়ের সাধারণ ব্রীড়া, সাধারণ লজ্জা। নাচের পূর্বে নর্তকীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ করে আমার জন্যই তাকে আনানো হয়েছে, এবং সে-ও তার সমস্ত কলা-নৈপুণ্য

www.pathagar.com

প্রয়োগ করেছিল আমার দেশ-কাল-পাত্র-বোধ বিস্মৃতিতে বিলোপ করে দেবার জন্য, তবু আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি,

"হৃদয় ব্যথিল মোর অতি মৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে এসে প্রাণের গভীরে—"

'আশ্চর্য! সঙ্গীত, পদ-বিন্যাস, অঙ্গ-সঞ্চালন, ভ্রুভঙ্গি, ওষ্ঠাধর কম্পন, অসিত নয়নের কৃষ্ণবিদ্যুৎবহ্নি দিয়ে যে রমণী নিবিড়তম অন্তরঙ্গতায় শতাধিক বার আমার চিত্তজয় করেছিল কাল রাত্রে, তাকে তখন মনে হয়েছিল "ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে' আর আজ যখন সে লজ্জায় মুখ ফিরাল তখন মনে হল, সে তো অত দূরে নয়, সে যে অনেকখানি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আর সেই মুহূর্তেই আমি পেলুম ভয়। অজানা এক অদ্ভুত ধরনের ভয়, বহু বিশ্লেষণ করেও আমি তখন সে ভয়ের কারণ বের করতে পারিনি। পরে একদিন পেরেছিলুম— সেকথা পরে হবে।

'লোতি বলেছেন, ভরত-নাট্যম দেখে তাঁর ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয়ও হচ্ছিল পাছে নর্তকী তার নৃত্য বন্ধ করে দেয়— তা হলে তো তিনি আর তাকে দেখতে পাবেন না। গাড়িতে শুয়ে শুয়ে আমারও মনে হচ্ছিল, নর্তকী আমাকে যেভাবে অভিভূত করে ফেলেছে সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আশাও পোষণ করেছিলুম, সে যেন মাদ্রাজের আগে কোনও স্টেশনে না নেমে যায়। জানতুম এ গাড়ি কলম্বো থেকে আসা প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাজ— অল্প দূরের যাত্রীকে এ গাড়িতে উঠতে দেয় না— তবু তো সামনে রয়েছে বড় বড় স্টেশন, তাঞ্জোর আর তার পর বিল্লপুরম্। সেখান থেকে ডাইনে পণ্ডিচেরি, বাঁয়ে তিরুআন্নামলাই হয়ে বাঙ্গালোর, মহীশূর কত কী।

'রাত তখন তিনটে হবে। আমি আর কিছুতেই আমার কৌতূহল দমন করে উঠতে পারলুম না, পঙ্কজম্‌রা ইতোমধ্যে কোথাও নেমে গিয়েছে কি না জানবার জন্য। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম অস্বীকার করিনে তবু মনে হয়েছিল ছেলেমানুষিটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে— আমার ভিতরকার ছেলেমানুষ তখন বুড়ো সেজে বিজ্ঞ মনকে বোঝাচ্ছে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে দু পা হেঁটে নিলে ঘুম পেলেও পেতে পারে— যেন আমি ইতোপূর্বে ট্রেনে আর কখনও বিনিদ্র যামিনী যাপন করিনি!

'না নামলেই ভালো হত। দেখি, কাঁটাল-বোঝাই নৌকার মতো থার্ড ক্লাসের ভিড়ের এক কোণে পঙ্কজম্ জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভিড়ের মাঝখানে নর্তকীকে আর লোতির "পথহারা পরীর" মতো দেখাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল স্টিম-রোলারের একপাশে যেন কোনওপ্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে ফুটে রয়েছে পথপ্রান্তের বনফুল। দুঃখ হল, কিন্তু আশ্চর্য হলুম না, কারণ ইন্দোর না গোয়ালিয়র কোথায় যেন একবার দেখেছিলুম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খান বসে আছেন থার্ড ক্লাসের জগদ্দল ভিড়ের মাঝখানে। গুণীর কদর পৃথিবী করে না— হয়তো ভালোই। অন্তত ভরতনাট্যমের নর্তকীদের পয়সা হলে তাদের নাচ তিন বৎসরের ভিতরেই বন্ধ হয়ে যায়— গাদা গাদা ভাত, রসম্ আর মণ মণ ঘি খেয়ে তারা দেখতে না দেখতে রাগ্‌বি বলের ঢপ ধরে

www.pathagar.com

ফেলে— নৃত্য তখন সে দেহ-বর্তুল ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু তখনকার মতো দুঃখ হয়েছিল একথা অস্বীকার করিনে— কারণ তখনও আমার এসব গূঢ়তত্ত্ব জানা ছিল না।

'ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছলুম মাদ্রাজ। আমার সঙ্গে ছিল বাড়ির পুরনো চাকর তারাপদ। মাল-বোঝাই কুলির পিছনে যেতে যেতে তাকে জিগ্যেস করলুম যে প্ল্যাটফর্মে পঙ্কজমকে লক্ষ করেছে কি না— পুদুকোট্টাইয়ের নাচে সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল তাই লক্ষ না করাটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। তারাপদ বিচক্ষণ লোক। উত্তর শুনে বুঝলুম, সে প্রয়োজনেরও বেশি অনেক কিছু লক্ষ করেছে— এমনকি আমি যে রাত তিনটের সময় একবার গাড়ি থেকে নেমেছিলুম সেটাও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

'বললুম, "আমি হোটেলে যাচ্ছি। তুমি দেখে এসো তো এরা সব কোথায় ওঠে।"

'তারাপদ আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চেনে— আমার জীবনের কিছুই তার কাছে অজানা ছিল না। তাই সে একটু আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "আচ্ছা"।'

[রচনাটি অসম্পূর্ণ— মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ১৩৫৬]

নারীর অধিকার

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এমএ ডি-ফিল (অক্সন) 'নারীর অধিকার' সম্বন্ধে একখানা রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রধান বক্তব্য নর-নারীর অধিকার সমান হওয়া উচিত। আমাদেরও সেই মত। কিন্তু প্রবন্ধে লেখিকা এমন অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত নহি। আমাদের মূল বক্তব্যে উপস্থিত হইবার পূর্বে দুই-একটি সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমত লেখিকা বলিয়াছেন, 'সেই (অর্থাৎ বৈদিক) সুবর্ণযুগে নরনারীর মধ্যে কোনওরূপ সামাজিক বৈষম্য হইত না।' কিন্তু 'বৈদিক যুগের পরবর্তী স্মৃতিযুগে নানা দিক হইতেই সমাজের দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের পূর্ব গৌরবোজ্জ্বল অবস্থারও অবসান ঘটে।'

লেখিকার সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু প্রশ্ন, এই বৈদিক যুগের সুবর্ণকাল হইতে নারী যে হঠাৎ স্মৃতিযুগের লৌহকালে পতিত হইল তাহার জন্য দায়ী কে? লেখিকার পরবর্তী বাক্য 'স্মার্ত-সমাজপতিগণ নারীগণের জন্য নানাবিধ বেদ-বিরুদ্ধ আইন-কানুন প্রচলিত করেন এবং ফলে নারী সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল ন্যায্য অধিকার হারাইয়া ক্রীতদাসীরূপে পরিণত হন।' কিন্তু স্মার্ত-সমাজপতিগণ কেন করিলেন? লেখিকা সেদিকে কোনও ইঙ্গিত করেন নাই। আমাদেরও আশ্চর্য বোধ হয়; কথা নাই, বার্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করিতেছে, হঠাৎ পুরুষ তেরিয়া হইয়া স্ত্রীকে ক্রীতদাসী বানাইয়া কী চরমসুখ পাইল? লেখিকা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা; কারণ বিনা কার্য হয় না— এই তত্ত্ব তো তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন।

www.pathagar.com

আমরা যদি বলি যে, নারীগণই দায়ী, তবে আমরা লিঙ্কনের কথাতেই সায় দিব। আমাদের বক্তব্য, নারী যে তাহার অধিকার হারাইল তাহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক।

বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল, তাহার কারণ যে পুরুষ তখন বেশি ন্যায়ধর্মী ছিল (ও স্মৃতিযুগে অধর্ম পথে চলিল) তাহা নহে। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে সমাজ যাযাবর অবস্থায়, শেষের দিকে প্রধানত কৃষি ও গো-পালন সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় ব্যবস্থাতেই স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক মূল্য পুরুষের অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহে— প্রায় সমান সমান। সেই যাযাবর কৃষি সমাজব্যবস্থার চতুর্দিকে যে ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি নির্মিত হইল সেইগুলি সেই কারণেই সমান সমান। গ্রামাঞ্চলে তাই আজও দেখিতে পাইবেন, চাষির মেয়ে-বউয়ের অধিকার মধ্যবিত্তশ্রেণির মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি— চাষির মেয়ে গতর খাটায়, ছেলেও গতর খাটায়— মেয়ের উৎপাদনী শক্তি ধান ভানিতে, চাউল কুটিতে, গোয়াল ধুইতে ব্যয়িত হয়। তাহার মূল্য পুরুষের শস্যোৎপাদনের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তাই চাষার মেয়ের বিবাহে পণ-প্রথা প্রায় নাই, কারণ বর বিবাহ করিয়া বাড়িতে বোঝা লইয়া যাইতেছে না, লইয়া যাইতেছে উৎপাদনী শক্তি। মধ্যবিত্ত ঘরে কন্যা শুধু রন্ধনগৃহ সম্মার্জনই করে, তাহার অর্থনৈতিক মূল্য চাষির মেয়ের তুলনায় কম। চাষির মেয়ের দাম যে কত বেশি তাহার আর একটি উদাহরণ দেই। মুসলমানি চাষি মেয়ে বিধবার বিবাহ হয়। যে চাষির বউ ভালো খাটিতে পারে, তাহার স্বামী বিয়োগ হইলে অতি অনায়াসে পুনরায় বিবাহ হয়; অপেক্ষাকৃত অলস বিধবার বিবাহে হাঙ্গামা বেশি। মধ্যবিত্তশ্রেণিতেও দেখিবেন যে মেয়ে মাস্টারি করিয়া টাকা রোজগার করে তাহাকে বউদি, দাদা চোপা দিতে সাহস করেন না। অনেক সময়ে পরিবারে তাহার অধিকার সর্বাধিক।

আমাদের মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ স্মার্ত-যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা জটিল হইতে আরম্ভ করিল। সে জটিল ব্যবস্থার ভিতর বুদ্ধির প্রবেশলাভ ঘটিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্য চালনা, সেনা-সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, নৌ ও জলনিকাশ আয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে 'গতরের' অপেক্ষা বুদ্ধির, সৃজনীশক্তির প্রয়োজন অধিক। যে পুরুষ সেই সমাজ পরিবর্তনের যুগে যত বেশি দান করিতে পারিল তাহার সম্মান ততই বাড়িল। বুদ্ধিজীবীশ্রেণির সৃষ্টি হইল; সে সমাজে স্ত্রীলোককে গতর খাটাইবার আর প্রয়োজন নাই; সে-সমাজে স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয়— অর্থনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে।

যদি বলি সেই অর্থনৈতিক যুগ-পরিবর্তনের সময়, নূতন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সময় স্ত্রীলোকের অবদান নগণ্য ছিল বলিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক মূল্য কমিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ও ধর্মের নানাবিধ অনুষ্ঠানে তাহার অধিকার হ্রাস পাইল, তবে কি ভুল বলা হয়? লেখিকা দার্শনিক। নিরপেক্ষভাবে কোনও বিদ্যান্বেষণের জন্য চিত্তের যে উৎকর্ষের প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহার আছে। তিনি যদি সমাজতত্ত্বের এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঙ্গটি দার্শনিক মননবৃত্তি দিয়া আলোচনা করিয়া নারীজাতিকে সারতত্ত্বটি বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমাদের মহদুপকার হইবে, সন্দেহ নাই। পুরুষের দ্বারা আলোচিত এইসব বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধেয়া লেখিকা সতীদাহ, কৌলীন্য-প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'এইরূপ স্মার্ত ভট্টাচার্যগণের সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ, বৈষম্যমূলক,

www.pathagar.com

অন্যায্য (আমরা অনার্যও বলিব— লেখিকা) বিধি-বিধানে নারীগণ ক্রমশ দুর্গতির চরম গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন।'

কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রশ্ন, মাত্র পুরুষেরাই কি দায়ী? সতীদাহই ধরুন। পুরুষেরা তো বিধান দিলেন— না-হয় মানিয়াই লইলাম, যদিও বুঝিতে পারিলাম না কেন যে এহেন বিকট বিকৃত মনোবৃত্তি এই ভারতবর্ষের পুরুষেই সঞ্চারিত হইল— কিন্তু প্রশ্ন, নারী কি নারীকেও এই হৃদয়হীন আচারে সাহায্য করে নাই, প্ররোচিত করে নাই? শোকাতুরা বিধবাকে হৃদয়হীনা নারীরা কি চতুর্দিকে ঘিরিয়া সতীদাহের ফলস্বরূপ নানারকম স্বর্গ-সুখের বর্ণনা দেয় নাই? জ্বলন্ত চিতায় পতি-অনুগমন না করিলে যে কোনও অজানা শতগুণে যন্ত্রণাদায়ক নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে তাহার বীভৎস চিত্র অঙ্কন করে নাই? পতি-অনুগমন করিলে যে সে কী 'ভয়ঙ্কর' প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া সমাজের আদর্শস্থলা হইয়া থাকিবে তাহার জাজ্বল্যমান— চিতাগ্নি অপেক্ষা সহস্র গুণে জাজ্বল্যমান চিত্র অঙ্কন করিয়া পতিশোকাতুরা বিগতপ্রজ্ঞা, হতবুদ্ধি বিরহবিধুরাকে প্রলুব্ধ করে নাই? হয়তো বিধবা সারাজীবন অজানা কোণে কাটাইয়াছে; হঠাৎ লোকচক্ষুর সম্মুখে দেবীরূপে বিভাসিত হইবার লোভ তাহাকে প্রধানত দেখাইল কে? সেই রোরুদ্যমান অন্তঃপুরে স্মার্ত পণ্ডিতেরা তখন প্রধান নায়ক, না তাঁহাদের পত্নীরা, মাতারা? কে জানে?

নিরম্বু উপবাসের বিধান দিয়া যখন স্মার্ত পণ্ডিত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন তখন মাতা কি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে জল দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন? এস্থলে তো গায়ের জোরের কথা উঠিতেছে না। পুরুষ যে পৈশাচিক আচারের সৃষ্টি করিল, নারী তাহাকে ধর্মজ্ঞানে স্বীকার করিল কেন? গোপনে জল দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত— 'মঞ্জুলিকা'র মাতারা সব ছিলেন কোথায়? অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকে গৌরীদানের সময় সর্বাবস্থায় কি মা-জননীরা আপত্তি জানাইয়াছিলেন, না সমাজের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রমত্ততা তাঁহাদের স্কন্ধেও ভূতের মতো চাপিয়াছিল? না, অন্যান্য নারীর (পাঠিকা লক্ষ করুন, নারীই) গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কন্যাকে অন্তর্জলি বরের সঙ্গে সপ্তপদী হইবার জন্য অগ্রপদী করিলেন?

বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টা নিষ্ফল করিল শুধু পুরুষ? 'ওমা, কী ঘেন্না, ছ্যা ছ্যা,' বলিয়াছে কাহারা— ঐকতানে, নির্মমভাবে?

তাই শ্রদ্ধেয়া লেখিকাকে সবিনয় নিবেদন করি যে, শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে চলিবে না, আপন ভুল বুঝিয়া নারীকে নারীর বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে, আপন ঘর প্রথম গুছাইতে হইবে। নারী-আন্দোলন ব্যাপকভাবে করিতে হইলে হৃদয়হীন আচারের একজিকিউটিভ অফিসার নারীগণকে 'তুমিও ভালো, আমিও ভালো' বলিয়া আগাইয়া গেলে চলিবে না— মেয়েরাই line of supply কাটিবে— স্রেফ অভ্যাসজনিত হৃদয়হীনতা দ্বারা।

এখন মূল বক্তব্য— শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বৈদিক যুগেই ফিরিয়া যাইতে চাহেন? বৈদিক যুগই কি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের আদর্শ? শুনিয়াছি, বৈদিক যুগেও নাকি পিতা ও ভ্রাতাহীন অরক্ষণীয়াকে ঘৃণ্যবৃত্তিতে যোগদান করিতে হইত। তাহাকে বরদাস্ত করিতে হইবে? জানি ঋষি ওই কু-ব্যবস্থার সমর্থন করেন নাই— কিন্তু আদর্শ বাছিবার সময় নিরঙ্কুশ আদর্শ লইব

www.pathagar.com

না কেন? আর এক বিপদ এই যে, বৈদিক যুগ বলিতে অথর্ব বেদের যুগও তো বোঝায়। সেখানে দেখি জ্বর হইলে রোগীকে দুই নদীর মোহনায় খড়ের ঘরে শোয়াইয়া খাটে ব্যাঙ বাঁধিয়া মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থা— কুইনিনের উল্লেখ নাই। লেখিকা কি সত্যই এই চিকিৎসায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন? স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইলে সে নারীকে ধ্বংস করিবার যে কৌশল বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ্যিস, তাহা ফলপ্রসূ নয়) শ্রদ্ধেয়া লেখিকা কি বিংশ শতাব্দীর নারীকে তাহাই বরণীয় বলিয়া উপস্থাপিত করেন? বিবাহ-চ্ছেদ বা ডিভোর্সের দিকে অগ্রসর হওয়াই কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত নহে? অরক্ষণীয়ার বর লাভের জন্য যে প্রজাপতিমন্ত্র শিখানো হইতেছে, এ যুগে তাহাই আমাদের চরম আদর্শ?

আমাদের তো মনে হয়, কী স্মার্ত, কী বৈদিক, সর্বশাস্ত্র মাথায় থাকুন। নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে যুগ যুগ সঞ্চিত নিরপেক্ষ অর্থনীতি, রাজনীতি— বিশেষ করিয়া সমাজনীতির— প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে— কোনও 'সুবর্ণ বৈদিক যুগে' ফিরিয়া যাইবার জন্য নহে, কোনও রঘুনন্দনকে ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়া নহে— তাঁহাকে ও সে যুগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া।

আমাদের মতো সাধারণ কোনও নারী বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে আমি কোনও উচ্চবাচ্য করিতাম না— কারণ যদিও তাহা স্বীকার করিতাম না তবু সে নারীর মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম। কারণ দেখিয়াছি বহু আন্দোলন গোড়ার দিকে 'ধার্মিক' বা 'পশ্চাদমুখী' হয়— অর্থাৎ কোনও কাল্পনিক সুবর্ণযুগে ফিরিয়া যাইতে চাহে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তাহাতে বাঙলা দেশে 'মা কালী'কে লইয়া দাপাদাপি করা হইয়াছিল— আজ আমরা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'মা-কালী'কে বাদ দিয়াই করিয়া থাকি ('মা কালী' নারী; তাঁহাকে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আজ পুরুষ সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছে তাহার জন্য আমরা নারীরা দুঃখিত নই)। কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় যে আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে 'মা-কালী'কে আবাহন করা হয় নাই। মুসলিম লীগ নূতন আন্দোলন, তাই সে আন্দোলন ধর্মপ্রধান। ইসলামের সহিত সুপরিচিতা নহি বলিয়া মুসলমান ভ্রাতারা কোন সুবর্ণযুগে যাইতে চাহেন জানি না, কিন্তু ইতিহাস স্মরণ করিয়া ভরসা রাখি তাঁহারাও একদিন ধর্মালোচনা রাজনীতি হইতে বাদ দিয়া 'বাঙলা কথা' বলিতে শিখিবেন— অর্থাৎ স্পেডকে স্পেড বলিবেন। লেখিকা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা— তিনি স্থির বিচারে আমাদিগকে পথ দেখাইবেন। কোনও দার্শনিক কি সত্যই কোনও বিশেষ সুবর্ণ-যুগে বিশ্বাস করেন?

বঙ্কিম একদিন বলিয়াছিলেন, 'যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।' আমরা বলি যাহা বৈদিক যুগ তাহাই কাম্য নহে, যাহা কাম্য তাহাই বৈদিক যুগ। যদি ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের নারীব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত না হয়, কিন্তু চৌকসবৈদিক, তবুও বেদচতুষ্টয়কে পরম শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিয়া লেখিকার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিব—

If you Vedas come, with you; if you do not come inspite of you.

[সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ড. রমা চৌধুরীর 'নারীর অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। নিবন্ধটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত হয় নাই। 'ইন্দ্রাণী সরকার' এই ছদ্মনাম লেখক ব্যবহার করেন।]

www.pathagar.com

ঘরে বাইরে শ্রমিক নীতি

শ্রমিক দল সংখ্যাগৌরবের বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে শঙ্খরবের প্রতিধ্বনি সর্বদেশে মুখরিত হইয়াছে। কেহ বা ভয় পাইয়াছেন, কেহ ভরসা পাইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সকলের অগোচরে, এমনকি, স্বয়ং ইংরেজের অজানাতে ইংলন্ডে রাতারাতি রাজনৈতিক বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটিয়া গেল। ইংরেজের স্বভাবই এইরকম— তাহার বাম হস্তের আচরণ দক্ষিণ হস্ত জানিতে পারে না। এস্থলে আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং বামহস্তই জানিত না যে সে কী করিয়া বসিয়াছে।

গৃহে যখন এরকম বিপর্যয় ঘটিল, তখন বাইরেও কিঞ্চিৎ হইবে, এইরকম ভয় বা আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। আমাদেরও দুশ্চিন্তা বাহির লইয়া।

প্রশ্ন এই, শ্রমিক দলের প্রথম কার্য কী হইবে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যেসব নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম পূর্ববর্তী শ্রমিক দল না করিয়া অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন সেগুলি তাঁহারা এইবার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেনই।

ইতোপূর্বে বহু সদুদ্দেশ্য লইয়া শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা, তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ পদে পদে খণ্ডিত করিয়াছিল প্রগতি পরিপন্থী, শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী আমলারা। এতদিন ধরিয়া তাহারা যে পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিয়াছিল, তাহার উলটা করিলে তাহাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন গোষ্ঠীবর্গের স্বার্থহানি হয়। দেশে-বিদেশে কাহারওই বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে, ইহাদের নবীন তিলকটি শুধু যে অনভ্যাসের তাহা নয়, চন্দনে বিছুটি মাখানোও বটে।

তবে প্রশ্ন, ইহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল না কেন? সে সাহস শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ছিল না; অন্তরায়ও বিস্তর ছিল। প্রথমত, আমলাতন্ত্র যে পাকাপোক্ত শতাব্দ-বৃদ্ধ আইনকানুন নজির রেওয়াজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নূতন আইন না গড়িয়া ভাঙা অসম্ভব; দ্বিতীয়ত, শক্তি গ্রহণের প্রথমাবস্থায় তাহা করিতে গেলে প্রগতিপন্থিরা তারস্বরে সে আইনের এমনি কদর্য করিত যে, দেশের পাঁচজন ভাবিত যে, শ্রমিক দলের নেতারা অধর্ম বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া প্রাচীন আমলাদের তাড়াইতেছেন— সেইসব আপন আপন আত্মীয়স্বজনকে দিবার জন্য। এই কুৎসা হইতে আত্মরক্ষা কবিবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রীরা অনেক সময় জানিয়া শুনিয়াও শ্রমিকবিরোধী কর্মচারীদের গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

দেশের ভিতরে তো এই। বিদেশে যেসব কনসুলেট, লিগেশন, এম্বেসি সেগুলি ধনপতিদের আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ। তাহারা রাজার হালে থাকে, তাহাদের প্রধান কর্ম সরকারি অর্থে, শ্রমিক দলের অনর্থে ভোজ দেওয়া ও ভোজ খাওয়া। তাহাদের অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণির; শ্রমিক দলের মুখপাত্র হইতে তাহাদের যেমন লজ্জা, তেমনি ঘৃণা। তাহারা পদে পদে শ্রমিক মন্ত্রিদলের মতামত উপেক্ষা করিয়া পুরাতন নীতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে ও রাজনৈতিক ধড়িবাজিতে তাহারা বংশানুক্রমে পরিপক্ব বলিয়া দেশের কর্তাদের আদেশ-উপদেশ যে অর্বাচীনতানিবন্ধন, তাহা বিদেশে সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছে। শ্রমিক দলকে অপদস্থ করিতে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উদগ্রীব ও অকুতোভয়। ইহাদের পৃষ্ঠে সম্মার্জনী সঞ্চালন সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব।

www.pathagar.com

এই দেশি-বিদেশি আমলাদের পিছনে রহিয়াছে রক্ষণশীল ধনপতির দল। ইহারা ব্যাঙ্ক, কারবার, ধর্মসঙ্ঘ (চার্চ), বিশ্ববিদ্যালয়, আইন-আদালত, প্রেস ইত্যাদির শক্তিকুঞ্চিকা লইয়া বসিয়া আছে। শ্রমিক দল ইহাদের এক ধাক্কায় সরাইবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের সহযোগে রাজ্য-চালনা করিয়া ধীরে ধীরে ইহাদের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে হস্ত অপেক্ষা আস্য বৃহত্তর হইয়া পড়াতে সফল হয় নাই। পূর্বে প্রকাশিত 'পরাজিত জর্মনি' প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছি যে, বাইমার রিপাবলিকের সোশাল ডিমোক্রেট সভ্যগণ শক্তি পাইয়াও এ সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন নাই— যুঙ্কার, সামরিক কর্তাব্যক্তি, ধনপতিগণের রাজনৈতিক শক্তি কমাইবার চেষ্টা করেন নাই, কংগ্রেস যখন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন, তখন তাঁহারাও এই বিপদে পড়িয়াছিলেন।

এটলি সাহেব ইতোমধ্যেই কয়েকটি মোক্ষম কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; প্রথমত, নতুন মন্ত্রিসভায় অ-প্রাচীনদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রাচীন শ্রমিকপন্থিদের এতটা সাহস নাই যে, রক্ষণশীলদের নির্মমভাবে আঘাত করিতে পারে। তাহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি ও হন্তকণ্ডূয়ন কম। আমরাও বলি, শবদাহে তরুণদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, যদি তখন শবদেহ উচ্চাবাচ্য করে অর্থাৎ মৃতদেহ ভূতগ্রস্ত হয়, তবে 'শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত আছেন।' এই কথাটিই ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জর্জ আইসাক সাহেব আরও লবণ-লঙ্কা মিশাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছেন, 'পূর্বের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আর নয়, এইবার দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগামী হইবে।' বাঙলা কথায় 'যুদ্ধং দেহি'।

তৃতীয়ত, খবর আসিয়াছে যে, কনসুলেট, লিগেশন, এম্বেসিগুলির সংস্কার করা হইবে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ খবর আসিয়াছে, তবে সেগুলি সরকারি সিলমোহরযুক্ত নয়— তন্মধ্যে প্রধান এই যে, কতকগুলি মোটা কারবার অচিরাৎ রাষ্ট্রধন করিয়া ফেলা হইবে।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন এই; ধনপতিরা কি এতই নির্জীব যে, চতুর্দিকে বিস্তৃত তাহাদের শক্তিধারাগুলিকে একত্রীভূত করিয়া প্লাবনের দ্বারা শ্রমিকদিগকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না? ইহার উত্তর কেহই আপ্তবাক্যের ন্যায় নির্ভুল দিতে পারিবেন না, আমরাও অক্ষম। তবে ভাগ্যফল গণনাকালে যেমন কোনওরকম গ্যারান্টি কেহ চাহে না, আমাদের নিকটও আশা করি কেহ নির্ভুল ফল গণনা আশা করিবেন না।

মনে হইতেছে বিনা বিপ্লবে শ্রমিক দল এত বড় শ্রেণিস্বার্থবিরোধী কার্যপরিক্রমা সফল করিতে পারিবেন না। অথচ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের সম্ভাবনাও তো রহিয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরবর্তী কর্মকলাপে এইসব বর্বর রক্তপাত নীতি তো ইংরেজ বহুকাল হইল বর্জন করিয়াছে। তবে উপায় কী?

উপায় আছে ও সেইখানেই আমাদের মতো গরিব ভারতবাসীর ভয়। আমার মনে হয়, ধনপতিদিগকে দেশে ধনক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বিদেশে। বেদে কথিত আছে, যম পিতৃপুরুষের প্রথম যিনি স্বর্গ অধিকার করেন। মনে হয় পরবর্তী যুগে ইন্দ্র তাহাকে খেসারৎ হিসাবে নরক দান করেন।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা গিয়াছে। বিধ্বস্ত, বিধ্বংস ইউরোপে মার্কিন প্রবেশাধিকার চাহিতেছে। চীনের বাণিজ্যাধিকারও নাকি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ইংরেজ ধনপতিরা যায় কোথায়?

www.pathagar.com

তাই ভয় হইতেছে শ্রমিক দল নির্বিকার চিত্তে ভারতবর্ষকে ডাকিনীর হস্তে সমর্পণ করিবেন। ভূরিভূরি প্রমাণ দিবার উপায় নাই— যদিও পূর্বতন শ্রমিক মন্ত্রিদল ভারতবর্ষের প্রতি কী অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই ভুলেন নাই! তবে একটি সামান্য নজির নিবেদন করিতেছি। বর্মা বিজয়ের পর সেখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে নতুন পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে বর্মিরা পুনরায় মূষিক হইবে। এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর আছে মোটা মোটা অক্ষরে, কট্টরদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া শ্রমিক নেতাদেরও।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.৮.১৯৪৫

আফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক

যে অঙ্কটি আমি লিখিতেছি তাহার মূল ঘটনাগুলি যেকোনো আফগান ইতিহাসে পাওয়া যায় কিন্তু পশ্চাতে যে দাবাবড়ের চাল চালিয়াছিল, তাহা আমি কাবুলে মোল্লা মৌলবি ও রাজপরিবারের লোকের কাছ হইতে সংগ্রহ করি। যাঁহারা মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী ফখরুখ-সিয়র, নিকু-সিয়র, রফিউদদৌল্লা, রফি উদ-দরজাত, মুহম্মদ শাহ প্রভৃতি বাদশাহের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ঘটনাময় জীবন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারই জানেন যে, সে যুগের ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরেই মনে হয়, ইতিহাস পড়িতেছি না, পড়িতেছি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর রোমান্টিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্তানের আমির ছিলেন হবিবউল্লাহ খান। তাঁহার ভ্রাতার নাম নসরউল্লা খান ও দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে ইনায়েতউল্লা খান ও আমির (পরে) আমানউল্লা খান। পাঠক ভয় পাইবেন না; উপস্থিত এই কয়টি নাম স্মরণ করিয়া রাখিলেই আফগান ইতিহাসের প্রধান নায়কদের ভাগ্যচক্রগতি লক্ষ করিতে পারিবেন।

হবিবউল্লার ভ্রাতা নসরউল্লা দেশের মোল্লাদের এমনি প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনায়েতউল্লা তাঁহার মৃত্যুর পর আমির হইবেন এই ঘোষণা হবিবউল্লা করিতে সাহস পান নাই। বরঞ্চ দুই ভ্রাতাতে এই নিষ্পত্তিই হইয়াছিল যে, হবিবউল্লার মৃত্যুর পর নসরউল্লা আমির হইবেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর আমির হইবেন ইনায়েতউল্লা। এই নিষ্পত্তি দৃঢ়তর করিবার বাসনায় হবিবউল্লা-নসরউল্লায় মীমাংসা করিলেন যে, ইনায়েতউল্লা নসরউল্লার কন্যাকে বিবাহ করিবেন। হবিবউল্লা মনে মনে বিচার করিলেন যে, আর যাহাই হউক, নসরউল্লা জামাতাকে হত্যা করিয়া 'দামাদ-কুশ' (জামাতা-হন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হইতে চাহিবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকিতে পারে, জয়পুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া জামাতা দিল্লির বাদশাহ ফররুখ-সিয়রকে নিহত করেন, তখন দিল্লির আবালবৃদ্ধবনিতার 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি দিল্লি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাস্তার বালকেরা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিংহের পালকির দুই পাশে ছুটিয়া চলিত ও সিপাই বরকন্দাজের তম্বি-তম্বা উপেক্ষা করিয়া তারস্বরে ঐক্যতানে 'দামাদ-কুশ' 'দামাদ-কুশ' বলিয়া চিৎকার করিত। এমনকি জয়পুরেও তিনি এতই অপ্রিয়

www.pathagar.com

হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক বিশেষ পত্র দ্বারা তিনি জামাতা হত্যার কারণ দর্শাইয়া সাফাই গাহিয়াছিলেন। পত্রখানা অধুনা বোম্বায়ের এক ঐতিহাসিক ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে।

হবিবউল্লা-নসরউল্লা-ইনায়েতউল্লা সকলেই এই চুক্তিতে অল্পাধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন মাতৃহীন ইনায়েতউল্লার বিমাতা, আমানউল্লার মাতা, হবিবউল্লার দ্বিতীয় মহিষী। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনিও দাবা ঘুঁটিগুলির দিকে কড়া নজর রাখিয়া স্থির করিলেন, নসরউল্লা, ইনায়েতউল্লার মতো দুই প্রধান ঘুঁটিকে মারিয়া তাঁহার নিজের বড়ে-পুত্র আমানউল্লাকে দিয়া তিনি রাজা (হবিবউল্লাকে) মাত করিবেন।

এমন সময় কাবুলের অতি উচ্চ খানদানি বংশের মুহম্মদ তর্জি সিরিয়া-নির্বাসন হইতে দেশে ফিরিলেন। সঙ্গে তাঁর পরমাসুন্দরী তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া ও বিবি খুর্দ। ইঁহারা দেশ-বিদেশে দেখিয়াছেন, লেখাপড়া জানেন, উত্তম বেশভূষা পরিধান করিতে পারেন; ইঁহাদের উদয়ে কাবুল-কন্যাদের মুখ অতি ম্লান, কুৎসিত, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড' (অজ জঙ্গল অমদেহ = যেন 'জঙ্গলি') মনে হইতে লাগিল।

হবিবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মাতা— যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী, কিন্তু ইনায়েতউল্লার মাতার মৃত্যুতে প্রধানা মহিষী হইয়াছেন— এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রধান অতিথি তর্জি পরিবার, কন্যাগণসহ। রানি অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে হুকুম দিলেন যে, ইনায়েতউল্লাকে কাওকাবের প্রতি যে কোনওপ্রকারে আকৃষ্ট করিতেই হইবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে দুই-একটি কামরা বিশেষ করিয়া খালি রাখা হইল। সেখানে যেন কেহ হঠাৎ গিয়া উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলিল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানি স্বয়ং ইনায়েতউল্লাকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন, আর অতি সন্তর্পণে কানে কানে কাওকাবকে বলিলেন, 'ইনিই যুবরাজ (মুঈন উস-সুলতানে), আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ আমির।' কাওকাব ইঙ্গিতটা হয়তো বুঝিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে। তাছাড়া শঙ্কারাচার্যও তো বলিয়াছেন, তরুণ তরুণীর রক্ত অনুসন্ধান করে। প্ল্যানটা ঠিক উতরাইয়া গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরিতে ঘুরিতে ইনায়েত-কাওকাব পুরীর এক নিভৃত-কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন। ইনায়েত ভাবিলেন, স্বেচ্ছায় ওই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে ফ্রিডম অব উইল), রানি জানিতেন তাঁহার জালে ঠিক মাছ ধরিয়াছে (ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে বলে প্ল্যানড্ ডেস্‌টিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানি হঠাৎ যেন লক্ষ না করিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তরুণ-তরুণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সম্মানার্থে নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রানি সোহাগ মাখিয়া অমিয়া ছানিয়া সপত্নী-পুত্রকে বলিলেন, 'বাচ্চা, তোমার মাতা নেই, আমিই তোমার মাতা। তোমার সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলিবে না তো কাহাকে? তোমার বিবাহের ভার তো আমার স্কন্ধেই। এই কন্যা যদি তোমার মন হরণ করিয়া থাকে তবে এবম্প্রকার ব্রীড়াবনত হইতেছ কেন? তর্জি-কন্যার পাণিগ্রহণ অতীব শ্লাঘনীয়। তোমার হৃদয় কী বলে?'

হৃদয় আর কী বলিবে? ইনায়েত তখন কাওকাব ও রানির দুই জালে বদ্ধ মক্ষিকা।

www.pathagar.com

হৃদয় যাহা বলে বলুক। মুখে কী বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কাবুলের চারণরা পঞ্চমুখ। কেহ বলেন, তিনি মৌনতা দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেহ বলেন, মৃদু আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কেননা জানিতেন যে, নসর-কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ প্রায় স্থির; কেহ বলেন, মৃদুস্বরে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেননা পূর্বমুহূর্তেই নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রেম নিবেদন করিয়া বসিয়াছিলেন— হয়তো ভাবিয়াছিলেন প্রেম আর বিবাহ তো ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া— পরমুহূর্তেই এড়াইবেন কী করিয়া; কেহ বলেন, 'শুধু হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করিয়াছিলেন তাহা হইতে 'হস্ত-নিস্ত' ('হাঁ'-'না'— যে কথা হইতে বাঙলা 'হেস্ত-নেস্ত' আসিয়াছে) কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। কেহ বলেন, তিনি কিছু প্রকাশ করিবার পূর্বেই রানি কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কাবুল চারণবর্গের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

অর্থাৎ সেই অবস্থায় রাজা হউক, রাজপুত্র হউক, প্রজা হউক, দাস হউক, সাধারণ লোক গুরুজনের সম্মুখে যাহা করিয়া বা বলিয়া থাকে, ইনায়েত তাহাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কী বলিয়াছিলেন, তা জানিবার যত না প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, রানি-মা মজলিসের সম্মুখে গিয়া সে বলার কী অর্থ প্রকাশ করিলেন। জালবদ্ধ ভারতবাসী মাত্রই জানে, আমরা ক্ষীণকণ্ঠে দেশে আবেদন ক্রন্দন করিয়া কী বলি না বলি তাহার ওপর নির্ভর করিয়া নুন, মুদলেয়ার বিশ্বের মজলিসে নিজেদের ভাষণ তৈয়ার করেন না। তাঁহাদের কণ্ঠ রাজকণ্ঠ। সে প্ল্যানে খোলে, প্ল্যানে বন্ধ হয়।

রানির কণ্ঠ মজলিসের আনন্দোল্লাস ধ্বনি ক্ষণিকের মতো ছাপাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, 'আজ পরম আনন্দের দিন। যুবরাজ ইনায়েত তর্জি-কন্যা কাওকাবকে বিবাহ করিবেন। খানা-মজলিস রাত্রি দুইটার সময় ভাঙিবার কথা ছিল; তাহা বাতিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলিবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাইতেছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি, আনন্দোচ্ছ্বাস। দাসদাসী ছুটিল বিবাহ প্রস্তাবের 'তত্ত্বের' তত্ত্বতাবাস করিতে। সবকিছুই রাজবাড়িতে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে মৌজুদ পাওয়া গেল। আশ্চর্য হইবার সাহস কাহার?

তর্জি হাতে স্বর্গ পাইলেন; কাওকাব হৃদয়-স্বর্গ পাইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানি হবিবউল্লার নিকট 'সুসংবাদ' জানাইয়া দূত পাঠাইলেন । মাতা ও রাজমহিষীরূপে তিনি ইনায়েতউল্লার হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানিতে পারিয়া তর্জি-কন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। প্রগতিশীল আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী সুশিক্ষিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন দ্বিতীয় বধূ নাই যিনি রাজপ্রাসাদ অলঙ্কৃত করিতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খোদাতালার মেহেরবানিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজ অতিসত্ত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'আকদ-রসুমাতে'র (আইনত পূর্ণ বিবাহ) দিবস ধার্য করিয়া পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবিবউল্লা পত্র পাইয়া ক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু রাগান্ধ হইলেন না। আর কেহ না হউক, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মূর্খ ইনায়েত নসরকন্যাকে হারায় নাই, হারাইতে বসিয়াছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবিবউল্লা যদিও অত্যন্ত অলস ও কামুক ছিলেন, তবু বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে রহিয়াছে মহিষী। বিমাতার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না। হবিবউল্লা কখনও পূর্ববঙ্গে আসেন নাই; কিন্তু প্রবাদটি জানিতেন।

www.pathagar.com

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হবিবউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন। খোদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে মহিষী শুভবুদ্ধিপ্রণোদিতা হইয়া এই বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তর্জিকন্যা কাওকাব যে সর্বাংশে রূপগুণসম্পন্না তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, সুরাইয়াও সর্বাংশে কাওকাবের ন্যায় সুশিক্ষিতা, সুরূপা, সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই বা খাস কাবুলি জংলি বিবাহ করিবেন কেন? অতএব তিনি মহিষীর সৎদৃষ্টান্ত অনুকরণে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিবাহ স্থির করিয়া সেই মর্মে তর্জির নিকট প্রস্তাব এই পত্র লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। সত্ত্বর তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া— ইত্যাদি ইত্যাদি।

হবিবউল্লা জানিতেন রানির মতলব, ইনায়েতের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপাইয়া দিয়া, আমানউল্লার সঙ্গে নসরকন্যার বিবাহ দিবার। তাহা হইলে নসরউল্লার মৃত্যুর পর আমানের আমির হইবার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়া যায়। হবিবউল্লা সে পথ বন্ধ করিবার জন্য আমানের স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপাইলেন। যে রাজমহিষী কাওকাবের বিদেশি শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় শতমুখ তিনি কোন লজ্জায় সুরাইয়াকে ঠেকাইবেন? বিশেষত যখন চিহলসতুন হইতে বাগইবালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে যে সুরাইয়া কাওকাব হইতে উৎকৃষ্টা বই নিকৃষ্টা নহেন।

রানির মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করিতে গিয়া তিনি যে বিপদগ্রস্ত হইলেন। হবিবউল্লাকে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরকন্যাকে তুই পেলিনি, আম্মো পেলুম না। তবু মন্দের ভালো, নসরউল্লার কাছে এখন ইনায়েত-আমান দুই-ই বরাবর। ইনায়েতের অক্ষ এখন আর নসরকন্যা সিসায় পক্ষপাতে পুষ্ট হইবে না তো!— সেই মন্দের ভালো।'

এখন কী কর্তব্য! রানি মন্ত্রণা করিলেন, এখন দ্রষ্টব্য যে হবিবউল্লা যেন এমন সময় মারা যান, যে সময় আমানউল্লার শুভযোগ আছে— ফলিত জ্যোতিষার্থে নহে, এই অর্থে যে তখন যেন নসর, ইনায়েত কেহই রাজধানীতে না থাকেন। কিন্তু মানুষ মরে ভগবদিচ্ছায়— সে আমিরই হউক, আর ফকিরই হউক। অতএব হবিবউল্লাকে হত্যা করিতে হইবে— গুপ্তহত্যা।

রানি হবিবউল্লার দুশমনদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু এইখানে আফগান ইতিহাসের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। সে অঙ্ক লিখিবেন— কৌটিল্য, কারণ সে অঙ্ক নির্জলা রাজনীতি, অর্থনীতি; আমি মদন-পর্যায় বাৎস্যায়নের হইয়া লিখিয়া দিলাম।

আমি শুধু ভাবি যে তর্জি এই গজকচ্ছপ যুদ্ধে কী বিমলানন্দই না উপভোগ করিয়াছিলেন! ডবল কন্যার জন্য রাতারাতি ডবল রাজপুত্র!

'দেশ' পূজাসংখ্যা, ১৩.১০.১৯৪৫

www.pathagar.com

বেলজেন, স্টেটস্‌মেন

১

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি কারাদম্‌দমম্‌
শ্বেতাঃ স্থিরমিচ্ছান্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম।

(পরিবর্তিত *মহাভারত*— বকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির)

২৭ অক্টোবরের *স্টেটস্‌মেন* কাগজের সম্পাদকীয় বেলজেন ও এই দেশের জেলের তুলনা করিতে গিয়া নানা কথা বলিয়াছেন। সেগুলির উত্তর 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হইয়াছে। বেলজেন ও ভারতীয় জেলে তুলনা করা যায় কি না, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহাই দ্রষ্টব্য।

তৎপূর্বে দুই-একটি কথা অবতরণিকা হিসাবে বলিয়া লইলে ভালো হয়। প্রথমত, বেলজেন, বুখেনবাল্ট, ওরানিয়েনবুর্গ, ডাশাওয়ের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নাই— *স্টেটসমেন* সম্পাদকেরও নাই। আলিপুর, দমদমা, লাহোর, লালকেল্লা চিনিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। স্বয়ং বিশ্বকবি, পরম খানদানি— কত যে খানদানি তাহার প্রমাণ কবির 'স্যার' উপাধি, তাঁহার পিতামহের 'প্রিন্স' উপাধি *স্টেটসমেনের* জাতভাইদেরই দেওয়া— চিরটা কাল কাটাইলেন পদ্মার বিশাল বক্ষে ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। কিন্তু তিনি পর্যন্ত কারারুদ্ধদের প্রতি উল্লেখ করিয়া গাইলেন,

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন ইত্যাদি

(অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার)

যাহা করিতে পারেন নাই— রবীন্দ্রনাথ তাহাও করিয়াছেন। আলিপুরের জেলখানাকেও তাঁহার কাব্যে অমর করিয়া গিয়াছেন;— শুনছি নাকি বাঙলা দেশের গান হাসি সব ঠেলে/ কুলুপ মেরে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

* * *

টুটল কত বিজয় তোরণ লুটলো প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো,
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে,
তখনও এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।

(পূরবী)

স্টেটসমেনের খুবসম্ভব সব এই জায়গার সঙ্গে পরিচয় নাই। যাঁহারা এইসব জায়গায় স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় গমনাগমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও বোধ করি, *স্টেটসমেনের* কোনও যোগাযোগ নাই। তিনি ফিরপোতে খান, পেলিটিতে নাচেন; সেসব জায়গায় যাবার মতো অর্থ ও ইচ্ছা রাজবন্দিদের থাকার কথা নহে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের যোগাযোগ যদি কখনও হয় তবুও ধরিয়া লইতে পারি যে, *স্টেটসমেন* তখন পরম উৎসাহে জেলের নিদারুণ কাহিনী আকণ্ঠ পান করেন না। এদিকে সরকারও জেলে যেসব অত্যাচার অনাচার হইতেছে সেসব অভিযোগের

www.pathagar.com

কোনও উত্তর দেন নাই— স্বয়ং 'স্টেটসমেন' ও তাঁহার 'স্টেট' অথবা কূটবুদ্ধি দ্বারা তাহা লক্ষ করিয়াছেন। তবেই প্রশ্ন, *স্টেটসমেন* বিচার করিতেছেন কী প্রকারে? তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন। ভাবটা এই, ইংরেজের যে জাজ্বল্যমান আদর্শবাদের ইতিহাস রহিয়াছে তাহা হইতে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, ভারতের জেলগুলি বেলজেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। ইংরাজ যে অনেক মহৎ কীর্তি করিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই— অবশ্য ধর্মত বলিতে গেলে সকল জাতই কিছু না কিছু মহৎ কীর্তি করিয়াছেন ও পরিমাণ নির্ভর করে প্রোপাগান্ডা শক্তির উপর। কিন্তু অভিযোগ উপস্থিত হইলে তো পূর্ব ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া সবকিছু হাসিয়া বা 'হিট ব্যাকের' ভয় দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষত ভারতের জেলগুলি তো ডিন ইনঙ জাতীয় ধর্মভীরু মহাজন দ্বারা চালিত হয় না— হইলে কোন পাষণ্ড বেলজেনের সঙ্গে দেশি জেলের তুলনা করিত?

এমন লোক যদি পাওয়া যাইত, যিনি জার্মান ও ভারতীয় উভয় জেলেরই নিকট রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে মীমাংসা সহজ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার উপায় নাই। কারণ যে জর্মন জেলে মার খাইয়াছে সে ইংরেজের স্নেহ পায়, আর যে আলিপুর ফের্তা তাহাকে নাৎসিরা 'বৎস' বলিয়া কোল দেয়। কিন্তু সৃষ্টির কী বিচিত্র প্যাটার্ন নির্মাণ! এইরকম একটি লোকও জন্মিয়াছেন এবং কী কৌশলে যে তিনি অলৌকিক সাধনাটি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার রহস্য আমরা আজও নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই।

সেই খানদানি বিশ্বকবির ঘরের ছেলে শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ভাবিতেছি। তিনি জর্মন জেলের নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও এদেশের জেলের আরাম যে কতবার কত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়াছেন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি যদি স্বাস্থ্যসমেত দমদমা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের বহু সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

প্রথম প্রশ্ন : ইংরাজ সভ্যতার নিকট বহু প্রকারে 'ঋণী' অথচ 'নেমকহারাম' ভারতবাসীই কি এ তুলনা প্রথম আরম্ভ করিয়াছে? উত্তরে একখানা সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

'I once did my best to persuade Goering to use his influence with a view to their (i. e. concentration camps) abolition. His answer was typical. After listening to all I had to say, he got up without a word and went to a book-case, from which he took a volume of the German Encyclopaedia. Opening it at Konzentrationslager (concentration camps) he read out 'First used by the British in the South African War.' He was pleased with his own retort, but the truth of the matter was that, though it was he who had originally formed the camps, when he was Minister of Police for Prussia, he had no longer anything to do with them, They were entirely under the control of Himmler.'*

* Failure of a mission p. 29.

www.pathagar.com

'আমি একবার গ্যোরিঙকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যেন তিনি তাঁহার প্রভাবের জোরে এইগুলি (অর্থাৎ ডাশাও ও বুখেন বোল্ডের কনসানট্রেশন ক্যাম্পগুলি) উচ্ছেদ করিয়া দেন। তিনি যে উত্তর দেন, সে তাঁহাকেই মানায়। আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা তিনি কান দিয়া শুনিলেন ও একটি মাত্র বাক্য ব্যয় না করিয়া উঠিয়া গিয়া পুস্তকের সেলফ হইতে জর্মন বিশ্বকোষের এক খণ্ড লইয়া আসিলেন। কনসেনত্রাৎসিয়ানসলাগারের (কনসানট্রেশন ক্যাম্প) স্থানটি খুলিয়া জোরে পড়িতে লাগিলেন, 'সর্বপ্রথম ইংরাজ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ব্যবহৃত'। গোরিঙ আমার মুখের উপর পাল্টা জবাব দিয়া নিজে নিজে খুশি; কিন্তু সত্য কথা এই যে, যদিও তিনিই প্রাশার পুলিশ-মন্ত্রী হিসাবে ওইসব ক্যাম্পগুলি প্রথম নির্মাণ করেন, সেগুলির উপর তখন তাঁহার আর কোনও হাত ছিল না। হিমলারই তখন সর্বেসর্বা।'

জর্মনিতে গ্যোরিঙই এগুলি প্রথম নির্মাণ করেন তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযোগের তো কোনও সদুত্তর হইল না। বিশ্বাস না হয় দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন। পাঠক আশাকরি, বলিবেন না যে, যে লোকটির পুস্তক হইতে আমি উদ্ধৃত করিতেছি তিনি নিতান্ত সফরীপ্রোষ্ঠি! গ্যোরিঙের সঙ্গে কোন অধম দহরম-মহরম করিতে সক্ষম! লেখক মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধান রাজদূত, সর্বাধিকারী (প্লেনিপটেনশিয়ারি) শ্রীযুত স্যর নেভিল হেন্ডারসন। তিনি জর্মনিতে ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯-এর যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত চেম্বারলেন সরকারের মুখপাত্র হিসাবে ছিলেন। ম্যুনিকে বিনা ক্লোরোফর্মে যখন চেকদের পদযুগল কপাৎ করিয়া কাটা হয় তখন তিনিই রামদাখানা আগাইয়া দিয়াছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭.১১.১৯৪৪

২

সে যাহাই হোক, আণবিক বোমার ন্যায় কনসানট্রেশন ক্যাম্প (ক-ক) নামক আপামর ত্রাসসঞ্চারক প্রতিষ্ঠানটি কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমরা শুধু সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সব জনমান্য জর্মন বিশ্বকোষ ও গ্যোরিঙ নিজেদের কারাগারগুলিকে আফ্রিকাস্থ ইংরাজ কারাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য সে যুগে ইংরাজ-জর্মনে শত্রুতা ছিল না— হেন্ডারসন তখন গ্যোরিঙের পরম মিত্র— তাঁহার সঙ্গে নিত্য নিত্য খানাপিনা করিতেছেন, পূর্ব প্রাশায় তাঁহার জমিদারিতে শিকার খেলিতে গিয়াছেন। এই হৃদ্যতাকে শ্লেষ করিয়াই তৎকালীন বার্লিনস্থ মার্কিন রাজদূত ডডের কন্যা মার্তা তাঁহার পুস্তকে 'জর্মনিতে আমার কয়েক বৎসর'-এ লিখিয়াছিলেন, 'হেন্ডারসনকে লইয়া খুব মাতামাতি হইতেছিল'— হি ওয়জ ওয়াইজ অ্যান্ড ডাইনড'!

দ্বিতীয় তুলনাটি একটি গল্প দিয়া আরম্ভ করি। শুলৎসে ও শ্মিটে বার্লিনের রাস্তায় দেখা। শুলৎসে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি নাকি বেশ কিছুকাল ক-কতে কাটিয়ে এসেছ? নানা লোক নানা কথা কয়; তুমি তো সবকিছু দেখেশুনে এসেছ— সত্যি খবর তুমি বলতে পার।' শ্মিট হাসিয়া বলিল, 'উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। আমাকে দিয়েছিল একখানা সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট— ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম, বেডরুম, ড্রেসিংরুম, বাথ। তোফা লুই ক্যাঁজ ফর্নিচার। পাঁচবেলা আহার।

www.pathagar.com

ব্রেকফাস্টে পরিজ, ভাজা সামোন, মোলায়েম সসিজ, নরম মুর্গি, গরম কটলেট— ' শুলৎসে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, 'সে কী কথা? ম্যুলারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল— তা শুনে তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।' শ্মিট বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, 'বলেছিলেন নাকি? বেশ করেছিলেন। খুব করেছিলেন। তাই তো আবার পাকড়ে নিয়ে গেছে যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।'

গল্পটি হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল যে জর্মনির জনসাধারণ ক-ক সম্বন্ধে নানাবিধ গুজব শুনিয়া সত্য নিরূপণে উৎসুক থাকা সত্ত্বেও হিমলার কোনও বিবৃতি দেন নাই।

আমাদের জানামতে ভারত সরকারও মৌলানা আজাদের ভাষায়, 'অমানুষিক অত্যাচারের' কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। খবরটি *স্টেটসমেন*ও দুসরা নভেম্বরের কাগজে বাহির করিয়াছিলেন। শিরোনামা দিয়েছেন— 'Atrocities in Indian Jail.' Government Silence Criticized! *স্টেটসমেন* কী উদ্দেশ্য লইয়া খবরটি ছাপাইয়াছেন জানি না। বোধহয় সরকার যাহাতে 'হিট ব্যাক' বা 'উলটা চড়' মারেন সেই উদ্দেশ্যে। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য *স্টেটসমেন* ইংরাজ সরকারের চোপদার নহেন— চোপাদেনেওয়ালা বটেন, ভারতীয়দের কাছে কাগজ বেচিয়া ভারতীয়দেরই— চোপাদার না হইয়া চোপদার হইলে বহু পূর্বেই স্বরাজ আসিত।

সদাশয় সরকারকে কোনও অনুরোধ আমি কখনও করি না। কিন্তু এখন করিতেছি, 'হে সরকার বাহাদুর, দমদমায় সুপারিন্টেন্ডেন্টের নোকরিটি খালি পড়িলে *স্টেটস্‌মেন*কে দিও। মাগ্‌গি ভাতা আমরাই বারোয়ারি করিয়া দিব।'

বেলজেনের ভিতরে কী অত্যাচার হইত ও ভারতীয় জেলে কী অত্যাচার হইতেছে তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কারণ বেলজেন জাতীয় যে আধা ডজন ক-ক জর্মনিতে ছিল সেগুলি মিত্রশক্তি তন্ন তন্ন করিয়া, দলিলদস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, ফটো তুলিয়া, বাইস্কোপ বানাইয়া, তেইশ লোক ঘুরাইয়া সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। ইংরাজরাজত্বে ভারতে এদেশবাসীরা যেদিন অক্ষরে অক্ষরে সে সুযোগ পাইবে সেইদিনই ভিতরকার তুলনা সম্ভবপর হইবে। তদুপরি আরেকটা মারাত্মক তফাৎ রহিয়াছে। ক-ক মাত্র আধ ডজনখানেক ছিল। ভারতবর্ষে জেলের সংখ্যা কত ঠিক জানি না। বোধহয় ছয়টির বেশিই হইবে। সেই পঙ্গপালের আনাচে-কানাচে সরকারের জানা-অজানাতে, সুপারিন্টেন্ডেন্টের হুঁশিয়ার খেয়াল-খুশিতে কী হইতেছে না হইতেছে তাহার হিসাবনিকাশ করিতে হইলে বিরাট সেনসাস আপিসের হাজারো জেরা বসাইতে হইবে। আর বসাইয়াই বা হইবে কী? রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—

রাজকারা বাহিরেতে নিত্যকারাগারে

জেলের বাহিরেও তো জেল। এই যে মাত্র সেইদিন কলিকাতার বুকের উপর অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিল তাহা কোন বেলেজেনে কী সংখ্যায় হইয়াছে *স্টেটস্‌মেনই* জানেন।

পাঠক স্বপ্নেও ভাবিবেন না, আমরা ক-ক'র পক্ষে সাফাই গাহিতেছি। এমন অপকর্ম করিলে যেন আমরা কোনওদিন স্বাধীনতা না পাই। যুদ্ধ লাগিবার পূর্বেও ইংলন্ড সরকার জানিতেন ডাশাও ও ওর‍্যানয়েনবুর্গে কী হয় না হয়; পূর্বে উল্লিখিত হেন্ডারসেন সাহেবের পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। তবে যুদ্ধ না লাগা পর্যন্ত সরকার এ সমস্ত জর্মনির নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। যুদ্ধ লাগার পর সরকার ইহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়া তাঁহাদের মতে 'প্রামাণিক' ব্লু-বুক প্রকাশ করেন। নিঃস্বার্থ সত্যের খাতিরে, না

www.pathagar.com

ইংরাজ জনগণের মন জর্মনবিমুখ করিবার জন্য তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ভারতবাসীরা যুদ্ধ লাগার পূর্বেও নাৎসি অনাচারের নিন্দা করিয়াছেন।

হলপ করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে স্বয়ং *স্টেটসমেন*ও ক-ক'র নিন্দা করিয়া যুদ্ধ লাগার পূর্বেই লিখিয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাস্য, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ভারতীয় জেলের নির্মম নিন্দা না করা পর্যন্ত *স্টেটসমেন* কয়বার জেল-তদন্ত চাহিয়াছেন। দেশের মৃদু প্রতিবাদ গুঞ্জরণ কি *স্টেটসমেনের* মতো ভারি কাগজের পাতলা কানে কখনও পৌঁছায় নাই? আশ্চর্য!

কিন্তু এসব কথা থাক। *স্টেটসমেনের* কথায় বেলজেন চলে নাই, আলিপুর চলে কি না জানি না।

কিন্তু আসল তফাৎ কোথায় ও সে তফাৎ কাহার স্বপক্ষে কাহার বিপক্ষে যায় পাঠক বিবেচনা করিবেন।

(১) যুগ-পরিবর্তনকারী আন্দোলনের পুরোভাগে সবসময় শান্তশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী থাকেন না— বড় বড় অভিযানেও না। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা খানদানি ঘরের সুবোধ ছেলে ছিলেন না। ক্লাইভ-হেস্টিংস ইত্যাদি সব দুঁদে দস্যি ছেলে— অ্যাডভেঞ্চারার! অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ঔপনিবেশিকগণ সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিয়াছি। ইহারা 'কিড গ্লাভস' বা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না।

জর্মনির ভদ্রঘরের সুবোধ ছেলেরা যখন ফরাসি-ইংরেজ তথা লিগ অব নেশনের বিস্তর খোসামোদ করিয়া রাজ্য চালনা করিতে পারিলেন না, তখন তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া আসিল দুঁদেরা। তাহাদের সর্দার হিটলার, হিমলার, শ্লাইখার, র‍্যোম জাতীয় ঐতিহ্যহীন অশিক্ষিত নিষ্ঠুর, জেল নীতিতে অনভ্যস্ত শত্রুর প্রতি নৃশংস সাক্ষাৎ খাণ্ডার। তাহারা মোলায়েম নিয়মে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বন করিতে পারে ইংরেজের তো সে 'হক্' নাই।

ক্লাইভ ভারতীয়দের কোন বেকায়দায় শায়েস্তা করিতেন জানি না কিন্তু তাহার পর তো দুই শত বৎসর কাটিয়াছে। এতদিনে তো সে দুরন্তপনা চলিয়া যাইবার কথা। যদিও নেহরুজি বলিয়াছেন যে, এদেশের আইসিএস আপিসাররা অপদার্থ তবু তো স্বীকার করিতে হয় ইঁহাদের অনেকেই অতি ভদ্র ঘরের ছেলে, বেশির ভাগই ইংলন্ডের সর্বোত্তম বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলিয়াই জানি, নাৎসি বড়কর্তাদের ন্যায় নীচ তাড়িখানায় মাতলামি করেন না, র‍্যোম জাতীয় জঘন্য অনৈসর্গিক লিপ্সা ইঁহাদের আছে একথা কখনও শুনি নাই।

কাজেই তাঁহাদের ব্যবহারের সমালোচনা আমরা করি। তাঁহাদের হুকুমে চিমটিটি কাটা হইলে সে বেলজেনের মুষল অপেক্ষাও নিন্দনীয়।

বাঙলার লাট দুনিয়ার নামকরা রাজনৈতিক, ভারতের বড়লাট বড় বড় লড়াই করিয়া নাম করিয়াছেন— হারাজেতার কথা সবসময় উঠে না— ইঁহাদের 'বিশ্বরূপ' আছে। ইঁহাদের আমলে জেলে ক্ষুদ্রতম অন্যায় হইলেই ইঁহাদের বিশ্বমূর্তির মৃত্তিকা পদযুগ বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের ইচ্ছা ইঁহাদের বিশ্বরূপ যেন অটুট থাকে, ভারতের জেলে যেন রাজনৈতিক বন্দি না থাকে। তাঁহারা সেই মহৎ কার্যটি তো অনায়াসেই করিতে পারেন।

www.pathagar.com

(২) ক-ক'র বহু বন্দি নাৎসিদের ব্যক্তিগত শত্রু ছিল। কেহ হিটলারকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কেহ হিটলারের বন্ধু হর্স্ট বেজেলকে খুন করিয়াছে, কেহ র‍্যোমকে চাবকাইয়াছে, কেহ গ্যোবেলসকে অপমান করিয়াছে। নাৎসিরা শক্তি পাইয়া যে ইহাদের হত্যা করিবে ও বহুদিন ধরিয়া জিঘাংসার আনন্দ পাইবার জন্য না মারিয়া অত্যাচার করিবে, ইহা তো বোঝা যায়, যদিও ক্ষমা করা যায় না।

কিন্তু এদেশের কোন রাজবন্দি কোন বড়কর্তার ব্যক্তিগত শত্রু? জেলে যাইবার পূর্বে কোন বন্দি কোন জমাদার-হাবিলদার-সুপরিন্টেন্ডেন্ট-হাকিম-লাটের ব্যক্তিগত শত্রুতা করিয়াছে? বরঞ্চ উল্টো কথাই তো শুনিয়াছি। বিপদ-আপদে এইসব সর্বত্যাগীদের নিকট হইতেই তো তাঁহারা সাহায্য পান— সরকারের লাল ফিতার কালা অনাচারের প্রতিবাদ করিতে হইলে তো গোপনে ইঁহাদের দ্বারস্থ হন; কৌন্সিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করান, খবরের কাগজে দুর্নীতি নিবারণের আন্দোলন করান ইহাদেরই দ্বারা।

(৩) হিমলার নিজে স্যাডিস্ট ছিলেন এবং যখন দেখিলেন যে সুস্থ জর্মন জেলার ওয়ার্ডাররা বন্দিদিগকে অমানুষিক অত্যাচার করিতে রাজি হয় না তখন তিনি সমস্ত জর্মনি হইতে বাছিয়া বাছিয়া একদল স্যাডিস্ট সংগ্রহ করেন এবং তাহারাই ক-ক-গুলিতে পাশবিক অত্যাচার করিয়া অনৈসর্গিক আনন্দ লাভ করিত।

ইংরাজ সরকার স্যাডিস্ট বাছাই করেন এ অভিযোগ কখনও শুনি নাই। গণ্ডমূর্খ বাছাই করার নীতি কোথাও কোথাও আছে শুনিয়াছি।

সর্বশেষে সর্বাধিক মারাত্মক পার্থক্যটি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

(৪) নাৎসিরা হৃদয়মন দিয়া বিশ্বাস করিত যে, তাহারা দেশের দশের তথা বিশ্বজনের 'মঙ্গলার্থে' নাৎসি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে ও সেই 'পুণ্য প্রচেষ্টা'য় অগ্রসর হইতেছে। যাঁহারা তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের বেশির ভাগই কম্যুনিস্ট। আদর্শে আদর্শে সেখানে লাগিল নিদারুণ দ্বন্দ্ব। যে জিতিল সে অন্যকে 'দেশদ্রোহী' 'সমাজদ্রোহী' ও 'বিশ্বদ্রোহী' হিসাবে চরম শাস্তি দিল।

কিন্তু ভারতে তো তাহা নহে। সদাশয় সরকার যে সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে সদম্ভে বলিয়াছেন 'ভারতবর্ষে চরম আদর্শ স্বরাজ লাভ' তাহা আমাদের স্মরণ নাই। তদবধি মহামান্য সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া লাট-বেলাট সকলেই সেই কথাটি বারবার বলিয়াছেন।

দমদম-আলিপুরের বন্দিরাও ওই আদর্শেই বিশ্বাস করেন। আদর্শে আদর্শে এখানে কোনও দ্বন্দ্ব নাই। তফাতের মধ্যে এই যে, সদাশয় সরকার স্বরাজ দিবার শুভ দিনটি কত হাজার বৎসর পরে কোন প্রলয়রাত্রির পূর্বমুহূর্তে ছাড়িবেন তাহা বলেন নাই, বলিবার বাসনাও রাখেন না। ভাবটা এই 'সবুরে মেওয়া ফলে'। দেশসেবকেরা বলেন, 'মেওয়া ফলিয়ে যে পচিবার উপক্রম করিল। দুর্ভিক্ষে পচিতেছে, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পচিতেছে, রোগ-মহামারীতে পচিতেছে, নৈরাশ্য-হাহাকারে পচিতেছে। আর কত অপেক্ষা করিব?'

অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'timing' বাঙলাতে যাহাকে বলি 'লগ্ন' সেই লইয়াই তফাৎ। এবং এই সামান্য তফাতের জন্য এত লাহোর, এত লালকেল্লা? ইংরেজরা তো খ্রিস্টান। প্রভু যিশু বলিয়াছেন, 'হে ভগবান অদ্যকার রুটি অদ্যই দাও।' আরও বলিয়াছেন,

www.pathagar.com

'কল্যকার ভাবনা আজ ভাবিও না', অর্থাৎ অদ্যকার কর্তব্য আজই সমাপ্ত কর। আমরা নেটিভরা সংস্কৃতে বলি 'শুভস্য শীঘ্রং, আরবিতে বলি 'অল-ইন্তিজারু আশাদ্দু মিনাল মওত' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করা মৃত্যুযন্ত্রণার অপেক্ষাও পীড়াদায়ক।'

সর্বজনকাম্য মঙ্গলদায়ক স্বরাজ লাভের জন্য যাঁহারা কিঞ্চিৎ 'অসহিষ্ণু' তাঁহাদের জন্য শাস্তি!

নিন্দুকে বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে আছে উদর পূর্তির জন্য। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সে তো আরও নিদারুণ। তাহারা অর্থ তো এই দাঁড়াইবে যে, স্বাধীনতাকামীরা নিঃস্বার্থভাবে যে পুণ্যকর্ম করিতেছেন, স্বার্থান্বেষীরা তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহা হইলে তো সেই বাধা দানের প্রতীক আলিপুর, দমদমা নির্মাণ করাই পাপ। সেখানে কী 'শাস্তি' দেওয়া হইতেছে না হইতেছে তাহার আলোচনা তো অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়— বেলজেনের সঙ্গে তুলনা কোথায়?

হিটলার কখনও কোনও ক-ক হইতে কাহাকেও খালাস করিয়া মিত্রভরে আহ্বান করিয়া বলেন নাই 'আইস, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করি।' কারণ নাৎসিদের হিসাবে তাহারা দেশদ্রোহী কুষ্ঠরোগী।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৯.১১.১৯৪৫

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য লইয়া সদাশয় সরকার সমূহ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। বিপদে পড়িলে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় ও তখন রাগের বশে হাঙ্গামহুজ্জৎ করে ও যত্রতত্র কটুবাক্য নিক্ষেপে লিপ্ত হয়। বেভিন-ভিশিনস্কিতে যে বাক্যালাপ হইল তাহার ভাষাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ রস-সম্পর্কের আত্মীয়তাবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই মুক্ত মৎস্যহট্টে সে ভাষা জয়ধ্বনি লাভ করিবে।

সরকারের উষ্মার কারণ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত। ১৯১৯ সনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরকার দেখেন, তখন যুদ্ধের রক্তক্ষয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভু জিহোভা তাহাকে ইরান দিয়াছিলেন, ইরাক দিয়াছিলেন, হিজাজ দিয়াছিলেন, ট্র্যান্সজর্ডন দিয়াছিলেন, প্যালেস্টাইন দিয়াছিলেন, এমনকি তাবৎ মিশরদেশ এবং সুদান দিয়াছিলেন, ইস্তেক বসফরস-দার্দানেলেজসহ তুর্কি দিয়াছিলেন। একমাত্র সিরিয়া-লেবাননে ফরাসি ঈষৎ নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা কর্তন করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না।

অর্থাৎ তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকারের হাতে, খানিকটা সরকারি খানিকটা বেসরকারিভাবে। এবং এই মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের ফরফরদালালি খবরদারি সরদারি মৌজুদ ছিল বলিয়াই রমেলকে হারানো সম্ভবপর হইল, অতিকষ্টে সরকার মহতী বিনষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

www.pathagar.com

১৯৪৫-৪৬ অবস্থা ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফরাসি সম্পূর্ণ ঘায়েল। সে জখমি কুকুরের ন্যায় দেশের ক্ষতস্থল লেহন করিতেছে, মধ্যপ্রাচ্যের শিকার তাড়না করিবার মতো উৎসাহ ও শক্তি তাহার আদপেই নাই। প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনকয়েক পূর্বে সিরিয়া যখন ফরাসিকে তম্বি করিয়া বলিল, 'কুইট সিরিয়া' তখন তাহাকে কর্ণ মর্দন করিবার মতো 'বাঘা, ক্লেমাসোঁ আর নাই, মেরা ভেদো বিদো (ফরাসি পররাষ্ট্র সচিব Bidault) সকরুণ কণ্ঠে কহিলেন, 'ইংরাজ সরকার সিরিয়া সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, আম্মো তাহাই করিব।' অর্থাৎ জ্ঞানদাসী ভাষায় বলিলেন, 'বধূ, তোমার গরবে গরবিনী হম, ভীতুয়া তোমার ভয়ে।'

কিন্তু হায়, এই নশ্বর সংসারে অবিমিশ্র আনন্দ কোথায়? ফরাসি নাই, জর্মন নাই; তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য সরকার পুরষ্ট পাঁঠার ন্যায় ঘোঁতঘোঁত করিয়া বেড়াইতেছেন, চণ্ডীমণ্ডপের ভয় নাই, তথাপি প্রশ্ন যদিস্যাৎ বিপদ উপস্থিত হয় তবে ত্রাণ করিবে কে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে—

একা ঘরে বউ হয়ে খেতে বড় সুখ,
মারের বেলায় ধরবে কে, ওই বড় দুখ।

অর্থাৎ যে বাড়িতে শাশুড়ি নাই, ননদী নাই, জা নাই সে বাড়িতে একা বউ নিত্য নিত্য নতুন রান্না করে, স্বামীকে খাওয়ায়, নিজে মনের সুখে খায়, কিন্তু বিপদ কিল মারার গোসাঁই যখন কাঁঠাল পাকানো আরম্ভ করেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবার মতো কেহই থাকে না। কাজেই বিচক্ষণা বউ একটি যত অপ্রিয়ই হউক না কেন বিধবা-সধবা জা ননদীর সন্ধানে থাকে।

সদাশয় সরকার অধুনা সেই সন্ধানে আছেন। কারণ ইরান হইতে লিবিয়া পর্যন্ত সরকার যত ঘোঁতঘোঁতই করুন না কেন, কিল মারার গোসাঁই রাশিয়া দরজার কাছে বসিয়া কখন যে কী করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে? ফরাসি নাই, জর্মনি নাই, ইটালি নাই, এমনকি জাপানও নাই। অন্যকে দিয়া লড়ানোর কায়দা সরকার এত যুগ ধরিয়া রপ্ত করিয়াছেন; অন্য সবই লড়িয়া লড়িয়া প্রাণ দিয়াছে। তবে কি আখেরে সরকারকেই লড়িতে হইবে? সে যে অভূতপূর্ব অচিন্তনীয়।

তবে ভয় নাই, বোকা মার্কিন রহিয়াছে। জর্মনিকে শেষ পর্যন্ত সে-ই শায়েস্তা করিয়াছে। রুশকেও কেনই বা সে-ই শায়েস্তা করিবে না?

উপস্থিত তাহাকে প্যালেস্টাইনের ফাঁদে বাঁধা হইয়াছে।

প্যালেস্টাইনের জমিজমার উপর সদাশয় সরকারের কোনও লোভ নাই একথা তাহার পরম শত্রুও স্বীকার করিবে। সেখানে তেল নাই, লোহা নাই, কয়লা নাই, কিছুই নাই যাহার উপর লোভ করা যাইতে পারে। যাহাও বা সামান্য কিছু আছে, যথা লবণ সমুদ্র হইতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী তাহাও ইহুদিরা এমন দাম দিয়া কিনিতে প্রস্তুত যে, সুচতুর ইংরাজ কারবারি সে দাম দিতে রাজি হইবে না। কাজেই প্যালেস্টাইনে ইংরাজের স্বার্থ সেখানে সমর, নৌ ও বিমানঘাঁটি নির্মাণ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য হাতের কব্জায় রাখা। এবং প্যালেস্টাইনে যদি মহাপ্রলয় পর্যন্ত সরকারের থাকার বাসনা থাকে, তবে সে দেশ আরব বা ইহুদি কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অতএব সেখানে সেই সনাতন অথচ চিরনবীন পন্থা, ভাগ করিয়া রাজত্ব করো, চালাইতে হইবে। সেই দ্বি-ধা করণ উচাটনমন্ত্র জপিয়া

www.pathagar.com

জপিয়া সরকার পুনরায় প্যালেস্টাইনকে পাকিস্তান-ইহুদিস্থান রূপে দ্বি-ধা করিতে চাহিয়াছেন— ১৯৩৮ সালে প্রথম এই প্রস্তাবটি করা হয়, তখন ইহুদি-আরব দুই দলই হুঙ্কার দিয়া তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিল। এখনও করিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই নীতি ইংরেজ একা চালাইতে পারিবে না বলিয়া দোসর খুঁজিতেছিল। মূর্খ মার্কিন ধরা দিয়াছে। আমেরিকার বহু ধনপতি ইহুদি, তাহারা বস্তা বস্তা ইহুদি প্যালেস্টাইনে চালান করিতে বসে— এদিকে সদাশয় সরকার আরবকে কথা দিয়াছিলেন যে, আর ইহুদি আমদানি করা হইবে না। কাজেই সরকার মার্কিন ইহুদি ধনপতিদিগকে বলিলেন, ১৫০০ ইহুদি প্রতি মাসে প্যালেস্টাইন চালান করিতে দিব কিন্তু আরব আপত্তি করিলে— এবং আরব অতি অবশ্য করিবে— সে ঠেলা তোমাদিগকে সামলাইতে হইবে। ইহুদি ধনপতি তৎক্ষণাৎ রাজি হইল— যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় তাহার বিস্তর টমিগান, মেসিনগান বেকার পড়িয়া আছে। সেইসব মাল গোপনে ও ইহুদি মাল প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইনে চালান করিতেছে— আরবের নাকের ডগার উপর দিয়া। আরব আপত্তি করিলে ইহুদিরা ওইসব বন্দুক কামান দিয়া আরবকে নির্বংশ করিবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম কৌন্সিলে বসিয়া ইহুদিগের সুরাহার তদারকি করিতেছে। মার্কিন ইহুদি খুশি, এখতেয়ার চালাইতে পারিয়া— ইংরেজ খুশি মার্কিনকে অক্টোপাশের পাশে জড়াইতে পারিয়া।

এতদিন মার্কিন ইংরেজের হইয়া লড়িত, এখন ইংরেজের হইয়া নোংরা পলিটিক্সও করিবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক মার্কিন কুসংসর্গে পড়িয়া নিরীহ আরবকে ধর্ষণ করিবে। মূর্খের ইহাই পরম গতি।

এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিকাংশ এককালে তুর্কির সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৯১৮-এর যুদ্ধের পর সুলতানের প্রায় সকল ক্ষমতা যায়— ক্রুসেডের আমল হইতে খ্রিস্টশক্তিবর্গ সুলতানকে হৃতবল ও হৃতসর্বস্ব করিবার যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল, তাহা ১৯১৮-এ সফল হয়। সুলতানের তখন এমন অবস্থা যে খাস তুর্কিতেও তাঁহার স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে।

তা পাউক। কিন্তু যেসব ভূখণ্ড সুলতানের হাতছাড়া হইল সেগুলি স্বরাজ পাইল না। ইংরেজ ও ফরাসিতে মিলিয়া আরবদিগকে এমনি নির্মম শোষণ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের মোহমুক্ত হইতে বেশিদিন লাগিল না। সুলতানের কড়াইসিদ্ধ হইতে লাফ দিয়া বাঁচিতে গিয়া আরব যে ইংরেজ-ফরাসির নগ্ন অগ্নিতে পড়িয়াছে, সেকথা বুঝিতে পারিল।

তখন সর্বত্র সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মিশরের প্রাতঃস্মরণীয়— সর্বস্বাধীনতাকামীর প্রাতঃসন্ধ্যাস্মরণীয়— সা'দ জগলুল পাশা তখন মিশরের জন্য যে সংগ্রাম করিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্যালেস্টাইনে মহামুফতি সেই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন; আজ তিনি গৃহহারা দেশত্যাগী।

নজদের ইবনে সাউদ মক্কা হইতে ইংরেজের ক্রীড়নক শেরিফকে তাড়াইয়া পূর্ণ হিজাজের স্বাধীনতা অর্জন করিলেন। ইবনে সাউদ আজ পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। শুধু শক্তিমান নহেন, ন্যায় ও ধর্মাচরণে দেশের দশের মঙ্গলসাধন কর্মে তিনি লিপ্ত।

এইসব বিভিন্ন ভূখণ্ডের আরবেরা ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। প্যালেস্টাইনের আরব এই কথা বলে না যে, সে সিরিয়ার আরব হইতে ভিন্ন। এবং একথাও

www.pathagar.com

বুঝিয়াছে যে ইরাক, মিশর, সিরিয়া যদি পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীনতা অর্জনে লিপ্ত হয় তবে ইংরেজ-ফরাসি সেই সনাতন 'দ্বি-ধা করিয়া পরাধীন রাখো' বা 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি বলবৎ রাখিবে। একথা, এ নীতি সর্বাপেক্ষা অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইবনে সাউদ।

সমস্ত আরবকে কী করিয়া এক পতাকার নিচে সম্মিলিত করিয়া খ্রিস্ট-শোষক-নীতি নির্মূল করা যায় তাহার সাধনা ইবনে সাউদ গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন।

হয়তো আজ সে সুদিন আসিয়াছে।

খবর আসিয়াছে, ইবনে সাউদ মিশরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামানলে মধ্যপ্রাচ্য শীঘ্রই উদ্দীপ্ত হইবে, তাহাতে প্রধান কর্মকর্তা হইবেন ইবনে সাউদ। মিশর হিজাজ-নজদ অপেক্ষা অনেক 'সভ্য' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় কায়দাকানুনে পরিপক্ব তাই হিজাজ-নজদের আরবের ধমনিতে যে উষ্ণ স্বাধীন রক্ত প্রবাহিত তাহার সঙ্গে মিশরি রক্তের তুলনা হয় না। তাই হিজাজি আরব সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত আরবশক্তি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিবে তখন যেন ভারতবর্ষও তাহার সুবর্ণ সুযোগ না হারায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৩.২.১৯৪৬

মিশর

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি কী দুর্দান্ত হৃদয়হীনরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিশর দেশ। সে সাম্রাজ্যনীতি ইংলন্ডে কে রাজত্ব করিতেছে তাহার উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না; শ্রমিক দলই হউন আর রক্ষণশীল দলই হউন মিশর সম্বন্ধে কূটনীতি কখনও পরিবর্তিত হয় না। সে নীতি দ্বি-ধা করিয়া সিধা রাখো নহে, কারণ সাম্রাজ্যবাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত মিশরে দ্বিখণ্ডিত করিবার মতো দুই বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায় নাই। মিশরের প্রাচীনতম অধিবাসীরা 'কপ্ট'। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া করিয়া সর্বশেষে খ্রিস্টান হয় এবং আরব অভিযানের পর ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান হইয়া যায়। মুষ্টিমেয় যে কতিপয় খ্রিস্টান 'কপ্ট' এখন মিশরে আছে, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক আরক খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিবার চেষ্টা যে কখনও করা হয় নাই এমন নহে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় সাদ জগলুল পাশার বদান্যতা সাম্রাজ্যনীতির ক্ষুদ্র প্রলোভনকে পরাজিত করে ও 'কপ্ট'রা অল্পদিনের মধ্যেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে, তাহাদের চরমস্বার্থ কাহার উপরে নির্ভর করিলে সুরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা বেশি। ইদানীং মিশরে যে ব্যাপক আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে 'কপ্ট'রা হয় যোগদান করে, না হয় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ইহকাল পরকাল বিনষ্ট করিতে সম্মত হয় না। মিশরের অন্যতম প্রধান নেতা,

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে তাবত মিশরীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ মুকরিম পাশা আবিদ খ্রিস্টান 'কপ্ট'। ব্যক্তিগত কারণে ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তফা নহ্হাজ পাশার সঙ্গে তাঁহার কখনও কখনও মনোমালিন্য হইয়াছে ও তিনি ওয়াফদ-বিরুদ্ধ মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করিয়াছেনও বটে, কিন্তু দেশের অনিষ্টকারী কোনও দলের সঙ্গে যোগদান করিয়া তিনি কখনও স্বধর্মাবলম্বীদিগের জন্য অন্যায় পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই।

মিশর সম্বন্ধে তাই সরকারের চিরন্তন নীতি— যত কম পারো দাও, যতদিন পারো ঠেকাইয়া রাখো। দ্বিতীয়ত, দেশ চুপচাপ থাকিলে কোনও নতুন সন্ধি-শর্তের আলোচনা আদপেই করিবে না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিংস্র, অহিংস কোনও আন্দোলন হইলেই বলিবে— আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া কিছুই হইবে না, প্রথম আন্দোলন থামাও, তার পর সন্ধি-শর্ত লইয়া আলোচনা হইবে। গত সপ্তাহে মিশরে যে হানাহানি হইয়া গেল, তাহার উত্তরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, উই শান্ট বি ইন্টিমিডেটেড। এ নীতি কিছু নবীন নহে। আমরাও বলি, বর্ষাকালে ছাত মেরামত করিবার উপায় নাই, কারণ বৃষ্টিপাত হইতেছে, শীতকালে করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বৃষ্টি কোথায়?

কিন্তু মিশরিরা আমাদের মতো সহিষ্ণু নহে। ১৯১৯ সাল হইতে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরাধীনতা হইতে ১৯৩৯ সালে অভ্যন্তরীণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মিশর কখনও পায় নাই ও আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ অধ্যুষিত কোনও অঞ্চলই সম্পূর্ণ স্বরাজ পাইবে না।

মিশরের সম্পূর্ণ স্বরাজ পাওয়ার পথে অন্তরায় মিশরস্থিত ইংরেজবাহিনী। সুদ্ধ মিশরি বাহিনী একটি আছে বটে ও একদিন তাহাদের শোভাযাত্রা দেখিবার সুযোগও আমার হইয়াছিল। বন্দুক-কামান দেখিয়া এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলি কি নেপোলিয়ন এদেশে ফেলিয়া গিয়াছিলেন?' উত্তরে নাগরিক করুণ কণ্ঠে বলিল, 'সে সৌভাগ্য কোথায়? এগুলি ১৯১৮-এর যুদ্ধের বরবাদ জঞ্জাল। ইংরেজের কাছ হইতে হীরার মূল্যে কেনা। এগুলি কখনও কোনও কাজে লাগিবে না। কিন্তু বন্দুক-কামান ছাড়া সৈন্যবাহিনী নিতান্ত হয় না বলিয়াই ক্রয় করা হইয়াছে।'

১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশরস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া মিশরের রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। ওয়াফদ দল যখনই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ স্বরাজের পথে দেশকে অগ্রগামী করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই রাজার উপর চাপ পড়িয়াছে ওয়াফদকে বিতাড়িত করিবার। সে চাপ উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই কারণ তাঁহার সেনাসামন্ত কোথায়? অত্যধিক দৃঢ়গ্রীব হইলে সিংহাসনচ্যুত হইতে কতক্ষণ? সাম্রাজ্যবাদের দুর্বিষহ তাড়নার ফলে রাজা পুনঃপুনঃ দেশের জনমত পদদলিত করিয়া ওয়াফদ দলকে বিতাড়িত করিয়া কখনও ইসমাইল স্বিদকীপাশাকে 'চোটা মুসোলিনি'— তখনও হিটলার সর্বাধিকারী হন নাই— রূপে দেশ শাসন করিতে দিয়াছেন; যখনো ইয়াহ্ইয়া পাশার মতো নপুংসককে প্রধানমন্ত্রী করিয়া দেখিয়াছেন, দিনের পর দিন মন্ত্রণা সভায় তিনি ওয়াফদ কর্তৃক কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলির উভয়কর্ণকর্তিত নির্লজ্জতা শুধু এদেশে নহে, মিশরে ও অন্য সর্বপরাধীন দেশে দুর্গন্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বাতে স্ফীত বেলুনের

www.pathagar.com

ন্যায়, উড্ডীয়মান হয়। দেশের লোক তাজ্জব মানিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া নানাবর্ণের সেই বেলুনের খেলা দেখে; জানে, সূত্র কাহার হস্তে এবং ইহাও জানে, সাম্রাজ্যবাদের পতন হইলে পর এগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য সূচ্যগ্রই যথেষ্ট।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি— মিশরিরা অসহিষ্ণু। কোন মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্তে স্বরাজ সপ্রকাশ হইবেন, সে আশায় বসিয়া থাকিতে জানে না। কাজেই যখনই কোনও নপুংসক বা চোটা মুসসোলিনি জনমত উপেক্ষা করিয়া রাজ্যচালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই তাহারা ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছে; গত সপ্তাহে যাহা করিয়াছে তাহা যে কতবার করা হইয়াছে তাহার হিসাব রাখিতেও মিশরিরা ভুলিয়া গিয়াছে।

১৯৩৯ পর্যন্ত এই লীলা চলিয়াছিল। যুদ্ধ লাগার অল্প কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ দেখিল যে, মিশরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত না করিলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। ওয়াফদ দল ইংরেজকে সেই সঙ্কটের সময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু দেশের সর্বস্ব বিনাশ করিয়া নহে। কে জানে, বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের ন্যায় সেখানে কোনও অঘটন ঘটনের প্রয়াস চলিতেছিল কি না— কারণ, জাপানের ইম্ফল আগমন ও রমেলের অল-অলামেন গমন তো একই রোগ— বৈদ্যরাজ যখন একই তখন ঔষধও একই হইবে না কেন? সে যাহাই হউক, ওয়াফদ সরিয়া দাঁড়াইল, আকাশে দেখা দিলেন দুর্গন্ধবাতপূর্ণ বেলুন, আলি মেহের পাশাই প্রধানমন্ত্রীরূপে। তৃতীয়বার বলি, মিশরি অসহিষ্ণু। আততায়ীর হস্তে আলি মেহের প্রাণ হারাইলেন। তখন আসিলেন নুক্রাশি পাশা। ইতোমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মিশরিরা দেখিল, বহু কষ্টে, বহু রক্তপাতে অর্জিত তাহাদের অভ্যন্তরীণ আংশিক স্বাধীনতা যুদ্ধের হট্টগোলের ভিতর হারাইয়া ফেলিয়াছে। সন ১৯১৯-এ ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত রাত প্রাণপণ নৌকা বাহিয়া সূর্যোদয়ের সময় দেখে— নৌকা বাড়ির ঘাটে।

চতুর্দিকে কচুরিপানা। মিশরি মরিয়া হইয়া সেই পানা কাটিতে উদ্যত। পানা বলে— মধ্যপ্রাচ্যের জল শীতল রাখিবার জন্য বিশ্বশান্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে আমরা আছি। মিশরিরা বলে তাহা হইলে সুয়েজখালের ওই পারে প্যালেস্টাইনে গিয়া থাকিলেই পার।

ইহার সদুত্তর-অসদুত্তর সরকার কিছুই দেন নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.৩.১৯৪৬

যবনিকান্তরালে

ফরাসি বইয়ের দোকান থেকে যে কেতাবখানা কিনেছিলাম, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এরকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম সে কথাটা মনে পড়েছে। কারবারে আদালতে হরবকতই ওয়াদা-খেলাফ করা হয়, আইন-আদালত ব্যবসায়ী-কারবারি তার জন্য প্রস্তুতও থাকেন কিন্তু খোসগল্পের বাজারে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে মকমল ডিক্রি কবুল করে নেওয়া। কিন্তি রদবদলের কথা তুললেই সবাই চেঁচিয়ে বলে, 'দেউলে হওয়ার নোটিশ দাও, বুরুজ হয়ে গেছ মেনে নাও।'

www.pathagar.com

করি কী? কারণ কেতাবখানা ভালো না। অর্থাৎ আমার মতের সঙ্গে কেতাবখানা সায় দেয়নি। নিরপেক্ষ পাঠক হুঙ্কার ছেড়ে বলবেন, 'অবাক করলে! তোমার মতের সঙ্গে কেতাবখানার মত মিলল না বলেই কেতাবখানা খারাপ? এ তো বড় তাজ্জব কি বাৎ।'

নিবেদন করছি। আমি আপনারই মতো ভারতীয়। সন ২৯-এ যখন জর্মনি যাই তখন হিটলার জর্মনিতে কল্কি, কিন্তু পেয়েছেন বটে বসবার জন্য ইঁট পাননি। ১৯৩৮-এ যখন শেষবারের মতো জর্মনি ছাড়ি তখন স্বয়ং চেম্বরলিন জর্মনিতে উড়োউড়ি করছেন হিটলারের মন পাবার জন্য। কাজেই হিটলার সম্বন্ধে আমার দু চারটে তথ্য জানার কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়তো আরও বললেন, 'ফরাসি গ্রন্থকার তোমার চেয়েও ঢের বেশি জানে।'

কবুল। কিন্তু হিটলার বাবদে ফরাসি গ্রন্থকারের চেয়ে আপনার-আমার মতো ভারতীয়দের নিরপেক্ষ থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ ফ্রান্স আমাদের জানের দুশমন নয়, জর্মনি আমাদের দিলের দোস্তও নয়। ফ্রান্স-জর্মনি দুই-ই আমাদের কাছে বরাবর— এবং এ সম্বন্ধে এন্টনি ফিরিঙ্গি যে মোক্ষম তর্জাখানা ঝেড়েছেন সেটি অশ্লীল বটে, কিন্তু এমন তাগসই আপ্তবাক্য আর কেউ কখনও শোনাতে পারেননি!

থাক সে কথা।

কেতাবখানার নাম 'লে সেক্রে দ্য লা গের' (Les Secrets de la Guerre) অর্থাৎ যুদ্ধের খবর। গোপন গ্রন্থকারের নাম রেমো কার্তিয়ে। সায়েব বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে এ কেতাবখানা তৈরি করেছেন। বইখানার ষাটের সংস্করণ আমার হাতে পড়েছে। ছাপা ১৯৪৬ সনে। তাই বিবেচনা করি আরও অনেক সংস্করণ ইতোমধ্যে হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থকার আরও বিস্তরে বিস্তর কেতাব পয়দা করেছেন। তার মধ্যে নাম করা চার্চিল, রজোভেল্ট এবং পিটার দি গ্রেটের জীবনী।

তা হলে কোন সাহসে এ গুণীর সঙ্গে কাজিয়া করি? তবে সায়েবদের প্রবাদেই রয়েছে 'Fools rushing where angels fear to tread' অর্থাৎ 'বামুন যেথা ঢুকতে নারে, চাঁড়াল সেথা লম্ফ মারে।' ষাট হাজারি বাজারে গুণীজন ঢুকতে ভয় পেতে পারেন, আমার কী পরোয়া!

মসিয়ো কার্তিয়ের সঙ্গে আমার প্রথম এবং প্রধান ঝগড়া যে তিনি কোনও জায়গায় রুশের কথা তোলেননি। মসিয়ো গোটা লড়াইটার দোষ একমাত্র হিটলারের কাঁধেই চাপাতে চান। রুশ শেষ মুহূর্তে যদি জর্মনির সঙ্গে সন্ধি না করত তবে যে হিটলার কস্মিনকালেও পোলান্ড আক্রমণ করবার হিম্মৎ যোগাড় করতে পারতেন না সে কথাটা কার্তিয়ে সায়েব কর্তন করে গিয়েছেন। হয়তো উত্তরে মসিয়ো বলবেন, রুশ এ যুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী সে কথাটা যেসব দলিলদস্তাবেজে স্বপ্রমাণ হয়, সেগুলো ন্যুরনবের্গে পেশ করা হয়নি।

কথাটা ঠিক। গোড়ায় গলদ এখানটায়ই যেহেতুক রুশ (এবং মিত্র পক্ষ) ফরিয়াদি তাই রুশের বিরুদ্ধে যেসব দলিল-দস্তাবেজ অকাট্য সাক্ষ্য দেবে সেগুলো চেপে রাখা হয়েছে। তাই যদি হয় তবে হিটলার তথা জর্মনপক্ষের পুরা তসবির ফুটবে কী প্রকারে?

কিন্তু এ গোড়ার গলদের গোড়ায়ও আরেকটা গলদ রয়েছে। সেটাও ন্যুরনবের্গ এবং কাজে কাজেই মসিয়ো চেপে গেছেন। হিটলারের সঙ্গে রুশের মিতালি হওয়ার পূর্বে এই হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে লাই দিয়ে আসমানে চড়াল কে?

www.pathagar.com

ইংরেজ। ১৯৩০-৩২-এ জর্মনির প্রধানমন্ত্রী ব্রুনিঙ যখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে জিনিভা-লন্ডনে মাকু চালাচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ হাত গুটিয়ে বসে ছিল। ব্রুনিঙ কান্নাকাটি করে ইংরেজকে বহুবার বলেছিলেন, 'জর্মনির এ দুর্দিনে যদি তোমরা দু মুঠো ময়দা দিয়ে সাহায্য না কর, তবে আমাদের সোস্যালিস্ট সরকার টিকতে পারবে না। ফলে হিটলার আর তাঁর কট্টর ন্যাশনালিস্ট দলের হাতে গোটা দেশটা চলে যাবে। আর তারা যে শান্তি চায় না, চায় যুদ্ধ, সেকথা তারা লুকিয়ে রাখেনি, তোমরাও বিলক্ষণ জানো। বিশ্বশান্তি যদি চাও, তবে উপস্থিত জর্মনকে বাঁচানোই তোমাদের প্রধান কর্তব্য।'

ইংরেজ তখন কানে তুলো দিয়ে বসে ছিল। তার কারণ, ইংরেজ তখন মনে মনে অন্য প্যাঁচ কষছে। ইংরেজের সে প্যাঁচের পিছনে যুক্তি ছিল এই— ব্রুনিঙের সমাজতন্ত্রী দলকে দানাপানি দিয়ে তাগড়া করে কোনও লাভ নেই। ইংরেজ-রুশে যদি কোনওদিন লড়াই লাগে তবে সমাজতন্ত্রী জর্মনি পত্রপাঠ রুশের সঙ্গে যোগ দেবে। অথচ ইংরেজের প্রধান উদ্দেশ্য রুশকে বিনাশ করা। তাই ইংরেজের উচিত ব্রুনিঙ আর সমাজতন্ত্রী দলকে গদি থেকে সরিয়ে এমন এক খাণ্ডারকে বসানো, যে ব্যক্তি রুশের নাম শুনলেই মারমুখো হয়ে ওঠে। 'মাইন কাম্পফে' হিটলার অন্তত সাতান্ন বার বলেছে, মোকা পেলে সে রুশকে তুলোধুনো করে ছাড়বে। অতএব 'হাইল হিটলার' আর ব্রুনিঙকো কান পকড়কে নিকাল দো।

এই যুক্তির জোরেই ইংরেজ জর্মনিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দিল না। হিটলার শক্তি পেলেন। জর্মনি কট্টর ন্যাশনালিস্ট এবং রুশদ্রোহী হয়ে উঠল। ইংরেজ ড্যাম গ্ল্যাড।

তার পর ইংরেজ হিটলারকে দানাপানি দিতে আরম্ভ করল। হিটলার যখন রাইনল্যান্ডে সৈন্য পাঠালেন তখন হুকুম দিয়েছিলেন যে যদি ইংরেজ বা ফরাসি তখন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে, তবে পিছু হটে বার্লিনে ফিরে আসবে— কারণ জর্মন বাহিনী তখনও যথেষ্ট তাগড়া হবার সুযোগ পায়নি। হিটলারের জেনারেলরা একবাক্যে বলেছিলেন, ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধ ঘোষণা করবেই করবে। হিটলার বলেছিলেন, 'করবে না' কারণ তিনি বিলক্ষণ জানতেন ইংরেজের দুষ্ট মতলব জর্মনি যা চায় তাকে তাই দেওয়া যাতে করে গাট্টাগোট্টা হয়ে একদিন রুশের মোকাবিলা করতে পারে।

এ ব্যাপারটার ইঙ্গিত ন্যুরনবের্গের দলিল-দস্তাবেজ থেকে পাওয়া গিয়েছে। মসিয়ো কার্তিয়ে সেটা চেপে যাননি।

এই হল পটভূমি।

দৈনিক বসুমতী

হিটলার মাহাত্ম্য

মসিয়ো কার্তিয়ের কেতাব 'লে সেক্রে দ্য লা-গের' (Le Secrets de la Guerre)-এর সঙ্গে আপনাদের খানিকটে পরিচয় গেল 'যবনিকান্তরালে' হয়ে গিয়েছে। সময় থাকলে তার কেতাবখানা অনুবাদ করে আপনাদের শুনিয়ে দিতুম— উপস্থিত তার থেকে মূল তথ্যগুলো নেওয়া যাক।

www.pathagar.com

একটা বিষয়ে মসিয়োর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের কী সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে তিনি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা তো রচনা করেনইনি, বরং ব্যাপারটা অনেকখানি সহানুভূতি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মসিয়োর মতে হিটলার যদিও আহার-পানাদি ব্যাপারে সংযমী ছিলেন, তবু একথা বললে ভুল হবে যে, হিটলার স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন অথবা স্ত্রী-সংসর্গ তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। হিটলারের চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন গ্যোরিঙ, কাইটেল, য়োড্‌ল্‌, র‍্যাডার, জ্যোনিৎস, জেনারেল ব্লমবের্গ, এন ব্রাউখটিশ, ফন বন্টস্টেট, হালডের, মিলঘ, পাউলুস, ফন্‌ ফাল্কেনহর্স্ট, ইত্যাদি বড় বড় জাঁদরেলরা। এঁদের সবাই যে হিটলারের ইয়ার-বক্সির দলে ছিলেন তা-ও নয়। এঁদের মত নিলে দেখা যায়, হিটলারের নারীলিপ্সা আর পাঁচজনের মতোই ছিল; কিন্তু দেশের কাজ নিয়ে অহরহ তাঁর মন এমনি মগ্ন থাকত যে, তাঁর যৌনক্ষুধা কখনও তার সম্পূর্ণ বিকাশ পায়নি।

এখানে মসিয়ো ঠিক তত্ত্বটা ধরতে পেরেছেন। হিটলার জর্মন জাতি, তার ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ সফলতাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন যে, অন্য কোনও জিনিস তাঁর মনের ভিতর ঠাঁই পেত না। আর পাঁচজন সঙ্গীসাথীর জন্য হিটলার অনেক সুখ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য তিনি কিছুই করেননি। এমনকি বেরেস্টেঘগার্ডেনে তিনি যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের জন্য কামরা আসবাবপত্র ছিল কমই। তিনি তাঁর সহকর্মীদের জন্য সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত করে রাখতেন; এমনকি যাঁরা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন স্ত্রী-পরিবারের কাছে যাবার সুবিধে পেতেন না তাঁদের পরিবারকে বেরেস্টেঘগার্ডেনে আনিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে দিতেন। হিটলারের সহচরেরা বলেন কিন্তু বেরেস্টেঘগার্ডেনের জীবনযাত্রার সঙ্গে ইভা ব্রাউনের প্রায় কোনও যোগাযোগই ছিল না। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালোবাসতেন ও অতি দৈবাৎ কেউ তাঁকে দেখতে পেত।

ইভা ব্রাউন সুন্দরী ছিলেন এবং হিটলারকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। মসিয়ো এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি; এবং না করে আমার মতে ভালোই করেছেন। ইভা ব্রাউনের জীবনকাহিনী আমি অন্যত্র পড়েছি এবং তাঁর প্রেমের কাহিনী পড়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছি। হিটলারকে তিনি তেমন করে পাননি, আর পাঁচটি মাটির গড়া তরুণী তাদের বল্লভকে যেরকমধারা পায়। এই না-পাওয়ার দুঃখ ইভা ব্রাউনকে শেষদিন পর্যন্ত কাতর করে রেখেছিল। অসাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে পারার দুঃসহ সৌভাগ্য ইভা ব্রাউন বুঝতে পেরেও কোনওদিন মেনে নিতে পারেননি।

মসিয়ো কিন্তু আরেকটি খাঁটি তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছেন।

হিটলার যখন রাইনল্যান্ডে সৈন্য পাঠান তখন তাঁর জেনারেলরা তারস্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি যখন পরপর অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন তখনও তাঁরা আপত্তি করে বলেছিলেন ইংরেজ-ফরাসি তা হলে জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, হিটলার বলেছিলেন, করবে না। তাই যখন হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করবার জন্য জেনারেলদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন তখন তাঁরা আর অতটা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করেননি, ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধ ঘোষণা করল বটে; কিন্তু হিটলারের ব্লিৎসক্রিগ বা বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধ এমনি অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সফল তা দিল যে, জেনারেলরা হতভম্ব হয়ে হিটলারের কাছে নাকে খৎ দিলেন।

এবং শুধু তাই নয়। ন্যুরনবের্গের দলিলপত্র থেকে মসিয়ো সপ্রমাণ করেছেন যে, পোলান্ড অভিযানের সমস্ত প্ল্যান করেছিলেন স্বয়ং হিটলার। হিটলার আপন জেনারেলদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন সত্য; কিন্তু গোটা যুদ্ধটা কীভাবে চালাতে হবে, কখন চালাতে হবে, কতটা ডিভিশন লাগাতে হবে, সেনাদলের কোন ভাগ কোন গতিতে কোন দিকে অগ্রসর হবে, এ সমস্ত ব্যাপার হিটলার একা বসে রাতের পর রাত খেটে খেটে তৈরি করতেন।

অথচ আশ্চর্য, হিটলার কোনওদিন কোনও মিলিটারি স্কুলে যুদ্ধবিদ্যা শেখেননি। কাউকে গুরু বলে তিনি তো স্বীকার করেনইনি, এমনকি ঝুনো জাঁদরেলদের উপদেশও তিনি অবজ্ঞা করে যেতেন।

হিটলার গুরু বেছে নিয়েছিলেন রণবিদ্যার পূর্বাচার্যগণদের ভিতর থেকে। কাইটেল বলেন, হিটলার রণবিদ্যা শিখেছেন শ্লিফেন, মল্‌টকে এবং ক্লাইজেবিৎসের কাছ থেকে। পৃথিবীর যত বড় বড় যুদ্ধাভিযান হয়ে গিয়েছে, হিটলার সবকটা অধ্যয়ন করেছিলেন বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে। বিশেষ করে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের প্রত্যেকটি অভিযানের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ফ্রান্সকে হারিয়েছেন একা হিটলার— বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, গ্রিস জয় করেছেন একা হিটলার। মস্কো, স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন একা হিটলার।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হিটলার-বৈরী মসিয়ো কার্তিয়ে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং হিটলারের সামনে মাথা নিচু করেছেন। যুদ্ধ চালনায় অনভিজ্ঞ, মিলিটারি একাডেমির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অর্বাচীন কী অলৌকিক ক্ষমতাবলে এইসব বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে সক্ষম হল? কী করে বুঝতে পারল যে, ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেন দিয়ে এমন এক অভূতপূর্ব গতিবেগ প্রবর্তন করা যায়, যার সামনে ফ্রান্স-ইংলন্ডের পূর্বার্জিত সর্ব অভিজ্ঞতা নিষ্ফল, সর্ব কলাকৌশল 'বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে'?

শেষ পর্যন্ত হিটলার পরাজিত হলেন। কেন পরাজিত হলেন তার অনুসন্ধান মসিয়ো কার্তিয়ে করেছেন। তাতে আর কিছু প্রমাণ হোক আর না হোক, অন্তত এ তত্ত্বটি সপ্রমাণ হয়নি যে স্তালিন অথবা আইজেনহাওয়ার হিটলারের চেয়ে বেশি সমরবিদ্যা জানতেন।

তাই মসিয়ো কার্তিয়ে সসম্ভ্রমে বলেন, 'এই ভয়ঙ্কর লোকটির সবকিছু হয়তো ইতিহাসের স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে; কিন্তু তিনি যেসব যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা রেখে গেলেন সেগুলো যুদ্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেইরকম মনোযোগই দিয়ে পড়বে যে মনোযোগ দিয়ে ছাত্রেরা ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের অভিযান অধ্যয়ন করে।'

এ বিষয়ে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই।

দৈনিক বসুমতী

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কেন্‌স্টাইন

যে ভূতকে মারার জন্য তামাম দুনিয়ার তাবৎ শর্ষে জড়ো করে পিষে ছাতু করে ফেলতে হল, সেই ভূতকে জ্যান্ত করবার জন্য নাকি নবীন ভগীরথ নতুন তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন।

হিটলার 'দানব' মারা গিয়েছে চার বৎসরও হয়নি— পরশুদিন এক জর্মন কাগজে পড়লুম, জেনারেল হাল্‌ডারকে বড়কর্তা বানিয়ে নতুন জার্মান চমু গড়ে তোলবার জন্য মার্কিন এবং জর্মন উজির-নাজিরের দল উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। সংবাদটা চট করে কেউ বিশ্বাস করবেন না বলে খবরের কাগজখানা সযত্নে তুলে রেখেছি। কাগজখানা অন্য আরেকটি কাজে লাগবে। যাঁরা দিশি প্রবাদ-বাক্যের ওপর নির্ভর করে এ দুনিয়ায় চলাফেরা করেন, তাঁদের সামনে সপ্রমাণ করে দেব, মাথা না থাকলেও মাথা-ধরা হতে পারে— জর্মন রাষ্ট্র নামে আজ কোনও পৃথক সত্তা নেই বটে, কিন্তু জার্মান বাহিনী তৎসত্ত্বেও গড়ে উঠতে পারে।

এই খবরের কাগজখানার রসবোধও আছে। সম্পাদক লিখেছেন, 'গ্যোবেল্‌স্ সায়েব মরার পূর্বে দু খানা বোম্বাই-সাইজ টাইম বম্ রেখে গিয়েছিলেন; তার পয়লাখানার ভিতরে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'হে জর্মনগণ, মার্কিন-ইংরেজ যে বলছে স্বাধীনতা আর সাম্য মৈত্রীর জন্য তারা লড়ছে, সেকথা আরব্যোপন্যাসের মতো অবিশ্বাস্য— তারা লড়াই জিতলে তোমরা যে "স্বাধীনতা" পাবে সে দুরাশা কোরো না।'

এ বম্‌টা ফাটল মার্কিন-ইংরেজ জর্মনি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে। " 'স্বাধীনতা' মাথায় থাকুন— অনাহারে রোগে-শোকে কত জার্মান যে এ যাবৎ মহাপ্রভুদের 'সুশাসনে' মারা গিয়েছে, তার আদম-সুমারি এখনও আরম্ভ হয়নি। গ্যোবেল্‌স্ সায়েবের দুই নম্বরের বোমাতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল 'কিন্তু জর্মনিকে বাদ দিয়ে মার্কিন-ইংরেজের চলবে না, সেকথাও বলে দিচ্ছি। রুশকে ঠেকাতে পারে ইহজগতে একমাত্র জর্মন জাতই।"

জর্মন সম্পাদক বলেছেন, 'এইবারে দুই নম্বরের বোমাখানা ফেটেছে।' যে জর্মনবাহিনীর ঠেলায় মার্কিন-ইংরেজ-রুশ মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে, সেই জর্মনবাহিনীকে ফের জ্যান্ত করবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় ভাগীরথী পশ্চিম জর্মনিতে নাবানো হচ্ছে— অর্থাৎ আমেরিকা থেকে বিস্তর খানাদানা আসছে, কলকব্জা বানাবার জন্য টাকা-পয়সা আসছে, রূঢ় কয়লার খনির আগুন যজ্ঞিবাড়ির মতো ফের অষ্টপ্রহর জ্বলতে আরম্ভ করেছে, বন্দুক-কামান বানাবার কারখানাগুলো ধ্বংস করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে মার্শাল নামক যে গৌরীসেন দুনিয়ার আর সর্বত্র কাঁচা টাকা ঢালছেন, তিনি সব বিখ্যাত 'মার্শাল প্ল্যান' জার্মানিতেও চালাতে নারাজ নন, সেকথাও বলে দিয়ে গিয়েছেন।

অর্থাৎ ভূতটা যাতে রাতারাতি দাবড়াতে আরম্ভ করতে পারে, তার জন্য রক্ত সংক্রমণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন নাগরিকের বড় দুঃখে জমানো টাকা— সবাই জানেন, মার্কিন টাকাকে রক্তের চেয়েও মূল্যবান মনে করে— ভাগীরথী বেয়ে পশ্চিম জর্মনিতে পৌঁছচ্ছে, পুষ্পকরথ চড়ে বার্লিনে ঝরে পড়ে সেখানকার মার্কিনদোস্ত জার্মানদের কানে বেটোফেনের সঙ্গীতের চেয়েও মিষ্টি ঠুংঠাং করে বাজছে।

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ জিনিসই যখন তুলনামূলক (একথাটাও 'রিলেটিভিটি' নাম দিয়ে এক জার্মানই প্রচার করে গিয়েছেন) তখন এর চেয়েও অবিশ্বাস্য আরেকখানা খবর যদি পরিবেশন করি, তবে হয়তো পাঠক উপরের খবরখানা বিশ্বাস করে ফেলবেন।

শাখ্‌টের নাম অনেকেই শুনেছেন। ইংরেজই তার হুনর-ভানুমতী দেখে তাকে wizard নাম দিয়েছে। টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কিং বাবদে হেন ফন্দিফিকির নাকি নেই, যা তাঁর কাছে অজানা— শুধু তাই নয়, এই স্বল্পপরিসর জীবনেই নাকি তিনি জার্মানের ধন-দৌলৎ দুবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। একবার ১৯২১-এ ইনফ্লেশন নামক নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, এবং দ্বিতীয়বার দেউলে জার্মানিকে হিটলারের আমলে তালেবর করে দিয়ে।

সেই শাখ্‌টের বিরুদ্ধে এখনও নানা মোকদ্দমা চলছে। অপরাধ? তিনি নাকি গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপের মতো হিটলারের নন্দী-ভৃঙ্গীর দলে ছিলেন। তা সে যাই হোক তিনি কিন্তু এ যাবৎ খালাসই হয়ে আসছেন, গোটা দুই মোকদ্দমা এখনও মুলতুবি আছে।

মোকদ্দমার ফাঁকে শাখ্‌ট সাহেব একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিষয়, মার্শাল প্ল্যান। অস্মদ্দেশীয় কোনও দেশি-বিদেশি ভাষায় সেটি অনূদিত হয়নি বলে পাঠকদের সেটি নিবেদন করছি।

শাখ্‌টের পেটে বহুৎ এলেম। তাই তাঁর ভাষা এবং বর্ণনশৈলী অতীব সরল। অতুলনীয় ভাষায় তিনি যে কটি কথা লিখেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, 'হে মার্কিনগণ, মার্শাল প্ল্যান নামক যে দলিলে তোমরা আমাদের দস্তখত চাইছ তার দাম কিছুই নেই— অর্থাৎ তোমাদের মনে যদি ক্ষীণতম আশা থাকে যে, আমরা একদিন এ প্ল্যানের ঋণ পরিশোধ করতে পারব, তবে সে আশা শিকেয় তুলে রাখ।' (এ স্থানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই যে, একদিন কাইজার যেরকম বেলজিয়ামের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে 'স্ক্র্যাপ অফ পেপার' বলেছিলেন, শাখ্‌ট্ সেই কথাই বলেছেন অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত ভাষায়) তার কারণ—

(১) ঋণশোধ করার মতো সোনা আমাদের কাছে নেই, কখনও হবে না। কাজেই সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

(২) তা হলে তোমরা টাকার বদলে চাইবে তৈরি মাল (finished goods), কিন্তু তা নিয়ে তোমাদের লাভটা কী? তোমরা সে মাল বেচবে কোথায়? আপন দেশে? কিন্তু তোমরা তো নিজেই শিল্পপ্রধান (industrial) দেশ। আমাদের মাল যদি বাজারে ছাড়ো, তবে তোমাদের শিল্প কোণঠাসা হয়ে তোমাদের শিল্পের বিনাশসাধন হবে না? (শাখ্‌ট্ বলেননি, কিন্তু আমাদের স্মরণ আছে, ইংরেজ, বিশেষ করে ফরাসি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জর্মনির কাছ থেকে এরকম ফোকটে পাওয়া মাল নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল)। তবে কি তোমরা আমেরিকার বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে আমাদের দেওয়া মাল বেচবে; তা হলে সেসব জায়গায় তো প্রথম মার্কিন মাল সরিয়ে তার পর আমাদের মাল চালাতে হবে।'

এই কথাটুকু বলে শাখ্‌ট সাদা কালিতে একটা কথা লিখেছেন— তার মর্ম আপনাদের আশীর্বাদে আমি ধরতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, 'বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি' (এইটুকু সাদা কালিতে), 'হিটলারও তো ঠিক এই সুবিধেটাই চেয়েছিল। সে-ও তো বলেছিল যে, দুনিয়ার বাজার তোমরা চেপে ধরে বসে আছ। তোমাদের সোনার ধানে সব নৌকো ভরে গিয়েছে,

www.pathagar.com

তাকে আদপেই ঠাঁই দিচ্ছ না এবং শেষটায় হিটলার বাজার পাবার আশায়ই তো তোমাদের সঙ্গে লড়ল। যে বাজার তোমরা লড়াই করে বাঁচালে, সেই বাজার তোমরা খুশ এখতেয়ারে "ফ্রি, গ্র্যাটিস অ্যান্ড ফরনাথিং" আমাদের হাতে তুলে দেবে?'

তার পর শাখ্‌ট্ কৌটিল্যের মতো একখানা মোক্ষম তত্ত্বকথা ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমেরিকার মতো শিল্পে উন্নত দেশ পয়সা যদি ধার দেয়, তবে ফেরত পাবার আশা করতে পারে একমাত্র সেসব দেশ থেকেই, যারা কাঁচামাল (raw material) বিক্রি করে। কারণ কাঁচামালের প্রয়োজন তোমাদের সবসময়ই থাকবে।'

এবং শেষ কথা বলেছেন, 'অতএব, হে মার্কিনগণ, যদি কিছু ধারফার দাও, তবে ওটা দানের মতো করেই দিও। ওর জন্য মনের কোনও কোণে মায়া রেখ না। ও পয়সা কখনওই ফেরত পাবে না।'

শাখ্‌টের লেখা এ সুসমাচার পড়ে মার্কিনরা কী বলেছেন, তার সন্ধান এখনও পাইনি।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে, খাতকের টক-কথা বরদাস্ত করে, জর্মন 'দানব' গড়ে তোলা— এত সব বয়নাক্কা কেন?

বেদনাটা কোথায়? ভয়টা কিসের?

রুশ বর্গি আসছে। বুলবুলিতে যখন সব ধান খেয়ে ফেলেনি তখন সে ধান পাঠাও বস্তা বস্তা জার্মানিতে। সেখানে জার্মান মুরগি পোষো। তার পর রুশদর্গায় জবাই কর, ফাঁড়াগর্দিশ যখন উপস্থিত হবে।

অবশ্যি জর্মনিও জানে, কার যেন ভালোবাসা, কিসের যেন মুরগি পোষা।

দৈনিক বসুমতী

মার্শাল-মার্গ

সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ভালো-মন্দ সংসারের সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় দেখা একরকম লোকের স্বভাব। এদের পিছনে রয়েছেন সাংখ্যকার— তিনি বলেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুই মূল বস্তু স্বীকার করে নিলে বাদবাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করে ফেলা যায়।

আজকের দিনে এঁরাই বলেছেন, 'সংসারে মাত্র দুটি পন্থা এখন দেখতে পাচ্ছি। তার একটা কম্যুনিজম, অন্যটি ক্যাপিটালিজম। কম্যুনিজম বলতে এখন বোঝায়, স্তালিন যে রাজ্য চালান তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে পৃথিবীর সর্বত্র সে রাজ্য বিস্তারকল্পে আপন আপন দেশে শক্ত দল গড়ে তোলা এবং তার আদর্শ হবে স্তালিনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-মজুরের বিশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর ক্যাপিটালিজম বলতে বোঝায়, আপন আপন দেশ নিজের পছন্দমতো অর্থনীতি রাজনীতি চালিয়ে আপন আদর্শের দিকে চলবে।

কম্যুনিস্টরা বলে, 'দেশে দেশে তোমরা যে জাতীয়তাবোধকে উস্কানি দিচ্ছ তার ফল কী হয় ১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫-এও কি তা দেখতে পেলে না? আর লড়াইয়েই যদি সব

www.pathagar.com

শেষ হয়ে যেত তা হলে কোনও ভাবনা ছিল না— কিন্তু আসল মারটা তো আসে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর। তখন আরম্ভ হয় অভাব-অনটন, বেকার-সমস্যা, রোগশোক, মহামারী। প্রত্যেক দেশ তখন চেষ্টা করে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য, সর্বপ্রকারের সহযোগিতা তখন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক দেশে মণ মণ ধান নষ্ট হয় খাওয়ার লোক নেই বলে, আরেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরে খাবার চাল নেই বলে।'

ক্যাপিটালিস্টরা উত্তরে বলে, 'তোমাদের "ভূস্বর্গ" রুশিয়াতে কি অভাব-অনটন নেই? রোগ-শোক-মহামারী কি সেখান থেকে লোপ পেয়েছে? বরঞ্চ শুনতে পাই, তোমাদের "ভূস্বর্গ" রুশিয়াতে গত ত্রিশ বৎসর যত লোক না খেতে পেয়ে মরেছে তার অর্ধেক লোকও আর কোথাও না খেতে পেয়ে মরেনি। কিন্তু এহো বাহ্য। আসল কথা হচ্ছে এই, তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ যে তোমাদের পন্থা ছাড়া অন্য কোনও পন্থায় সহযোগিতা সম্ভবপর নয়। তোমরা কেন ধরে নিচ্ছ, আমাদের ভিতর চিরকালই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খুনোখুনি, মারামারি চলবে?'

এইখানটায় এসে কম্যুনিস্টরা একটু বিপদে পড়েন। কম্যুনিস্টদের আপ্তবাক্য, তাদের বেদ-বাইবেল-পুরাণ হল মার্কস সায়েবের কেতাব। তাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'ক্যাপিটালিজমের আসল ধর্ম হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মাৎস্যন্যায়। যত দিন যাবে মারামারি খুনোখুনি করবে তারা তত বেশি। একে অন্যকে বিনাশ করে শেষটায় তারা সকলেই সমূলে বিনষ্ট হবে— অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম তখন শিব হয়ে গেল। সেই শ্মশানে তখন ফুটে উঠবে কম্যুনিজমের রসমঞ্জরী।' কিন্তু গত লড়াইয়ের সময় দেখা গেল, ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো দিব্য একজন আরেকজনের সহযোগিতা করল, শুধু তাই নয়, শ্রেণিতে শ্রেণিতে যে দ্বন্দ্ব শান্তির সময় উগ্র হতে উগ্রতর হতে চলছিল সেই দ্বন্দ্ব লড়াইয়ের সময় উগ্রতম না হয়ে সব শ্রেণি এক অদ্ভুত সহযোগিতার পরিচয় দিল। ক্যাপিটালিস্টের বড় গোসাঁই চার্চিলের ডাকে ইংল্যান্ডে চাষা-মজুর যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাড়া দিল, সেরকম ধারা সাড়া স্তালিনকেও আপন দেশে দেখাতে বেগ পেতে হবে।

প্রমাণ হয়ে গেল, অন্তত এই ব্যাপারে মার্কস সায়েবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল (আরেক ব্যাপারে যে তিনি ভুল বলেছিলেন সেটা হচ্ছে, রুশিয়াতে সর্বপ্রথম মজুররাজ বসতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি— কিন্তু সে প্রস্তাব এখানে অবান্তর), এবং এই প্রমাণটি অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সপ্রমাণ করে দিলেন রুশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক পণ্ডিত 'ভাগা' সায়েব! মস্কোর বুকের উপর বসে রুশিয়ার সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক জ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে তিনি যখন এই মার্কসদ্রোহী 'কাফির' ফতোয়াখানা ছাড়লেন তখন স্বয়ং স্তালিন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

বেদনাটা এইখানেই। কম্যুনিস্টরা কখনও আঁচতে পারেনি যে, ক্যাপিটালিস্টদের ভিতরে এখনও এতটা প্রাণশক্তি রয়েছে যে, তারা এখনও বাঁচতে জানে, অর্থাৎ বিপদ সামনে দেখলে তারা আর দিশেহারা হয়ে মারামারি করে লাইফবোটটাকে ভেঙে তো ফেলেই না, এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, সহযোগিতা করে, আসল জাহাজখানাকেই ফের চালু করে তোলে। তারাও প্ল্যান-মাফিক কাজ করতে শিখে গিয়েছে। এই প্ল্যানের নামই মার্শাল প্ল্যান।

দৈনিক বসুমতী।

www.pathagar.com

আরব্য-রজনীর অরুণোদয়

আরব্য উপন্যাসের কৃপায় বিশ্বজন খলিফা হারুন অর্-রশিদের বাগদাদ চেনে। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একদা বাঙালি মাত্রেই পড়ত এবং সেই সূত্রে ফুরাৎ (ইউফ্রেটিস), কারবালা এবং কুফা নগরী, বাগদাদ শহরের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। ইদানীং মোটরগাড়ি চালু হওয়ার ফলে অনেকেই পেট্রোলের খবর রাখেন এবং ইরানের মুসাদ্দিক যখন আপন পেট্রোল আপন ঘরে তুলতে চাইলেন, তখন সেই সূত্রে অনেকেই ইরাকের তেলের খবরও পেলেন। বাস্তিল পতনের দিন বাগদাদে যে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে এই 'স্নেহ' বা তেলের উৎস— যদিও সেটা এখন রণ-দামামার অট্টরবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

আরবভূমি (জজিরাতু ল্-অরবিয়া) ইরাক (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত), সিরিয়া (অশ্-শাম্ বা শাম্— শামিকাবাব যেখান থেকে এসেছে), লেবানন (লুব্নান), ট্র্যান্স-জর্ডন বা শুধু জর্ডন (উরদুন), সউদি আরব (মক্কা-মদিনা নিয়ে হিজ্জাজ এবং মধ্য আরবের নেজ্দ্ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠিত), ইয়েমেন (ইয়েমেন শব্দের অর্থ আরবিতে দক্ষিণ ও শাম্ অর্থ উত্তর— অর্থাৎ আরবভূমির দক্ষিণ এবং উত্তর সীমানা) ও প্যালেস্টাইন নিয়ে সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ড। এ-ছাড়া আদন বন্দর অঞ্চলের এডেন প্রটেকটরেট হাদ্রামুত, ওমন, কুয়েৎ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে এবং এসব জায়গায় ইংরেজের প্রাধান্য!

(আদনের ঠিক সামনেই সোকোত্রা দ্বীপ। একদা এ দ্বীপ ভারতবর্ষের অধিকারে ছিল। সোকোত্রা নাকি সংস্কৃত 'সুখাধার' শব্দ থেকে এসেছে।)

আরবভূমির ৯৫ থেকে ৯৮ জন লোক মুসলমান এবং এদের ভাষা আরবি। কিন্তু লেবাননের শতকরা ৫৩% লোক খ্রিস্টান এবং বিপদে পড়লেই পশ্চিমের খ্রিস্টানদের কাছে সাহায্য চায়। অবশ্য এদের ভিতরও বেশকিছু জাতীয়তাবাদী আছে, যারা দেশের ঝগড়াঝাঁটির ভিতর বিদেশির আগমন পছন্দ করে না। খ্রিস্টানদের মাতৃভাষাও আরবি। রাষ্ট্রের নেতা সাধারণত খ্রিস্টানই হয়ে থাকেন ও প্রধানমন্ত্রী মুসলমান।

১৯১৪ সাল অবধি প্যালেস্টাইনের শতকরা নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই জন অধিবাসী ছিল মুসলমান, বাদবাকি খ্রিস্টান এবং ইহুদি। এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

এই দুই অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাদ দিলে তাবৎ আরবভূমি ইসলামের অনুপ্রেরণায় চলে। কিন্তু খ্রিস্টান আরবদের জাতীয়তা আন্দোলনে আকর্ষণ করার জন্য অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ প্রপাগান্ডা চালানো হয়। ইদানীং সিরিয়া ও বাগদাদে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর এই ধর্মনিরপেক্ষতা আরও জোর পেয়েছে। সোমবার রাত্রে বাগদাদ বেতার কেন্দ্র যে আনন্দোল্লাস করছিল, তাতে ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর' (আল্লা সর্বমহান) ধ্বনি হুঙ্কারিত হলেও সমগ্র আরবভূমির ইসলামি ঐক্য সম্বন্ধে এখনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। বলা বাহুল্য, বাগদাদ-কাইরোর আরব খ্রিস্টানরাও দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের নাম স্মরণ করার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলে থাকে।

আফ্রিকার মিশরকে যদিও আরবভূমি বলা যায় না, তবু স্মরণ রাখা ভালো যে সেখানকার শতকরা নব্বুইজন লোকের ধর্ম ইসলাম ও শতকরা ৯৮ জন (খ্রিস্টান কপট্দের

www.pathagar.com

নিয়ে) আরবি বলে থাকে। এবং এই মিশরই আরবভূমির নবজাগরণের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে— প্রধানত দৃষ্টান্ত দ্বারা। তাই মিশরকে বাদ দিয়ে জজিরাতুল অরবিয়া সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা যায় না।

ইরাকের বর্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিপূর্ণ ইতিহাস দিতে হলে হজরত মুহম্মদ সাহেবকে দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, এবং তার সরল অর্থ সৈয়দ আমির আলী কৃত 'হিস্ট্রি অব্ দি সেরাসিন্‌স্' পুস্তকখানা সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করে আরও একটি নতুন ভল্যুম তার সঙ্গে জুড়তে হয়। সংবাদপত্র তার জন্য প্রশস্ত নয়, অতএব যেটুকু না বললেই নয় সেটুকু সংক্ষেপে সমাধা করি।

মহাপুরুষ মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যগণের সময় মদিনা ছিল আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি। পরবর্তী যুগে দামাস্কস্ (দিমিশ্‌ক— শামের রাজধানী), তার পর বাগদাদ এবং সর্বশেষ ইস্তাম্বুল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (এ-দেশে যখন খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়) খলিফার সঙ্গে মুসলিম-জগতের কেন্দ্রভূমি লোপ পায়। এরপর রাজা ইবনে সউদ মক্কাকে কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করে নিষ্ফল হন এবং অধুনা নজিব-নাসির কাইরোকে মুসলিম জাহান না হোক আরব-ভুবনের কেন্দ্রভূমি করার চেষ্টা করছেন। সউদি আরব অবশ্য এ চেষ্টা এখনও ছাড়েনি, কারণ হাজার হোক এখনও প্রতি বৎসর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান নরনারী হজ করতে মক্কা যায়— এবং কুরান শরিফে মক্কাকেই ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নাসির আর যা-খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু নামাজ পড়ার সময় তাকে মক্কার দিকেই মুখ করতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যপ্রাচ্যে যে তুমুল হট্টগোল লেগেছে, যার পানে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ তাবৎ রাষ্ট্র— মায় মার্কিন-রুশ— একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে সউদি আরব কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। হয়তো সে ভাবে মার্কিনের সঙ্গে লড়াই করে এরা সব নিঃশেষ হয়ে যাক— বিশেষ করে নাসির— তা হলে তার পর আমি আরব-মিশরের ওপর রাজত্ব করব। এ অভিলাষ যে ভ্রমাত্মক সে কথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কারণ মার্কিন যদি নাসির-মতবাদকে ধ্বংস করে তবে তাকেও একদিন ওই একই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে কথা পরে হবে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তাবৎ আরবভূমি তুর্কির খলিফার হুকুমে চলত। এমনকি মক্কার শরিফ (পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর কাবার রক্ষাকর্তা) হজরত মুহম্মদের কুরেশ বংশধর হাশিমি-প্রধানকেও (এই হাশিমি বংশেরই দুই প্রধান যথাক্রমে বর্তমান ইরাক ও জর্ডনের রাজা) তুর্কি খলিফার হুকুমমতো চলতে হত। যুদ্ধ লাগার পর ইনি ইংরেজের সাহায্যে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এটাকে কিন্তু বিদেশি তুর্কের আধিপত্য থেকে আরবের মুক্তিপ্রয়াসের ন্যাশনালিজম নাম দিলে ভুল করা হবে, যদিও এই জিগির তুলেই শরিফ হুসেন আরবদের কিছুটা সমর্থন পেয়েছিলেন। আসলে এটা ডাইনেস্টিক বা রাজবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। মূলত অবশ্য এর পিছনে ছিল ইংরেজ। যারা লরেনসের 'সেভ্‌ন্ পিলারজ্ অব উইজ্‌ডম্' পড়েছেন, বাকি কাহিনী তাঁদের আর বলতে হবে না। এই শরিফগোষ্ঠী এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ইংরেজের সাহায্যে তুর্কির প্রচুর ক্ষতি করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তুর্কির যুদ্ধে পরাজয় যে প্রধানত ওই কারণেই হয়েছিল একথা আজও কেউ বলেনি।

www.pathagar.com

আরব জয়চন্দ্র এই যে খাল কেটে ঘরে কুমির আনলেন, তারই খেসারতি সম্পূর্ণ আরবভূমিকে আজও চোখের জলে নাকের জলে দিতে হচ্ছে। লাভের মধ্যে তাঁর এক বংশধর এখন জর্ডনের টলটলায়মান সিংহাসনে বসে তাঁরই প্রপিতামহের স্মরণে ইংরেজকে ডাকছেন এবং অন্যজন নাকি এসবের অতীত হয়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এসব পরের কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হাশিমিগোষ্ঠী অবাক হয়ে দেখে, 'সেল্‌ফ্ ডিটারমিনেশন্ অব্ দি পিপলস্', 'জনগণের স্বরাজলাভ' ইত্যাদি জিগির তুলে যে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ হাশিমি তথা আরবদের কিয়দংশ তুর্কির বিরুদ্ধে তাতিয়েছিল, তারাই তাবৎ আরবভূমি গ্রাস করে বসে আছে! এমনকি মক্কার শরিফ হুসেনকেও নাকি বলতে হবে, তিনি এখন আর তুর্কির খলিফার মনোনীত প্রতিনিধি নন, এখন তিনি ইংলন্ডের (খ্রিস্টান!) রাজার প্রতিনিধি হয়ে মুসলমানের পুণ্যভূমি মক্কা-মদিনার তদারকি করবেন! অর্থাৎ ইস্তেক কাবা পর্যন্ত খ্রিস্টানের তাঁবেতে চলে গেল! মহাপুরুষ মুহম্মদের পরে এ দুর্দৈব ঘটল এই প্রথম। বিশ্ব-মুসলিমের জিগরে তাতে কতখানি চোট লেগেছিল, সেকথা আর বর্ণনা দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এ-দেশে পর্যন্ত তার ঢেউ এসে যে খেলাফতি আন্দোলনের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল সেকথা বয়স্কদের স্মরণে থাকার কথা।

কিন্তু ইংরেজ করল ব্যাকরণে সামান্য একটি ভুল। আরবভূমি ভাগাভাগি করার সময় ফ্রান্সকে দিল শিকার-করা হরিণের ন্যাজটুকু অর্থাৎ সিরিয়া। ফ্রান্স গেল ভয়ঙ্কর রেগে। কিন্তু ওই নিয়ে তো আর আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ বাধানো যায় না। ফ্রান্স লেগে গেল দাদের সন্ধানে।

ইতোমধ্যে মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কি থেকে ইংরেজ আধিপত্য সরাবার জন্য লাগালেন লড়াই। ফ্রান্স বিষমোল্লাসে, অবশ্য গোপনে, সিরিয়ায় সঞ্চিত তার অস্ত্রশস্ত্র দিল মুস্তাফা কামালের হাতে তুলে। লয়েড জর্জ তুর্কির ইংরেজ সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য বিশ্ব-খ্রিস্টানকে আহ্বান করলেন। ফ্রান্স তো গোপনে কামালকে সাহায্য করছেই— আমেরিকাও ততদিনে কেটে পড়েছে— কেউ সাহায্য করল না। ইংরেজসৈন্য তুর্কি ছেড়ে পালাল। কামাল নয়ি তুর্কি গড়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেল।

ইংরেজ তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের এনে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীর ঘাঁটি নির্মাণে তৎপর হল।

* * *

এই তাবৎ ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর মধ্য আরবিস্তানের ঊষর মরুভূমি নেজ্‌দের ওয়াহ্‌হাবি (সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে বাঙলা দেশের স্বাধীনতাকামী বীর দুদু মিয়া ও তীতু মীর দুজনাই ওয়াহ্‌হাবি ছিলেন) রাজা ইবনে সউদ তাঁর সুযোগের প্রহর গুনছিলেন। এই সউদি বংশ শরিফের হাশিমি বংশের জন্মশত্রু। মক্কার শরিফ যখন ইংরেজের তাঁবুতে চলে যাওয়ায় মক্কাও কার্যত খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেল তখন 'কাবা ইন্ ডেনজার' এই মর্মভেদী বাণী প্রচার করে তিনি আরব বেদুইনদের এক ঝাণ্ডার নিচে জমায়েত করে চললেন মক্কার উদ্দেশ্যে। শরিফ প্রমাদ গুণে তারস্বরে ইংরেজের সাহায্য চাইলেন। ইংরেজের তখন দু হাত ভর্তি। সে কোনও সাহায্য করতে পারল না। স্বাধীন রাজা ইবনে সউদ মক্কা-মদিনার রাজা হলেন। বিশ্ব-মুসলিম আশ্বস্ত হল।

সমস্ত আরবভূমি যায় যায় দেখে ইংরেজ তখন জর্ডন ও ইরাকে দুই হাশিমি রাজ্য বসাল। আবদুল্লাকে জর্ডনে ও ফৈসলকে ইরাকে। ইরাকের শেষ রাজা এই ফৈসলের পৌত্র।

www.pathagar.com

২

মিশর দেশ যদিও আফ্রিকায় অবস্থিত ও সেখানকার আরব ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে দেশীয় রক্তের প্রচুর সংমিশ্রণ হয়েছে তবু সেখানকার ভাষা আরবি, জনসাধারণ প্রধানত মুসলমান এবং সবচেয়ে বড় কথা কাইরোর অল-অজ্‌হর বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। ইরাক, লেবানন, সিরিয়া এমনকি ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদিনার ছাত্ররাও উচ্চশিক্ষার জন্য অজ্‌হরেই যায়। ভারতীয় ছাত্রদের জন্যও সেখানে বিশেষ হোস্টেল আছে। মক্কাতে যেরকম হজের সময় বিশ্ব-মুসলিম নানারকমের রাজনৈতিক মতবাদে তালিম পায়, কাইরোতে ঠিক সেইরকম সম্বৎসরই রাজনৈতিক চর্চা হয়। তদুপরি নাইল-প্লাবিতা মিশরভূমি অর্থশালিনীও বটেন।

কাজেই মিশরকে আরব-ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে নিতে হয়। এবং তা হলে উপস্থিত এ-ভূখণ্ডে চারিটি শক্তি বিরাজমান।

১। মিশর। এর জনসাধারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তিক্ত আস্বাদ প্রচুর পেয়েছে। তবু তারা সহজে যে কোনও রাজনৈতিক দলে ভিড়ছে তা নয়, প্রায় বাধ্য হয়েই তাকে রাশার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিতালি করতে হয়েছে।

২। সউদি আরব। মিশরের সঙ্গে তার দৃশ্যমান কোনও শত্রুতা না থাকলেও সউদি আরবও বিশ্ব-মুসলিমের কেন্দ্রভূমি হতে চায় ও সে-স্থলে মিশরের সঙ্গে তার শত্রুতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রগতির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে এ ভূমি সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। আমেরিকাকে তেল বিক্রি করে এরা প্রচুর পয়সা কামায় বলে এরা কিছুটা মার্কিন-ঘেঁষা। কিন্তু সুযোগ পেলে মার্কিনকে ঝেড়ে ফেলে নিজের তেল নিজেই বিক্রি করার চেষ্টা করলেও করতে পারে। এদের বংশগত শত্রুতা কিন্তু হাশিমিদের সঙ্গে—অর্থাৎ জর্ডন ও ইরাকের রাজপরিবারের সঙ্গে।

৩। হাশিমি পরিবার। এঁদের একজন এখনও জর্ডনের রাজা। অন্যজনের রাজত্ব গেছে এবং বাগদাদ বেতারকেন্দ্র আজকাল অতি গর্বের সঙ্গে 'জমহুরিয়াতুল ইরাকিয়া' অর্থাৎ 'ইরাক রিপাবলিক' বলে আত্মপরিচয় অভিজ্ঞানবাণী প্রচার করে ও সমস্ত রাত ধরে 'রব্বুল-আম' অর্থাৎ 'জনগণ অধিনায়কে'র প্রশস্তি গায়। এই 'রব্বুল-আম' সমাসটি আমি ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। সাধারণত আল্লার প্রশস্তি গাওয়ার সময় বলা হয়, 'রব্বুল আলিমিন' (দুই ভুবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য অধিনায়ক), কিম্বা 'রব্বুল মুসলিমিন' (মুসলিমদের অধিনায়ক) কিম্বা ওই জাতীয় কিছু একটা।

৪। সিরিয়ার গণতন্ত্র। খাস আরব-ভূখণ্ডে একা বলে (লেবানন যদিও রিপাব্লিক তবু সেখানকার খ্রিস্টান-প্রাধান্য দুই গণতন্ত্রের সৌহার্দ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল) সে মিশরের সঙ্গে মিলে গিয়ে যুক্তগণরাষ্ট্র নির্মাণ করেছিল। সিরিয়াতে রুশ-প্রাধান্য বেশ-কিছুটা আছে এবং পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে সুয়েজ-সঙ্কটের সময় সিরিয়া রাশাকে তার দেশে জঙ্গিবিমান অবতরণ করতে দেয়। বর্তমানে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সিরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হল।

রাষ্ট্র হিসেবে লেবানন এদের থেকে একটু আলাদা থাকে। লেবাননের খ্রিস্টান-প্রাধান্য তার অন্যতম কারণ। আধুনিক ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় কিন্তু ইসরাইলের পরেই তার স্থান। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকানরা এখানে একটি কলেজ খোলে ও পরে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়। এদের প্রকাশিত বহু আরবিপুস্তক প্রাচ্যপ্রতীচ্যে যশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেসুইটরাও আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এসব সত্ত্বেও লেবাননে রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করা কঠিন। খ্রিস্টান ও মুসলমানের সংখ্যা যদিও প্রায় সমান তবু খ্রিস্টানরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মুসলমানরাও প্রায় সমান সমান শিয়া-সুন্নিতে বিভক্ত এবং তার ওপর দ্রুজ মুসলমানরাও রয়েছে। আমেরিকানরা যখন বলে, তাদের লেবাননে নামার অন্যতম উদ্দেশ্য সেদেশের খ্রিস্টানদের রক্ষা করা তখন সেটা নিছক মিথ্যা নয়। যদিও ধর্মের জন্য ব্যাপক খুনোখুনি সেখানে হয়েছে বলে জানিনে। বরঞ্চ দ্রুজ মুসলিমদের ওপর সুন্নি মুসলমানদের প্রচুর আক্রোশ বহুযুগ ধরে বর্তমান।

আরবরা ইসরাইলকে আরব-ভূখণ্ডের অংশ বলেই ধরে এবং সুযোগ পেলে ইহুদিদের যে সমূলে বিনাশ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বলতে গেলে ইসরাইলই এখন আরবভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ইসরাইল তার প্রাণের মায়ায় মার্কিন-ইংরেজের ওসম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এক লেবানন ছাড়া আর সকলেই তার জানের দুশমন্।

তুর্কি আরব-ভূখণ্ডের অংশ নয়, তুর্কির মাতৃভাষা ওস্মানলি-তুর্কি ভাষা কিন্তু যেহেতু তুর্করা মুসলমান এবং বহুযুগ ধরে আরব ও মিশরের ওপর রাজত্ব করেছে তাই আরবের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎও বিজড়িত। অবশ্য তুর্কির সবচেয়ে কঠিন শিরঃপীড়া রুশকে নিয়ে। রুশের ভয়ে শেষপর্যন্ত সে মার্কিনের শরণ নিয়েছে। রুশ কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর মোহড়া দেবে এ খবর বৃহস্পতিবার দিনে রাষ্ট্র হয়। মার্কিন সৈন্যও ওই সময়ে তুর্কিতে নামে।

তা হলে মোটামুটি দাঁড়াল এই :

জর্ডন, ইসরাইল ও তুর্কি মনেপ্রাণে মার্কিন সাহায্য চায়। ইসরাইলের সবাই চায়; জর্ডনের জনগণ খুব সম্ভব চায় না কিন্তু রাজা চান; লেবাননের কর্তৃপক্ষ চান কিন্তু বিদ্রোহীরা অবশ্যই চায় না, তুর্কির অধিকাংশ লোক অনিচ্ছায় চায়। সিরিয়া, ইরাক ও মিশর মার্কিন-ইংরেজকে তাড়াতে চায়। রুশের সাহায্য কতখানি প্রত্যাশা করে বলা কঠিন। জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে যে রুশকে আমন্ত্রণ জানাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিম্বা রুশ নিজের থেকেই নামতে পারে। বিশ্ব-কম্যুনিস্ট রুশের দিকে তাকিয়ে আছে সে গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করে কি না, কাজেই শেষপর্যন্ত হয়তো তাকে অনিচ্ছায়ই নামতে হবে। 'অনিচ্ছায়' এই কারণে বললুম যে যুদ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত ক্লাউজেঙ্গিস বলেছেন, 'সংগ্রামে নামবে তোমার সুবিধামতো পছন্দমাফিক সময়ে— শত্রুর আহ্বানে নয়।' আমেরিকা হয়তো স্থির করেছে, রুশের আর শক্তিবৃদ্ধি হতে দেওয়া নয়, এইবারেই লড়ে নেওয়া ভালো। রুশ হয়তো ভাবছে, 'এখনও আমার সময় হয়নি।'

প্রত্যক্ষত তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সঙ্কটের পাত্র উপচে পড়ল ইরাক নিয়ে। সেখানে ইংরেজের তেলের স্বার্থ কিন্তু এ-সম্পর্কে ইংরেজের রাজনৈতিক বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না। সুয়েজ কানালের ব্যাপারে ইংরেজ তো আমেরিকাকে নামাতেই পারল না, বরঞ্চ বিশ্বজনের নির্মম কটু-কাটব্য শুনতে হল, পরাজয়ও মানতে হল। এবারে ইংরেজ প্রথমে নামাল মার্কিনকে, নিজে নামল পরে। তবে ভয় হয়, ভালোয় ভালোয় সবকিছু মিটে যাবার পর হয়তো মার্কিনরা ইরাকের তেলের বখরা চেয়ে বসবে। বাঙলায় বলি, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'। এ ক্ষেত্রে হবে 'ফেলো তেল, পাবে না কড়ি'।

www.pathagar.com

বাগদাদের এ-বিপ্লব অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। নূরি অস্-সঈদ ('সৈয়দ' নয়) ত্রিশ বৎসর ধরে যে রাজনীতি চালিয়েছেন তার মধ্যে তার ইংরেজ-প্রীতিই যে সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। কিন্তু সভ্যতার যে প্যাটার্নের তিনি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রতিভূ ছিলেন সেটা সামন্তবাদ প্যাটার্ন। ইংরেজের কাছে তেল বিক্রি করে যে পয়সা আসত সেটা সামন্তবাদের খপ্পরেই চলে যেত। ওদিকে ভিতরে ভিতরে জনসাধারণ নূরি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ নেতাদের চেয়ে প্রগতিচিন্তায় অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। তবু নূরি হয়তো সামলে নিতে পারতেন যদি-না তিনি 'ছোটা ডিকটেটরি' স্টাইলে শুধু রাজার সাহায্যে দেশ না চালাতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর জনসাধারণ কতখানি এগিয়ে গিয়েছে তিনি বুঝতে পারেননি। এ প্যাটার্নটা মিশরের সঙ্গে মিলে যায়। ওয়াফদ্ দলের নেতা এবং রাজা ফারুকও বুঝতে পারেননি মিশরীয় ফল্লাহ (চাষা) কতখানি এগিয়ে গিয়েছে। ফলে রাজা সিংহাসন হারালেন, ওয়াফদের অস্তিত্ব লোপ পেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশর এবং ইরাকে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করল আর্মি অফিসাররা। প্রকৃত গণ-আন্দোলনে দেশের সেনানীও যোগ দেবে এ তো ন্যায্য কথা কিন্তু আর্মি-অফিসারদের নেতৃত্বে এবং মোল্লা-পুরুতের নেতৃত্বে কোনও তফাৎ নেই। এদের কেউই সত্যকার গণতন্ত্র চায় না। 'ডিসিপ্লিন', 'শাস্ত্রাধিকারের' দোহাই কেড়ে এরা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও অধিকার পদে পদে খণ্ডন করতে চায়।

আমরা শান্তিকামী, এবং পণ্ডিতজি বাগদাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে বাগদাদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে বাগদাদ বেতার পণ্ডিতজির সম্পূর্ণ উক্তিটি একাধিকবার প্রচার করেছে— শ্রদ্ধার সঙ্গে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই ১৯৫৮

মরূদ্যান না মরীচিকা?

১৪ জুলাই ইরাকে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হল তাই দিয়ে ব্যাপারটার আরম্ভ নয়। এর কিছুদিন পূর্বেই লেবাননের প্রেসেডিন্ট রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানান যে, তাঁর দেশে যে অল্পস্বল্প বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার পিছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিরিয়ার প্ররোচনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ লেবাননে কয়েকজন 'পরিদর্শক' পাঠান এবং এঁরা যখন তদারকিতে ব্যস্ত এমন সময় ফাটল ইরাকি বোমা! প্রেসিডেন্ট শামুন তখন রীতিমতো ভয় পেলেন, কারণ ইরাক যে সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে লেবাননকে আরও বিপদে ফেলবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। বস্ত্রাকর্ষিতা দ্রৌপদীর ন্যায় তিনি তখন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। অন্তত তাই করলে ভালো হত। তিনি স্মরণ করলেন মার্কিনিংরেজকে। ফলে মার্কিন সৈন্য নামল লেবাননে এবং ইংরেজ গেল তারই দোসর জর্ডনে।

সঙ্গে সঙ্গে রুশ উদ্ধত এবং অকুণ্ঠ ভাষায় বলল, কর্মটি সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন তার পরিদর্শক মারফতে লেবাননের তদারকিতে লিপ্ত তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্য কোনও সদস্যকে কিছুমাত্র না জানিয়ে এরকম সৈন্য নামানো বিশ্বশান্তি নষ্ট করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.com

বিশ্বের পরম সৌভাগ্য যে, তখন রুশ উত্তপ্ত দুর্যোধনের ন্যায় 'সূচ্যগ্রেণ— রব ছেড়ে সিরিয়া কিংবা ইরাকি সীমান্তে সৈন্য পাঠায়নি, ভান করেছিল মাত্র। আসলে সে তার সুবুদ্ধির পরিচয় দিল বিশ্বের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে এবং তাই নিয়ে আলোচনার বৈঠক ডাকবার জন্য।

তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ জরুরি সাধারণ সম্মেলন বসল। একাশিজন সদস্যের সবাই, কিংবা প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ বেতার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রোগ্রাম বন্ধ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা সর্ববিশ্বে প্রসার করার জন্য এগিয়ে এল। ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে যার নাম 'বল্ টু বল্ কমেন্টারি'। সেই একাশিজন সদস্যের কেউ যে মৌনব্রত অবলম্বন করবেন সে আশা বা দুরাশা কোনও সুস্থ শ্রোতাই করেননি। পনেরো মিনিট থেকে কে ক'ঘণ্টা বলবেন তারও কিছু ঠিকঠিকানা ছিল না। সেই তাবৎ বক্তৃতা কণামাত্র কাটছাঁট না করে পুরোপুরি বেতারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও রুশে অনুবাদ। আমাদের বিশ্বাস, বৈঠকের সভাপতি ছাড়া আর কেউই সব বক্তৃতা শোনেননি। তবে প্রতি বৈঠকের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের বেতার-টীকাকার প্রতি বক্তৃতার সারাংশ শ্রোতাদের শুনিয়ে দেন।

বক্তৃতাগুলো যে শোনবার মতো ছিল যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের শ্রীযুত আর্থার লালও উত্তম বক্তৃতা দেন। সংযত কণ্ঠে, উত্তম উচ্চারণে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি পরিপূর্ণ সম্ভ্রম দেখিয়ে। তবে এ সম্বন্ধে শ্রীযুত আলভা যা বলেছেন সেটাও সম্পূর্ণ ভুল নয়। যেখানে স্বয়ং আইসেনহাওয়ার এবং বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপন আপন দেশের হয়ে কথা বলেন, সেখানে শ্রীযুত লালের পদমর্যাদা কিঞ্চিৎ অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়। সোজা বাংলায়, অনেক সময় ধারের চেয়ে ভারেই কাটে বেশি।

'কূটনৈতিকরা সর্বক্ষণ কুটিল কথা বলেন', বক্তৃতা শুনে এ বিশ্বাস আমার ভাঙল। বস্তুত এঁদের ভিতর অনেকেই ছিলেন গভীর দার্শনিক। ইরাক-জর্ডান-লেবাননের খেই ধরে এঁরা বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিন্তা করেছেন এবং বারবার সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছিলেন যে, শান্তির জন্য কীভাবে জনমত দৃঢ়তর করা যায়, কোন নীতি অবলম্বন করলে আজ-এখানে কাল-সেখানে অশান্তিবহ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে না। বিশ্বজন যে এঁদের আলোচনা উদ্গ্রীব হয়ে শুনছে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। বস্তুত একদিন বৈঠক বসতে ১১ মিনিট দেরি হওয়ায় সভাপতি বলেন, বিশ্বজন যখন আমাদের আচরণের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত।

আইসেনহাওয়ার কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। তিনি অনেকটা 'আসামি'র মতো সাফাই গাইলেন, আমরা লেবানন ত্যাগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত— যদি লেবানন সে ইচ্ছা জানায় কিংবা অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের রইল দুটি প্রস্তাব—

১। রুশের পক্ষ থেকে : কালবিলম্ব না করে মার্কিনিংরেজ মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরে পড়ুক।

২। নরওয়ে এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব : সমস্ত ব্যাপারটা রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল মি. ডাফ্ হামারশ্যেল্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। সৈন্য সরানোর কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করবেন তিনি।

www.pathagar.com

এ প্রস্তাবে সৈন্য সরানোর পুরো ভরসা নেই, তবে প্রস্তাবকরা বলেন, যেহেতু আইসেনহাওয়ার বিশেষ শর্ত প্রতিপালিত হলে সৈন্যাপসারণে প্রস্তুত তখন সেক্রেটারি জেনারেলের কার্যকলাপ ওই দৃষ্টিবিন্দু থেকেই পরিচালিত হবে। সৈন্য অপসারণের খানিকটে ভরসা এতে পাওয়া গেলেও কবে সেই শুভকর্মটি সমাধান হবে, এ সম্বন্ধে কোনও হদিস মূল প্রস্তাব কিংবা তার টীকাতে পাওয়া গেল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ প্রস্তাবের পশ্চাতে রয়েছেন মার্কিনিংরেজ এবং তাদের খয়েরখাঁরা।

এ দুই প্রস্তাব নিয়ে যখন পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে তখন শোনা গেল, এশিয়ো-আফ্রিকি রাষ্ট্রগুলো একটি তৃতীয় আপোসি প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তার মূল্য উদ্দেশ্য হবে, সৈন্য সরানো হোক— অ্যাট অ্যান আর্লি ডেট, কূটনৈতিক ভাষায় কী বোঝায় তা জানেন শুধু ভাবগ্রাহী জনার্দন। কারণ কথিত আছে, কোনও ডিপ্লোমেট যখন বলেন 'নো' তার সোজা অর্থ 'পারহ্যাপস্'; যখন তিনি বলেন 'পারহ্যাপস্' তখন তার সোজা অর্থ হ্যাঁ; এবং তিনি যদি কখনও বলেন 'হ্যাঁ', তা হলে বুঝতে হবে তিনি ডিপ্লোমেট নন।

তখন দেড় দিনে গোটা পাঁচেক বৈঠক হয়েছে মাত্র, এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যের তাবৎ আরব রাষ্ট্র একজোট হয়ে সবার মাঝখানে ফাটাল এক বিরাট বম্। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাঁরা নাকি সবাই একটি প্রস্তাবে সম্মত আছেন— এবং জর্ডন ও লেবাননও নাকি তাতে আছেন! প্রস্তাবটি নাকি ইতোমধ্যে গিয়েছে আরবদের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের আপন আপন রাজধানীতে। তাদের প্রধানমন্ত্রীরা সম্মতি জানালেই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে পেশ করা হবে।

বৈঠকে তখন লেগে গেল ধুন্দুমার! যাদের নিয়ে এত শিরঃপীড়া তারাই যদি একমত হয়ে কোনও প্রস্তাব পেশ করে তবে অন্যদের আর ফপরদালালি করবার রইল কী? উৎকট সঙ্কটটা দেখা দিয়েছে লেবানন আর জর্ডন বাইরের সাহায্য চাইল বলে; তারা যদি 'শত্রু'র সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে তারা নিশ্চিন্ত, তখন মার্কিনিংরেজেরই বা বলবার রইল কী, রুশের হুঙ্কারও তো অর্থহীন।

এ প্রস্তাবের সম্মতি মধ্যপ্রাচ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে না আসা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দিলেই হত, কারণ ওটা এলে যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে সে-সম্বন্ধে কারও মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। তবু বক্তৃতা চলল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, বক্তৃতাতে আর কোনও ঝাঁজ নেই। উকিল যদি জানতে পারে হাকিম মোকদ্দমার রায় আগেভাগেই লিখে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছেন, তখন তার বক্তৃতা আর জমে না।

উত্তর আসতে বোধহয় ত্রিশ-চল্লিশ ঘণ্টা লেগেছিল। মাঝখানে একটা রাত কেটে গেল। বৃহস্পতিবার রাত্রে সাড়ে বারোটায়। (নিউইয়র্কে বেলা দুটো) যখন দিনের দ্বিতীয় বৈঠক বসবার কথা এখনও খবর আসেনি। সভা নির্ধারিত সময়ে বসল না। টীকাকার 'ক্যানড্ মিউজিক' অর্থাৎ রেকর্ডসঙ্গীত বাজাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুসংবাদ এল। দশটি আরব রাষ্ট্র, যথাক্রমে লেবানন, জর্ডন, তুনিসিয়া, মরক্কো, লিবিয়া, মিশর, ইরাক, সউদি আরব, ইয়েমেন, সিরিয়া একমত হয়ে একে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে সম্মত হয়েছেন; কাজেই বিদেশি সৈন্য সরানো হোক— অ্যাট অ্যান আর্লি ডেট। এবারে অবশ্য, 'আর্লি ডেটে' ভয় পাবার কিছু নেই।

www.pathagar.com

সভাজন একবাক্যে, 'সাধু সাধু' রব ছড়ালেন। জাতিপুঞ্জের একটি স্মরণীয় দিবস। এরকম 'ভিটো-হীন' সভা পূর্বে হয়েছে বলে স্মরণে আসছে না। 'জয়তু আরব ন্যাশনালিজম!'

* * *

সবাই উল্লসিত হয়েছেন আরব ঐক্য দেখতে পেয়ে, আরব ন্যাশনালিজম জাগ্রত হয়েছে দেখে। আমরাও হয়েছি।

কিন্তু চিন্তা করে দেখা যাক এতে লাভ হল কার? যদি বলি মার্কিনিংরেজের, তবে যেন কেউ আশ্চর্য না হন। মার্কিনিংরেজের বাসনা, লেবানন ও জর্ডন রাষ্ট্রদ্বয় যেন অক্ষত থাকে। তাই তারা জায়গা দুটিতে সৈন্য নামিয়েছিল। এখন তো মিশর, ইরাক, সিরিয়া অর্থাৎ অন্যান্য 'দুশমন' আরব রাষ্ট্রগুলোই সে ভার আপন আপন কাঁধে তুলে নিল! মার্কিনিংরেজ সৈন্যাপসারণের পর যদি জর্ডনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তো গণতান্ত্রিক মিশর, ইরাক, সিরিয়াকে যে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে তাই নয়, যেহেতু তাঁরা মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হয়েছেন, অতএব জর্ডনের রাজা তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করতে পারেন। সাহায্য করুন আর না-ই করুন— সর্বসম্মত প্রস্তাবে হয়তো অতদূর যাওয়া হয়নি— জর্ডন থেকে কোনও রাজদ্রোহী ইরাকে পালিয়ে এলে তাকে তো জর্ডনের হাতে ফেরত দিতে হবে।

আর কিছু না হোক, মিশর-ইরাক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে এখন বসে বসে দেখতে হবে, জর্ডন এবং লেবাননের প্রগতিশীল নেতারা কীভাবে ইংরেজ এবং মার্কিনের খয়েরখাঁ বাদশা হুসেন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হন। অন্তরে অন্তরে এদের কল্যাণ কামনা করলেও প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করতে হবে রাজা হুসেনের। মার্কিনিংরেজ সৈন্য অপসারণের পরও অদৃশ্য সৈন্যসঙ্কুল মার্কিনিংরেজ ঘাঁটি হয়ে রইল জর্ডন-লেবানন!

প্রতিক্রিয়াশীলরা আরব ভুবনে নতুন পাট্টা (লিস্) পেল!

এত দাম দিয়ে ঐক্য!

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১.৮.১৯৫৮

দেহলি প্রান্তে

এক

ভারতের আর সর্বত্র যেপ্রকারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে, দিল্লিতেও প্রায় সেইরকমই; তবে কি না দিল্লি রাজধানী, এখানে ভারতের বড় কর্তারা বসবাস করেন, নানা দেশের রাজদূতরা নানাপ্রকারের বেশভূষা পরে আমাদের পালা-পরবে আসেন, ভারতের সব প্রদেশের লোক দিল্লিতে বড় বড় আসন নিয়ে বসেছেন, তাই এখানকার পালা-পরব যতই আমাদের নিজস্ব হোক না কেন, তার চেহারা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক হয়ে যাবেই যাবে।

তবে কি না দিল্লির লোক কলকাতা কিংবা বোম্বায়ের তুলনায় গরিব বলে কলকাতা বা বোম্বায়ের লোক যখন পার্টি দেন, তখন তার জৌলুস-রওশন, শানশওকত হয় অনেক বেশি।

www.pathagar.com

এখানকার অধিকাংশ বড় লোক চাকরি করেন, চাকরিতে পয়সা কোথায়? পয়সা তো বোম্বাই-কলকাতার ব্যবসায়ীদের হাতে। আমাদের পার্টিতে চা আর মোমফলি; কলকাতার পার্টির স্মরণ করে আর মন খারাপ করব না।

তা হোকগে। পালা-পরবে কে কত পয়সা খরচ করল সেইটেই আসল কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শহরের পাঁচজন এদিনে আনন্দিত হয়েছে কি না, এবং সে আনন্দ— তা সে যে কোনও পন্থাতেই হোক— প্রকাশ করবার সুযোগ পেল কি না?

* * *

তা হয়তো পেয়েছিল। অন্তত আমি যে পাঁজরাপোলে থাকি, সেখানেও নৃত্যবাদ্য এবং উত্তম আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাইরের লোককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই আসতে পারেননি। সকলের বাড়িতেই পরব— গ্রামসুদ্ধ লোকের বড় ছেলের বিয়ে যদি একই দিনে হয়, তবে কে যাবে কার বাড়ি?

কাজেই আমরা আপোসে আনন্দ করলুম। 'বন্দে মাতরম' থেকে আরম্ভ করে খাস দিল্লির গজল, কসিদা বিস্তর গাওয়া হল। লাউড-স্পিকার দিয়ে সেসব গান রবাহূতদের শোনানো হল এবং সর্বশেষে কোর্মা-পোলাওয়ের ভূরিভোজন হল।

আমরা যখন পত্রপুষ্প, বেলুন-ঝালর ভর্তি বিরাট ঘরে বসে গান শুনতে, একে অন্যের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে ব্যস্ত ছিলুম, তখন আমাদের চাকরবাকরের ছেলেমেয়েরা আমাদের আনন্দোৎসব উঁকি মেরে মেরে দেখছিল। আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া— আমার অস্বস্তি বোধ হয়নি, কিন্তু আমার দু একটি সহৃদয়, স্পর্শকাতর বন্ধু আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে বললেন, তাঁদের আনন্দ সর্বাঙ্গসুন্দর হচ্ছে না।

আমি বললুম, 'সেসব দিন গেছে। আগের আমলে পালা-পরবের মানেই ছিল কাঙালি-ভোজন। গরিব-দুঃখীরা খেয়ে খুশি হত, কর্তারা খাইয়ে খুশি হতেন আর পাড়ার জোয়ান মদ্দেরা পরিবেশন করে সুখ পেত। ওই ছিল তখনকার দিনের 'ম্যাস্ কনটাক্ট্'। এখন আমরা 'ম্যাস্ কনটাক্ট্' করি খবরের কাগজে আর মিটিঙে— সেসব মিটিঙে আবার 'ম্যাস্' আসেও না।

* * *

আমার আরেক লক্ষ্মী-ট্যারা ঠোঁটকাটা বন্ধু আছেন। তিনি কখনওই কোনও বস্তু সোজা দেখতে পান না। আমাকে বললেন, 'আজ আর এমন কী দিন যে "মোচ্ছব" করতে হবে?'

আমরা সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকালুম।

বললেন, '২৬ জানুয়ারি আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা দিবস। ১৫ আগস্টে তো আমরা স্বাধীনতা পাইনি— পেয়েছি ডমিনিয়নত্ব।'

সুশীল পাঠক, আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

* * *

স্বাধীনতা দিবসেই আমি পিছন পানে তাকাই। ভাবি, এই এক বৎসরে দেশ কতখানি এগুলো?

বিত্তসম্পদের দিক দিয়ে কতখানি এগিয়েছি বা পিছিয়েছি, তার হিসাব আমার পক্ষে করা সুকঠিন, সুকঠিন কেন অসম্ভব। চিন্তা এবং ভাবের জগতের উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধে যে বুক

www.pathagar.com

ঠুকে কিছু বলব, সে শাস্ত্রাধিকারও আমার নেই। তবু যখন ওই জগতেরই 'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী', তখন রবাহূতরূপে গুণীজনের আলোচনার কিছু কিছু বুঝতে পেরে যেসব সমস্যার সমানে এসে পড়েছি, সেগুলো নিবেদন করি।

পণ্ডিতজি সব সময়েই বলেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং হিংসাবৃত্তি (ভায়োলেন্স) ত্যাগ না করলে ভারতের উদ্ধার নেই। হিংসাবৃত্তি কাদের, কেন তারা হিংস্র সেকথা আমি ভালো করে জানিনে, কারণ রাজনীতি আমি বুঝিনে এবং যাঁরা হিংস্র, তাঁরা বোধহয় রাজনৈতিক মতবাদবশতই হিংস্র হয়েছেন, তাই তাঁদের নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।

সাম্প্রদায়িকতা যেখানে ঐতিহ্য এবং বৈদগ্ধ্যগত (ট্রাডিশনাল এবং কালচারেল) সেখানে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায় কোনও না কোনও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইত্যাদি (এদের ভিতরে আবার উপসম্প্রদায় আছেন, কিন্তু সেগুলো নেশন বা জাতির সামনে এখনও আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি)। অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করে, হিন্দুধর্ম সর্বোত্তম ধর্ম, অধিকাংশ মুসলমানেরও বিশ্বাস ইসলাম পৃথিবীর শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ বিশ্বাস থেকে এদের টলানো উপস্থিত কিংবা অদূরভবিষ্যতে অসম্ভব। এবং তার প্রয়োজনও নেই, কারণ যতক্ষণ অবধি এ বিশ্বাস আমাদের জাতীয় (নেশনাল) জীবনে কোনও তোলপাড় সৃষ্টি না করে ততক্ষণ আমাদের কোনও ভাবনা নেই। আমার মা দুনিয়ার সব মায়ের চেয়ে ভালো রাঁধতে পারতেন। এ বিশ্বাস অধিকাংশ পুত্রই আপন মা সম্বন্ধে পোষণ করে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে, মুসোলিনি-হিটলার সেটা বলতে পারতেন যে, বাদবাকি দেশকে তাঁর মায়ের রান্নাই খেতে হবে, তা হলেই চিত্তির।

হিন্দুরা ১৯৫২ সালে এ আশা করেন না যে, মুসলমানরা হিন্দু হয়ে যাবে কিংবা মুসলমানরাও অনুরূপ প্রত্যাশা করেন না। মনে হচ্ছে একে অন্যের ধর্ম মেনে নিয়েছেন, তাই এখন দাঁড়িয়েছে বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রশ্ন।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈদগ্ধ্য দেশের বৈদগ্ধ্য নিরূপণ করে। ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু বৈদগ্ধ্য আর ধর্ম এক জিনিস নয়, সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে। অদ্যকার ইংরেজ, গ্রিক এবং রোমান বৈদগ্ধ্য স্বীকার করে নিয়েছে, এখনও প্রতিদিন সে তার সাহিত্য, নাট্য, অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রিক এবং লাতিন বৈদগ্ধ্য থেকে চেয়ে নিয়ে আপন বৈদগ্ধ্য সমৃদ্ধ করে— কিন্তু সে গ্রিক এবং রোমান দেবদেবীর পুজো করে না, অর্থাৎ গ্রিক এবং রোমান ধর্ম স্বীকার করে না। আমরা মোন্-জোদড়োর সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু আজ যদি সপ্রমাণও হয় যে, মোন্-জোদড়োবাসী ইঁদুরের পুজো করত, কিংবা নরবলি দিত, তাই বলে আমরা এসব কর্মে লিপ্ত হব না।

এইখানেই আমাদের সমাধান। হিন্দুধর্ম ধর্ম— ধর্ম হিসেবে সম্মানিত হবে, বহু হিন্দু তাঁদের জীবনের চরম মোক্ষ বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ পদ্ধতিতে পাবেন (কোনও কোনও অহিন্দুও পাবেন— যেমন মনে করুন, জর্মন শোপেনহাওয়ার উপনিষদকেই আপন জীবনমরণের কাণ্ডারী বলে ধলে নিয়েছিলেন) কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা দেখব বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ (এমনকি নজরুল ইসলাম) পর্যন্ত আমাদের বৈদগ্ধ্য-ভাণ্ডারে কে কী কী সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন?

www.pathagar.com

এই সুদীর্ঘ চার হাজার বৎসরের ইতিহাসে বহু অ-হিন্দু আমাদের বৈদগ্ধ্যে অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আমরা গ্রিক (যবন— আয়োনিয়ান), ইরানির কাছ থেকে জ্যোতিষ এবং ভাস্কর্যের (গান্ধার-কলা) অনেক কিছু শিখেছি এবং যুগ যুগ ধরে বহু মানবের কাছ থেকে নিয়েছি ও দিয়েছি। এই দিয়ে আমাদের বৈদগ্ধ্য গড়া হয়েছে (সুবোধ ঘোষের *আনন্দবাজারের* স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ধর্মের এই বৈদগ্ধ্যগত মূল্য সম্যকরূপে বোঝার জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রের অনুপ্রাণিত অন্য সব পুস্তক অধ্যয়ন। তা না, আজ যেরকম বহু স্থলে হচ্ছে— এবং পণ্ডিতজি এই জিনিস থেকে আমাদের সাবধান করছেন— বহু বিবেকহীন লোক ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সবাইকে ওস্‌কাবে।

তাই আজ একবাক্যমনে ভারত ভাগ্যবিধাতাকে নমস্কার করি, যিনি পাঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাত-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রিস্টানকে সম্মিলিত করেছেন — সেই দেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পুনরায় ভারতের সর্ব ধর্মবিশ্বাসীকে আহ্বান করি—

মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।

দুই

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী মহানগরী দিল্লিতে সাড়ম্বরে সমাধান হল। বিস্তর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, তরো-বেতরো কামান, বন্দুক, রাজপুত মারাঠা গুর্খা শিখ সৈন্যবাহিনী, নৌবহরের অফিসার-মাল্লা-খালাসি, রেডক্রস-নার্সিং ও ইত্যাদির বহুসহস্র লোক বহুতর ব্যান্ডবাদ্যি বাজিয়ে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানানোর পর এক দীর্ঘ মিছিল বানিয়ে শহরবাসীকে তাক লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝাঁক জঙ্গিবিমান বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎগতিতে মাথার উপর দিয়ে আকাশের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে উড়ে গেল।

প্রাচীন যুগের লোক— কাণ্ডকারখানা দেখে আমার তো পিলে চমকে গেল। বাপরে বাপ— শান্তির সময়ই যখন এদের এরকম চেহারা তখন লড়াইয়ের সময় না জানি এরা কীরকম মারমুখো হয়ে ওঠে।

আমাদের কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। আমার মতো আরও পাঁচটা লোক যে এরকম ঘাবড়ে যাবে সেকথা তাঁরা আঁচতে পেরে তাপ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের প্রতীক সম্বলিত একখানি মোলায়েম মিছিলের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন।

কোন প্রদেশ আপন সংস্কৃতির কী প্রতীক বেছে নিয়েছিলেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে— আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। ছবিও বেরিয়েছে, কাজেই ভালোমন্দ বিচার করতে কোনও অসুবিধে হবে না।

www.pathagar.com

আমি কূপমণ্ডূক বাঙালি, বাংলা দেশ নিয়েই আমার কারবার।

বাংলা দেশের প্রতীকরূপে সরস্বতী পুজোর নকশা এই মিছিলে দেখানো হয়েছিল। দিল্লির খবরের কাগজগুলোকে আগের থেকে বলা হয়েছিল, বাংলা দেশ বাণীর সাধক, তাই বাংলা দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার স্বরস্বতী পূজা।

মনে বড়ই গর্ব হয়েছিল। কারণ বাংলা দেশ সম্বন্ধে রায় পিথৌরা এখনও যেটুকু আশ্বাস মনের কোণে পোষণ করে সেটুকু তার বিদ্যাচর্চা নিয়ে। যেদিন এইটুকুও যাবে সেদিন বাজার শেষ।

বাঙালির বেশির ভাগ বেকার, চাকরিতেও সে অন্য প্রদেশের কাছে মার খায়, বাংলার মোটা মোটা ব্যবসা কে করে, সেকথা তুলে নিরর্থক প্রাদেশিক বিদ্বেষ জানাতে চাইনে, দিল্লিতে বাঙালি কল্কে পায় না, সুভাষের পর বাংলা দেশে নেতা জন্মাননি, কত লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় আছে তার হিসাব নিতে মন বিমুখ। 'তথাস্তু বলিয়া দৈবী কৈলা বরদান। দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥' পোড় খেয়ে খেয়ে নাস্তিক মন এ বাক্যে আর বিশ্বাস করে না, কিন্তু একটি সত্যে এখনও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, বাংলা দেশ এখনও বিদ্যার সম্মান করে।

রায় পিথৌরা গর্দিশের ফেরে দিল্লিতে বাস করেন। যে কালাপানির নামে বাঙালি একদিন ভিরমি যেত সেই কালাপানিতেই যখন আজ বাঙালি পেটের ধান্দায় মাথা কোটে তখন দিল্লিবাস তো স্বর্গবাস। তবু বলি, ওয়ারি-বালিগঞ্জে মিলে যদি একদিন আন্দামানকে দ্বিতীয় বাঙলা বানাতে পারে তবে আমি দিল্লি ত্যাগ করে সেই কালাপানিই যাব।

দিল্লিকে নমস্কার। এখানে সবকিছু আছে অস্বীকার করিনে— ইস্তেক বাঙালিবল্লভ ইলিশ মাছও পাওয়া যায়। এখানে পারমিট পাওয়া যায়, এম্বেসি-লিগেশনে ঘোরাঘুরি করলে দাওয়াত পাওয়া যায়, চোখ-কান খোলা রাখলে 'ফরেন' যাবার মোকাও মেলে, শুবো-সাম মিটিঙ-মাটিঙ যখন লেগেই আছে তখন একটুখানি তত্ত্বতাবাশ করলে সভাপতি হয়ে কাগজে ছবি তোলানো কঠিন কর্ম নয়, আরও কত কী আছে সেসব কথা ফাঁস করে দিয়ে আমি খামোখা কম্পিটিটর বাড়াতে চাইনে।

কিন্তু বিদ্যাচর্চা— রামচন্দ্র!

বিদ্যার বাহন বই। গুণীরা তাই আজীবন বই জমান। এখানকার গুণীরাও বই জমান— তবে সে বই চেকবই।

দিল্লিতে বিদ্বান নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দিল্লিতে বই নেই। এখানকার বিদ্বানরা তাই, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের দল।

এক হিসেবে ভালোই। এখানে এন্তার বিদ্যাচর্চা থাকলে মূর্খ রায় পিথৌরা দু মুঠো অন্ন কামাত কী করে? অ্যাদ্দিনে তার সব 'পাণ্ডিত্য' ফাঁস হয়ে যেত আর কুলোর বাতাস খেতে খেতে কহাঁ কহাঁ চলে যেতে হত।

কী বলতে গিয়ে কোথায় এসে পড়েছি।

বাংলা দেশ বাণীর সেবা করে সেকথা তো মানলুম— তা সে না হয় আজকের দিনে নোটবুক মুখস্থ করেই হোক।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে আমার মনে হল, এই প্রজাতন্ত্র সফল করার জন্য বাঙালি যে কতটা আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বলেছে তার খবর বোধহয় অবাঙালিদের একটুখানি জানানো উচিত।

বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এরকম মহাত্মা বাংলার বাহিরে বোধহয় বিস্তর জন্মাননি। কী কৌশলে এঁদের নিয়ে দ্রষ্টব্য রসবস্তু নির্মাণ করা যেত বাঙালি শিল্পীরা সে কথাটি এই বেলা ভেবে রাখলে ভালো হয়।

আসছে বছরও তো এই পরব হবে।

* * *

লাহোর-রাওলপিন্ডিতে নাকি গুটিকয় 'চিরকুমার সভা' অর্থাৎ 'ব্যাচেলরস্ ক্লাবের' গোড়াপত্তন করা হয়েছে। সদস্যদের আদর্শ আমরণ অবিবাহিত থাকা; কেউ যদি কোনও কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে সন্মার্গভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করে তবে আর পাঁচ ভাইয়ের কর্ম হবে তখন তাঁকে সে রমণীর কেশ-পাশ নাগ-পাশ থেকে আজাদ করা।

বিবাহ-প্রস্তাবকে যখন সর্বোত্তম প্রস্তাব বলা হয় তখন এ প্রস্তাবটিকে আমরা অত্যুত্তম প্রস্তাব করে মেনে নিচ্ছি। বিশেষত যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সব মহাজনরাই জানেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। চিরকুমার অনেককে এমনিতে থাকতে হত— ক্লাব বানিয়ে চেল্লাচিল্লি করে যদি 'নেসেসিটি'কে 'ভার্চু' বানানো যায়, বাংলায় যাকে বলি— 'উড়ো-খই গোবিন্দায় নমঃ' তা হলে হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভেঙে কার কী ফয়দা?

উঁহু, সেটি হচ্ছে না। একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উল্টো ক্লাবের পত্তন করেছেন ছোকরাদের বাউণ্ডুলোমি থেকে খারিজ করে 'কবুল', 'কবুল', 'কবুল' বলাবার জন্য— এ ক্লাবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা আছে কি না সে খবর এখনও আমরা পাইনি।

এঁদের বক্তব্য, 'ইসলাম চিরকৌমার্য সখ্‌ৎ না-পছন্দ করে; বিয়ে না করলে মুসলমান মুসলমানই নয়, এসব অনৈসলামিক কায়দা-কেতা— পাকিস্তানকে না পাক করে ফেলবে।'

শুনে তাজ্জব মানলুম।

বিয়ে করতে চাইলে সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ কুরান শরিফে আছে; কিন্তু কেউ বিয়ে না করতে চাইলে কুরান তো তার ওপর কোনও অভিসম্পাত দেননি। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া, পরকীয়া, আল্লাকে অস্বীকার করা এসব অপকর্ম যে 'গুনাহ' সেকথা কুরানে স্পষ্ট লেখা আছে, এমনকি এসব কর্ম করলে ইহলোকে এবং পরলোকে তার কী সাজা সেকথাও সবিস্তর বয়ান করা হয়েছে কিন্তু শাদি না করা গুনাহ (পাপ) একথা তো কুরানের কোথাও নেই। তা হলে যে লাহোরে মুরব্বিরা বললেন, বিয়ে না করা অনৈসলামিক সেটা তাঁরা পেলেন কোন বগল-নামা থেকে?

মুরুব্বিরা হয়তো বলবেন, 'আরে বাপু, কুরানেই কি সব কথা লেখা আছে? সেই যে নিত্যি নিত্যি পাঁচ বকৎ নেমাজ পড়ছ সে কথাই কি আর কুরানে পষ্টাপষ্টি লেখা আছে?— আছে "হদিসে"। কুরানের পরে রয়েছেন "হদিস"— "হদিস" ভি মানতে হয়।' শ্রুতির পর যেরকম স্মৃতি, কুরানের পর তেমনি হদিস— না মেনে উপায় নেই।

বুখারি (আমাদের যেরকম মনু) সাহেব যে হদিস সঞ্চয়ন করেছেন তাতে মহাপুরুষ মুহম্মদ কখন কাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন তার উত্তম বর্ণনা রয়েছে। আরও অনেকেই

www.pathagar.com

করেছেন, কিন্তু বুখারি সাহেবকেই এ বাবদে সবচেয়ে বেশি মান্য করা হয়— কি লাহোর, দিল্লি, কি কাইরো, কি মরক্কো, সর্বত্রই।

বুখারি সাহেব বয়ান করেছেন, 'একদা এক দীন মুসলিম মহাপুরুষ (মুহম্মদ) সমীপে আগমন করতঃ নিবেদন করল, "হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ, এই অধম অতিশয় অর্থহীন। স্ত্রীধন প্রদান করিয়া বিবাহ করিবার ক্ষমতা আমার নাই— অথচ আমি কামাগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতেছি। অনুমতি করুন, আমি অস্ত্রোপচার করত ক্লৈব্যাবস্থা প্রাপ্ত হই।" মহাপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "না। তুমি উপবাস কর এবং আল্লাসমীপে অহরহ প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমার মুশকিল আসান (সরল) করিয়া দেন।" '

পূর্বেই নিবেদন করেছি, লাহোর-পিন্ডিতে মেয়েছেলে পুরুষের তুলনায় কম। চিরকুমাররা অবশ্য বলেছেন, তাঁদের অর্থাভাব বিয়ে না করার অন্যতম কারণ। এঁদের যুক্তি ও যে ব্যক্তি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিল তার যুক্তি একই। সর্বাব্যবস্থাতে বিয়ে করা যদি চরম কাম্য হত তবে মহাপুরুষ নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করতে আদেশ দিয়ে বলতেন (মুরুব্বিরা সচরাচর যেরকম বলে থাকেন), 'রুটি দেনে-ওলার মালিক খুদা, তিনিই পেট দিয়েছেন, তিনিই রুটি দেবেন। তুমি বিয়ে কর।'

অর্থাভাব থাকলে চুরিচামারি করে বিয়ে করা অনুচিত সেকথা মহাপুরুষ মেনে নিয়েছিলেন— লাহোরের মুরুব্বিরা মানছেন না। তাই বোধহয় শাস্ত্রে বলে ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।

আর যদি বলা হয়,

'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন' ইত্যাদি— তা হলে নিবেদন, যে খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া সম্বন্ধে গত সপ্তাহে নিবেদন করেছিলুম, তিনি এবং অধিকাংশ সুফিই চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করে মহবুব-ই-ইলাহি (ব্রহ্মবান্ধব) উপাধি লাভ করেছিলেন।

তিন

বোম্বায়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামর জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা— এমনকি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে,

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনির মাইয়া!'

যতরকমের খাজনা হতে পারে, যতপ্রকারের ন্যায্য-অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে, সবই তো চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে টাকা জমা হচ্ছে— এবং তার বেবাক খরচ

www.pathagar.com

হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনির মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলোই বা চালু রাখি কোন কৌশলে?

* * *

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নতুন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়। খুলে বলি—

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোনও বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভালো পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ-বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে কোনও সময় আপনি সে গ্রামে গিয়ে যদি হিসাব নেন, কটি ছেলে লিখতে-পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশি না, বাদবাকি আর সবাই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি এখনও কেঁদে-কুকিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি— মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন— আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একথাও ভাবিনে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী? এরা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মতো কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা-মজুর আমাদের মতো গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টান্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবরে সবরে হয়তো একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণকাহিনী পড়ে, চাষা বাড়িতে না থাকলে হয়তো তার হয়ে চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়— আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কেনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে চাষা কোনওগতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাশের সময় একখানা *রামায়ণ* কিংবা *মহাভারত* কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওতাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দিভাষীদের তুলসীরামায়ণ পড়ে সে লাভ হয় না, কারণ তুলসীর ভাষা আর আধুনিক হিন্দিতে প্রচুর তফাৎ। তুলসীর ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না— কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশি পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন, মুসলমান চাষা পাঠশালা পাশের পর খুব শীঘ্রই নিরক্ষর হয়ে যায় কারণ সে *রামায়ণ-মহাভারত* পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এরকম ধরনের সহজ সরল মুসলমানি ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কীরকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

www.pathagar.com

তা হলে ওষুধ কী?

যে উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন গৌরী সেন? সরকার তো দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নতুন স্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া— বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ সমস্যা নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত-অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি— তারা এ সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোনও ভালো ওষুধ এখনও খুঁজে পাইনি। আমার পাঠকেরা যদি এ সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

* * *

অন্য এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়দের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল ডিরেকশন্' দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম, সেই সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই 'রিলিজিয়াস' বলতে চাননি— তা হলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত— তাই মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে, তিনি আত্মার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা— এবং এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদ আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রদের ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করাতে পারেন, সে বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এবং মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই— যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা সৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজিতে, আর মেরে-কেটে দু ভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে তো আর জোর করে বিএ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারিনে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃতে অনার্স গ্রাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওলটাতে আপনি-আমি দেখেছি। সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গতান্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্য-চর্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিত্তির।

আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র অলঙ্কার বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের

www.pathagar.com

দোকানগুলোতে, যেসব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে। আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছে হবে, অথচ অনুবাদ নেই— তার হিসাব করবে কে?

হিন্দিওলাদের তো আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ সাহিত্য অনেক বেশি কমজোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দি বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতোই চক্কর লাগাই— আজ পর্যন্ত কোনও সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দি অনুবাদ চোখে পড়ল না যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠি ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতিতে তারও কম। আসামিতে তো প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানিনে— তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ তো দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর— অর্থাৎ অধ্যাপকদের ওপর। কিন্তু হায়, তাঁদের তো দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপ-রাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন?

চার

কলকাতাতে বর্ষা-বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রার কোনওপ্রকারের ফের-ফার হয় না। হৈ-হুল্লোড়, পার্টি-পরব, কেনা-কাটা, মারামারি একই ওজনে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু— গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এন্তার দাওয়াত, নেমন্তন্ন, দিনে দশটা করে মিটিং, হপ্তায় দুটো করে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু য়েহুদি মেনুহিন, আর একগাদা সঙ্গীত সম্মেলনে, কবিসঙ্গম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ সবকিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যেসব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সেসব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে 'রিসেপশন' দেন, আর সবাই শার্ক ফিন আর কালো বনাতের মধ্যিখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জৌলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বত ঘুরতে গেছেন— পার্টিতে যদি রঙ-বেরঙের শাড়ির বাহারই না থাকল তবে সে পার্টি অতি নিরামিষ (নিরম্বু তো বটেই, এসব পার্টিতে জল মানা) তাই পাঁচজন পার্টি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী।

পুরানি দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্য কোনও না কোনও পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগধিরিঙে লাউড-স্পিকার ঝুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয়, তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে— দরজা-জানালা বন্ধ না করে একে অন্যের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এরকম একটা অভিনন্দন পার্টিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দু জনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনিনি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তা-ও বলতে পারব না।

www.pathagar.com

দু জনারই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিদ্যেসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না।

'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে বিদ্যেসাগর মহাশয় লিখছেন—

'আমি এস্থলে— নাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী— মোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিকারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একেবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না; এবং ওই উপলক্ষে দুজনে হুড়াহুড়ি ও গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভালো দেখায় না। এজন্য আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী আমার এই পক্ষপাতহীন ফয়তা* ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তার যেরূপ মরজি হয়।'

* * *

নিত্যি নিত্যি কারণে অকারণে হৈ-হুল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালির ওপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্য সভা, কাল ওখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব 'পরব' হয়। এবং অনেক সময়ে মনে হয়েছে, এসব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমতো হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে 'স্টাডি সার্কল' বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কৃতকার্য হতে পারিনি। আমার বয়স হয়েছে, তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয় অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসেবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়বে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকাররাও পান— সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে।

আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদের অভাব তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করিনে।

---

* 'চলন্তিকা' 'ফয়তা এবং ফতোয়া' শব্দে পার্থক্য করে অর্থ দিয়েছেন; 'ফয়তা (আরবি ফাতিহহ)— মুসলমান ধর্ম অনুসারে উপাসনা'— এবং 'ফতোয়া (আরবি ফৎবা)— মুসলমান শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা। কাজীর রায়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু সর্বদাই 'ফয়তা' শব্দ ব্যবহার করেছেন ফতোয়া অর্থাৎ 'বিধান' 'রায়' অর্থে।

www.pathagar.com

তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্য কিছু করে উঠতে পারিনি অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

* * *

দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মতো একটি জিনিস বড্ড বেশি গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আর্ট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেনুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দিন সায়েবকেও হাততালি দেন, এঁরা ভরতনাট্যম আর মণিপুরি নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের 'জ্ঞানের' অন্ত নেই।

এঁদের একজন তো সবজান্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই— পারলে আমিও ওঁর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভদ্রলোকটি বড়ই বাংলা এবং বাঙালি-বিদ্বেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে 'বেঙ্গল স্কুল' গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন। তাঁর মতে যামিনী রায়, যামিনী রায় এবং আবার যামিনী রায়। বাংলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রদ্দি। নিতান্ত 'প্রাদেশিক' বদনাম থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

ইনি যেসব 'আর্ট-সমালোচনা' প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যাঁরা এসব জিনিসের সত্য সমঝদার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের সুসন্তানদের কীর্তি বারবার স্বীকার করা। 'ডেকাডেন্স' বা 'গোল্লায় যাওয়ার' অন্যতম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনগণকে অস্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ জাতীয় লেখাকে 'পোলেমিক' বলে— বাংলায় 'মসীযুদ্ধ' বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্য সম্পদ আছে। ভারতচন্দ্র পদ্যময় পোলেমিক, আর বাংলা গদ্য তো আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন তো কলমের লড়াই লড়লেন হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সর্বসম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিদ্যেসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে লেখা লিখতে পারলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইনজীবী নিজেকে ধন্য মনে করবেন— অধমের মতে পোলেমিকে বিদ্যেসাগর মশাই মিলটনেরও বাড়া। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তার উদাহরণ তো আপনারা একটু আগে 'অর্ধচন্দ্র' দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তার পর তিন নম্বরের মল্লবীর বঙ্কিম। তিনি হেস্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে তো অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বঙ্কিম এ মসীযুদ্ধে, এবং এ সত্যও আজ অস্বীকার করব যে, আজ যদি কোনও হেস্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ওরকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বঙ্কিমের কথা হচ্ছে না— সে সাহিত্যিক যে নেই যে কথা স্কুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাংলা দেশে নেই।

তার পর রবীন্দ্রনাথ; তিনিও তো কিছু কম লড়েননি। তবে তাঁর রুচিবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁঝ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী ঘেন্না!

www.pathagar.com

গল্প শুনেছি উর্দুর কবিসম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক্ সাহেবের একটি দোহা এক মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বারবার জওক্‌কে তসলিম করে বলেছিলেন, 'আপনি দয়া করে আপনার ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে যে কোনও পোলেমিস্‌ট্ তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোল্লাসে প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে যুগের আর যে কোনও লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোদ্ধা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন। আর কেনেনইনি বা কী করে বলব? তাঁর 'নারীর মূল্য' পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই।

ধর্মে বিবেকানন্দ পোলেমিস্‌ট্, ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

* * *

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালি এইসব ভুঁইফোড় 'আর্ট ক্রিটিক'দের জোরসে দু কথা শুনিয়ে দেন না কেন?

পাঁচ

চীনের সহিত ভারতের লুপ্ত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র পুনরায় স্থাপনা করিবার জন্য যে চৈনিক-বিদগ্ধমণ্ডলী ভারতে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত টিং সি-লিন ও শ্রীযুক্ত ফুঙ য়ু-লনকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় স্বহস্তে উপাধি এবং প্রশস্তি প্রদান করেন। দিল্লি নগরীর তাবৎ গুণীজ্ঞানী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত সি-লিন বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অর্বাচীন চীন বিজ্ঞানচর্চায় কী প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং পুনঃ পুনঃ সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, চীনের সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জনগণের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইতেছে। শ্রীযুত সি-লিন স্পষ্ট বলেন নাই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারত যদি এই উত্তম উদাহরণ অনুসরণ করে তবে 'জন-গণ-মন' অধিনায়কের শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক এবং সফল প্রশস্তি গীত হইবে।

শ্রীযুক্ত য়ু-লান দার্শনিক। বক্তৃতারম্ভেই তিনি বলেন, যে প্রদেশে তাঁহার জন্ম সেই প্রদেশেরই এক সজ্জন বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ত্রি-রত্নের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। ভারত তখন তাঁহাকে প্রচুর সম্মান দেখাইয়াছিল এবং অদ্যকার সম্মানে শ্রীযুক্ত লান সেই সুবর্ণযুগের কথা স্মরণ করতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে এ সম্মান তাঁহাকে নয়, তাঁহার দেশবাসীকে প্রদর্শন করা হইতেছে।

তৎক্ষণাৎ আমার মন ফা-হিয়েন ও হিউয়েনৎ সাঙের স্মরণে দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া প্রাচীন ভারতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইল। মুদ্রিত নয়নে দেখিতে পাইলাম রাষ্ট্রপতি যেন শ্রীশ্রীরাজামহাধিরাজ হর্ষবর্ধনের বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান

www.pathagar.com

পরিব্রাজক হিউয়েনৎ সাঙ। কোথায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনগৃহ যেখানে মাত্র পঞ্চশত নরনারী উপস্থিত? যে প্রয়াগ সম্মেলনে হিউয়েৎ সাঙ উপস্থিত ছিলেন সেখানে পঞ্চলক্ষাধিক নরনারী উপস্থিত থাকিয়া মহাযানের গুণকীর্তন ও শ্রবণ করিয়াছিল। হায়, কোথায় অদ্যকার পঞ্চশত আর কোথায় সেদিনের পঞ্চলক্ষ!

এবং সেদিন ভারতে নিষ্ঠা ছিল, বেদ-চর্চা ছিল এবং ত্রিশরণ-প্রচলিত সত্য ধর্মের অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারী ধন-প্রাণ নিয়োজিত করিত। হিন্দু বৌদ্ধ, জৈনধর্ম এবং দর্শন তখন যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা আজিও বিশ্বজনের বিস্ময়ের বস্তু। সিংহল, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয় ও চীন হইতে অগণিত শ্রমণগণ ভারতে শাস্ত্রের অনুসন্ধানে আসিতেন। দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্ব স্ব ভাষায় শাস্ত্ররাজির অনুবাদ করিয়া জীবন ধন্য গণ্য করিতেন।

আর আজ বিরাট দিল্লি নগরীতে একটিমাত্র শিক্ষায়তন নাই যেখানে বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়, পালি শিখিবার কোনওপ্রকারের ব্যবস্থা এই মহানগরীতে নাই। অত্রস্থ মহাবোধি প্রতিষ্ঠান অনাদৃত।

* * *

চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলী এই দেশে আসিবার সময় বহুশত চিত্র ও অন্যান্য কলাসামগ্রী সঙ্গে আনিয়াছেন। এক বিশেষ চিত্র-প্রদর্শনীতে সেই ছবিগুলি রাখা হইয়াছে এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রদর্শনীতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু তুন-হুয়াঙ গুহাচিত্রের প্রতিকৃতি। এই চিত্রগুলি অজন্তা বাঘ প্রভৃতি গুহাতে যে বিষয় ও শৈলীতে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাদের প্রভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নিতান্ত অজ্ঞজনও এক দৃষ্টিতেই সে তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিজ্ঞজন চিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিয়া যে কত শত নব নব তত্ত্ব এবং তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন তাহা কিছুদিন পরে তাঁহাদের প্রবন্ধরাজিতে প্রকাশ পাইবে।

যে বিষয়-বস্তু আমার কাছে পরিচিত নহে, যে আদর্শের ঐতিহ্য আমার বৈদগ্ধ্যে নাই সেখানে বিদেশাগত, নবীন বিষয়-বস্তু তথ্য আদর্শ গ্রহণ করি কী প্রকারে এবং আপন কালপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অঙ্গীভূত করিই বা কী প্রকারে।

বুদ্ধের জীবন এবং অবদান চীনের কাছে অতিশয় বিস্ময়ের বস্তু-রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। চীনদেশের আপন মহাজন লাওৎ-সে ও কনফুসিয়ো যে মার্গ দেখাইয়া গিয়াছিলেন সে মার্গগুলি মহান কিন্তু বুদ্ধদেবের সর্বস্ব ত্যাগের নিরঙ্কুশ বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে চৈনিক মহাপুরুষের আদর্শবাদের কোনও সাদৃশ্য নাই। তদুপরি চীন বর্বর দেশ নয়। বহুশত বৎসরের তপস্যার ফলে চীন কলা-প্রচেষ্টায় নিজস্ব শৈলী অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে শৈলী বর্জন না করিয়া এই ভারতীয় শৈলী চীন গ্রহণ করে কী প্রকারে?

তাই আমরা এই চিত্রগুলির সম্মুখে বিস্ময়ে হতবাক হই। স্পষ্ট দেখিতেছি চিত্রগুলি চৈনিক অথচ যেকোনো বিশেষ অংশের বিশ্লেষণ করিলেই সেখানে অজন্তা দেখিতে পাই। ওই তো সব বিষধর সর্প, ওই তো করালদংষ্ট্রা রাক্ষসের দল, পশ্চাতে শানিত তরবারি হস্তে পিশাচ না কবন্ধ, সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান তিলে তিলে নির্মিত মুনি-মনহরণী তিলোত্তমা-শ্রেণি এবং মধ্যস্থলে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-তথাগত।

এই চিত্র বাল্যকাল হইতে কত সহস্রবার দেখিয়াছি। এই প্রদর্শনীর কল্যাণে তাহাকে আবার 'অজানা-জনের সাজে' চিনিয়া মুগ্ধ হইলাম।

www.pathagar.com

The spirit of Tagore

Let us remember the spirit of the Great Poet with *shraddha*, for the day of *shraddha* has come once again.

The world outside Bengal knows him as the Great Poet, eminent novelist, brilliant short story writer, guru of an educational renaissance, and prophet of international peace and goodwill, but the spirit behind the creative impulse which assimilated the best of the nineteenth century Bengal— the Bengal of Raja Rammohun Roy, Maharshi Devendranth Tagore, Keshab Chandra Sen— and then went forward in search of fresh adventures has never been revealed to the outside world. It is found in the very best poems and songs of the Poet and unfortunately have not been translated into English or Indian languages. Perhaps the translators, including the Poet himself, felt that Odes addressed to the Vedic deities and poems interpreting characters, symbols, situations and ideologies of Indian mythology will not find a sympathetic chord in the Christian heart, for it can hardly be denied that the devotional songs of Tagore which have actually been translated into English are popular in the Christian world on account of their resemblance with the Songs of David and his love songs often run paralleled to the Songs of solomon of the Old Testament.

It is true that the English reading public has a rough idea of Tagore's religious thought through some of his essays but they belong to a period when he had reached only the end of the first stage of his spiritual development which consists chiefly of what he had received from his father, the Maharshi. He speaks of the Brahman as realized by the Upanishadic rishis and reinterprets their vision in his characteristic lyrical style. Being a poet and thus attached to the world and its creatures he rejects Shankara's position of regarding them as mere illusions : for him the seekers of *vidya* only or *Avidya* only both go unto perdition, the Lord is rather to be sought every-where, in the Fire, in Water, in the innermost recess of Creation (*Ye deva agnau yo apsau etc.*), and this vision has to be translated into aesthetic expression. Thus, when he remembers his departed beloved, be sees her everywhere— she is transformed into the greenness of the green vegetation, the azure of the blue sky (*shyamale shyamal tumi, nilimay nil*). Though English translations we know Tagore thus far, and no farther.

www.pathagar.com

He then gives up composing devotional songs addressed to Brahman. One wonders why. The clue is to be found in his next great poem called *Tapobhanga*. It becomes clear to the reader in retrospect that the im personal Brahman lacked the warmth and colour to appease the disire of the mundane heart which yearns to love, the hungry eyes which want to see God— it not the direct vision, at least in the mind, through forms they have already seen on the earth. To which God was Tagore to turn— *kasmai devaya havisha vidhema*?

Bengali poetry is based on Vaishnava traditions. Chandidasa and Vidyyapati, the two great predecessors of Tagore had followed the footsteps of Jayadeva and countless poets after them have also sung the love of Radha and Krishna but nineteenth century Bengal had no great Vaishnava figure like Shri Ramakrishna and Swami Vivekananda who as henotheists had Shakti to the most exalted eminence. Tagore tunrned to Shiva, for, is not Rudra also the Nataraja, and had not the Poet as a small boy learnt from his father to seek the benign face of Rudra for protection— *Rudra yat te dakshinam mukham tena ma'm pahi nityam*?

Tapobhanga is a great poem. In it Tagore sees the Lord of Time deep in *tapas*. It is during these necessary and inevitable periods of *tapas* that the creation becomes dry and shrivels up in the heat (*tapas*), pain, suffering and all the miseries of the world are nothing but the creation of Nataraja's dance and all these find their symbol in the resplendent sufferings of Uma in her separation (*vichchheder dipta duhkhadahe*) caused by Shiva's having withdrawn himself into himself— for is he not the *Yogisha* also? At this stage enters the poet. He calls himself the emissary of the conspiring Heaven (*tapobhanga duta ami Mahendrer*). Shiva wakes up, the auspicious moment of the marriage of the celestial couple has come, smile blossoms forth on the cleeks of Uma in sweet bashfulness (*smita hasya sumadhur laj*). The Lord calls the poet, and taking the flower garland and mangalyas, he joins the seven rishis in the marriage procession (*saptarshir dale, kavi sange chale*). This time it is not Madana, it is the Poet. And what an imagery! Along with the *saptarshi*, on the high firmament, it is the Poet, for the whole universe to gaze at and admire. What a role for all poets of all ages to play!

And then Tagore composed the famous Nataraja Odes. 'Oh, Nataraja, thy matted locks become loose when Thou commences Thy

www.pathagar.com

Pralayadance,' 'Nataraja, break my slumber with Thy dance steps'. (*nrity-er tale tale supti bhangao*). They have the same *motif* as in the *Bharatanritya* song, 'Oh, Lord of Chidamabaram, with Thou not stop Thy chariot at my cottage door for a moment?' Tagore in indebted to South India for his Nataraja cycle. The God is practically unknown as Nataraja in the North.

Tagore passes through several tragic experiences before he reached the third and the final stage. The world knows how the Poet, shaking with age, and rage composed the epistles in defense of India's national heroes, of the correspondence between the two poets, Tagore and Naguchi. It has and inkling also of the Poet's feeling when he saw the World War II shattering to bits the edifice of international peace and goodwill he had been building up but alas, it known nothing of the greatest tragedy of his life—the Indian nation had not come forward to receive his favorite child, the Vishvabharati, As the aged Poet proceeded along the dolorous path carrying his cross, no St. Veronica came to offer him the kerchief to wipe his perspiration and blood. The poet fell under the weight.

He fell seriously ill, and through unbearble physical pain and agony, he saw new visions. He translated them into semi-aesthetic, quasi philosophical verses, loosely knit together and entirely lacking the usual Tagorian finish. He recovered and dictated some more of his recollections and these two collections are called 'Sick-bed' (*roga-shayya*), and 'Recovery' (*Arogya*). His last poems are called 'Shesh-lekha'.

The reader will remember how stoutly Tagore had maintained in his youth that deliverance was not for him through renunciation of world (*of rupa-rasa-gandha-sparsha*) by means of any yogic practice. Now, for the first time, the world, including his body, became nothing but a continuous source of the most excruciating agony. He cried in despair, 'Through pain and pain again, I have realised the world is not unreal.'

Aghate aghate janilam
E jivan mithya nay.

What! Not beauty, not truth, but pain— the Buddhist point of departure—should be the *raison d'etre* of all existence!

There are many such wonders for the reader of the three collections mentioned above. Personally I feel certain, although I cannot prove it except by means of 'aesthetic logic', that Tagore had turned to concentration in the *rajayoga* style at this last phase of his spiritual

www.pathagar.com

experience which alone can explain many of the visions, e. g. those describing his body and mind floating away while the soul watches on, the dumb creatures with masses of inert matter on the eve of the first creation.

The last poem, composed half an hour before the fatal operation, absolves him once again, of the accusation that he was an escapist. 'Thou has scattered on the path of Creation many a deceitful snare, O Deceitful one (*Chhalanamayi*), many a false hope (*mithya-vishvas*)!

This is the final recognition of Untruth, *Per se* by the poet. This brings him closer to the Sankhya system, nearer to Zarathustra who accepted both the principle of Good and the principle of Evil as co-existing from Eternity. In the dynamic process of arriving at a harmony beyond the conflicting diversity of reality, the Poet has covered the entire gamut of all the Indo-Aryan and Indo-Iranian systems of philosophy in aesthetic realizations. This harmony, this *weltanschauung*, this *summum honum* is known to us all in the simple word, 'shanti.'

A letter from India

I am sure when you hear my English accent you will not believe me that I was ever in England, but it is Allah's truth that I spent several months there— 'believe it or not' as the Americans say. But then I spent most of my time in the Reading Room of the British Museum where hailing each other across the tables and discussions on weather in general and the one prevailing in London in particular are not very highly appreciated. Indeed, I should say even in the House of Commons you get better opportunities to improve your conversational English than in the British Museum.

But that is not the point, any way. What I mean is that if it was possible for me to visit England, why should you not be able to come to this country next winter? Now, do not suspect me as being the representative of a tourist organisation, hotel keeper or a guide. I am suggesting the trip for, I really believe, having seen many of the winter resorts of Europe that India is worth visiting in winter.

Naturally the first question you will ask is what we have here to offer you?

www.pathagar.com

Well, to begin with the weather. Right from the beginning of October till, let us say, the middle of March you will have nothing but bright sunshine, a deep blue sky with a few white clouds once in a while, nice comfortable warm days and slightly chilly nights when all you need is a warn pull-over even for going out for a stroll by moon-light. It may rain for a day or two during this period which will be quite a pleasant change and you will have the experience of what is called warm rains in the East.

Are you interested in architecture? Well, Delhi is the Mecca of architecture. There are at least five distance architectural styles to be seen here which will take your breath away. The Kutb Minar is supposed to be the most graceful tower in the whole world and Fergusson considers it to be superior to Giotto's campanegla. The remains of the Quwwat al-Islam mosque just near the kutb, built from the remains of ancient Hindu temples with its noble arches and delicate ornamentations on the stone walls, the spandrels with medallions of lotus-motif, the forts of the Tughlus with massive walls, sometimes as much as sixty feet deep, which loom large against glorious sunsets every evening, the noble but sweet Humayun's tomb built in red stone and white marble, the audience halls in the Red Fort and finally the Taj Mahal at Agra— only an hundred and twenty miles far from Delhi.

I assure you, it will not merely mean looking at a few beautiful buildings, it is much more than that. Let me explain.

You have all heard of the rich literatures of the East, Sanskrit, Arabic, Persian and Chinese but where has the average European time or opportunity to learn one or more of these languages to enjoy them?— The same as we have no time to learn Greek, Latin, French or German. Architecture and painting make up this loss to a considerable extent. As you go from building to building chronologically you see for yourself how the architects and their patrons conceived of beauty in their life and how they tried to transform into stone and morter through arches, domes and pillars, how one artist failed to solve a difficult aesthetic problem, and how after several attempts a more gifted artist finds the way out, how rebels suddenly appear in the field and violently reject everything of the past, and then, as it were, comes a fresh renaissance and finally masters who assimilate every achievement of the past and make a new anthology of the most beautiful pieces of architecture.

www.pathagar.com

It is precisely as if you are following from the birth of a literature till its developed state.

And what strikes me as most important is the fact that you are not merely reading books, you are not merely seeing buildings but you are coming into the closest touch with the minds and hearts of a people and then, you come to the grand discovery, how alike they are, all over the world. You, who are accustomed to a certain type of architecture in your country, will realize how, inspite of the difference in styles and execution, the aesthetic ideals are the same and how the artists all over the world have tried to come nearer to the supreme realisation of Beauty which is Truth.

I have been speaking of Delhi, a city which I love not only because of its architecture but for many more things.

For example I love the lazy, comfortable way our bazars are run. No one is in a hurry— the philosophy of our bazar people appears to be, 'why be in a hurry when life is so short, take it easy.' If you are a stranger in shopkeeper may try to save some of your precious time but if you happen to be one of the 'regulars' Allah protect you! He will ask you about the health of every single individual of your family— there is no question of your cutting him short— offer you tea which the boy will take ages to serve. In the meantime three customers have come and gone and you are nowhere near your purchases. At long last he produces the perfumes you want to buy for your son's wedding. He warps up a little fine cotton on a tiny piece of wood and soaks it in the *attar*— scent— and says with a sigh that our last Emperor Bahadur Shah could not live for a day without it. Now you have not got the purse of the Emperor, so you get worried as to what the price will be like. He sighs again and produces an second variety in the same process and reminds you that this was the favorite of Her Majesty, the Empress. 'Alas', he adds, 'who are the people now that care for such refined delights— you are one of the very few—, the market is flooded with cheap scents from all over the world. May Allah hasten my death, he prays so that I may disappear before the aristocratic *attars* vanish from this world.'

Meanwhile, as far as prices are concerned, our aristocrat 'at business table' does not appear to be a great believer of 'vanity of Vanities, all is Vanity', At the rate he is making profit, he need not die for another

www.pathagar.com

thousand years. Even if all attars disappear from the world he should be able to live happily on the profits he has already made.

It is the nose which enjoys the attar, no wonder you pay through your nose.

That reminds me, the heavy smell of oven-baked chickens had entered the same nose through all the powerful age-old attars. What, you have not heard of oven-baked chickens, commonly known as tandori-murghi in Delhi? Why, in that case you must positively undertake a pilgrimage to India. I am told, some of your great men went round that world to prove that it was round— the discovery of an oven-baked chicken is most emphatically a million times more laudable task. You will go down in history as the first European who brought to England the delicate *chicken a la oriental, chicken des Hindus, poulet au Delhi n'importe quoi,* according to your knowledge of French or absence of it.

I shall not tell you how it is made. 'Come to Switzerland and see Davos', they say; I shall say, 'come to India and see how a *poulet au Delhi* is made.'

It is not a chicken, it is a dream. Forget the Taj Mahal and the *Kutb* Minar... you cannot eat them. The *poulet* will melt in your mouth like butter, its aroma will give you greater delight then the sweetscented tresses of your beloved and finally it will bring the same bliss, the same *summum bonum,* in our language *moksha and nirvana* which extremely complicated religions practices alone can bring.

That might remind you of death, for you might have heard that *nirvana* comes after death. That is not true, for one of our poets has said, 'If I cannot get *nirvana*— salvation— in this life when I have command on actions what chances have I to get if after death?'

And even if death overcomes you due to excesses in *poulet au Delhi,* never mind. I shall quote another scripture, this time in pure Sanskrit, to prove my thesis. I am afraid I shall have to twist it slightly, but then that is precisely what all scholars do; it is the laymen, the uninitiated the rustic who goes by the literal meaning of scriptures.

The quatrain says,
'Parannam prapya, Durbuddhe,
Ma praneshu dayam kuru,

www.pathagar.com

Parannam durlabham loke,
Pranah janmani Janmani.'

'Eat, eat, to they full, o, man of little knowledge,

And do not show any mercy for your life,
For you come across cheap exotic food rarely in life,
But life will be given to you by God free of cost
every time you are born.

Let me remind you that we Indians believe in rebirths. We believe that we come to this earth again and again till we have reached perfection.

So then, if you do not come to India, inspire of all the pleadings, I have made on her behalf, this winter or in this life, I pray, you may be born in India in your next birth.

What is in a name?

There appears to be little doubt that India is going to be divided soon, but at the same time there appears to be a lot of confusion in the public mind about the name to be given to the Non-Pakistan area.

Some are in favor of 'India', others again are suggesting 'Hindustan' (or 'Hindusthan'). Some are indifferent like Shakespeare who thought that a name did not matter at all, others are keen on a proper choice and cite Tagore who considered it all important and pointed out that if Draupadi, the proud possessor of five heroes as husbands (panchavira-patigarvita), had been named Urmila, her resplendent kshatriya womanhood would have been hurt at every step by this soft and tender name.

We agree with Tagore not because we are thinking in aesthetic terms, but because in addition to his artistic argument there are a few philological and historical arguments which have to be considered before we arrive at a decision.

Philologists have pointed out that the ancient Iranians changed their 's' to 'h' at an early stage of their linguistic development with the result that our 'asura' became their 'ahura' which is the first part of Ahura-Mazda; precisely in the same manner the river 'Sindhu' became ' Hindu', 'Hindo',

www.pathagar.com

and 'Hind' to which was added the word 'stan', meaning 'land' which again is cognate with Sanskrit 'sthana'. (It will be remembered that like all other non-Indian Aryans, the Iranians lost their aspirates at an early stage— cf. 'ph' in 'philosophy' which is pronounced as a fracative 'f'— with the result that 'sthan' became 'stan' in the Iranian languages). Hindustan thus came to mean the 'Land of the Indus.'

The Arabs turned in into 'Hind' and used it as a general appellation for the whole of India. They still call all Indians, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindi' of which the plural is 'Hunud', a term, which surprisingly enough, is occasionally used by Indian Muslims in referring contemptuously to the Hindus.

The Greeks had lost their aspirates by the time they learnt the word from the Iranians and consequently took it as 'Indos' (in modern Greek the 'd' is pronounced soft, almost wet, as 'th' in the English 'this') which gave birth to the English 'India', French 'L' Inde', German 'Indien', etc.

Columbus thought that he had discovered India and it caused considerable confusion which persists in the European languages to this day.

Thus the German, for example, calls our county 'Indien', the people 'Inder', but another word from the same root 'Indianer' is used to designate the Red Indians. During my stay in Germany, I had often great difficulty in explaining to elderly German gentlemen that I was an 'Inder' not an 'Indianer'. To them both names meant very much the same.

The French call India 'L'Inde', but the people, irrespective of the fact whether they are Hindus or Muslims, 'Hindou'. I have often been present in 'scences' where the young Muslim from India was indignantly maintaining that he was not a Hindu but a Muslim and the Frenchman trying in vain to explain that he was not referring to his religion but his nationality. Some Frenchmen coin a new word 'Brahminist' to designate the Hindu by religion. The word 'l'indien' applies to the Red Indian.

The American follows the Frenchmen. He calls our country 'India' all right but terms us all as 'Hindus'. Thus it happened, some years back, when American papers announced that 'One abdur Rahman, a Hindu, was arrested for having landed in the States without a passport.' When this news item was reproduced in India we had a hearty laugh at the Yankee's ignorance but of course the American papers were not referring to the religion of Abdur Rahaman but to his nationality.

www.pathagar.com

Will it be wise to increase the confusion at this state by giving the appellation Hindusthan to India? Already the wrong impression is gaining ground in Europe and America that Pakistan contains only Muslims : if we start calling the rest of India by the name Hindusthan we are bound to strengthen the impression that this new 'Hindusthan' contains only Hindus. Surely the Muslims, Sikhs, Parsis, Christians, Jains and even the Hindus— barring the Mahasabha, perhaps— have no such intention. *Vis-a-vis* Pakistan, which is going to be a theocratic state, the *raison d'etre* of the rest of India has got to be non-religious (areligious) and anti-communal.

But before recommending 'Hindusthan' to the rest of the world, let us consider the luck the word has had in India itself. Urdu uses only 'Hindustan', very seldom 'Bharata'. Hindi, Gujerati and Marathi use both name in popular language but in their poetical flights on Sanskritic wings they shed 'Hindusthan.' Bengali and Assamese rarely use 'Hindusthan', and when they refer to a 'Hindusthani' they mean a person coming from Western India just as they use 'Madrasi' to cover all South Indians (!) And finally the South Indian languages have been using Bharatavarsha (-Bhumi, -Mata, -Khanda, -Desha) without paying any attention to 'Hindusthan' Whatsoever.

It is strange indeed that whereas the word 'Hindu' which is Persian got entrance into all Indian Languages and even hybrid *samasas* (composites) like 'Hindu-dharma' and 'Hindusamaja' have become a part of the Indian Languages, the composite 'Hindusthan' (where 'sthanam' is a purer Sanskrit word than 'Hindu') was given no passport by the Bharat Government. It is like Subhadranandana Abhimanyu entering the chakravyuha while respectable elders bearing the tail fail to penetrate!

What about Bharata, then? Unfortunately the word is unknown in Sindhi, Baluchi, Poshto, Kashmiri and is very rarely used in Urdu. The rest of the world does not know it either. And surely the Congress has not given up all hopes for the return of the prodigal. 'Vande Bharatam' (!) does not work : 'mataram' has a better chance.

Netaji used 'Hind' for the simple reason that he had to deal mostly with the Puanjabis— Hindus, Muslims and Sikhs— to whom the word is familiar, but it does not appeal to the rest of India.

www.pathagar.com

I therefore feel that there is no alternative but to maintain the *status quo*. We shall continue to use 'India' when we write and speak English, and 'Bharatavarsha' and `Hindusthan' according to the predilection and genious of the different Indian languages, as in the past. The man in the street would like to have one single word for India in all the Indian languages, but we must not forget the fact that India is a sub-continent and many people have many associations and many sentiments. Our attitude in this matter should be more Swiss than French. There are four languages in Switzerland : the French Swiss calls his country 'La Suisse'; the German Swiss 'Die Schweitz' : the Italian Swiss 'Svizzera'— I regret I have forgotten the Roumansh word. It is true that the Swiss have another common word for their land in all the language— 'Helvetia', but it is used only on the postage stamp! It happens to be a Latin word too, and the Swiss have much less to do with dead Latin (Helvetia) than we have with the living English (India).

Love and friendship

Only the other day a young friend of mine, a rising barrister, suddenly descended upon me and insisted that I should immediately accompany him to this house as his parents had suddenly arrived there from their native village and would like me to have dinner with them. I know that this young man and his wife are very hospitable and although he took his glass of brandy it was in abundance for the guests, but he told me something in the car which upset me considerably. It appears that an astrologer had paid them an visit just a couple of hours back and had predicted that his mother would leave this world before his father.

Now I know that every Hindu woman (and in india by far and large Muslim women also) always pray or to put in Bengail that she may be laid on the funeral pyre with the vermilion mark on the parting of the hair (sinthisindur) which is a sign that she is not a widow. That is to say she would rather die as an *akhandasaubhagyavati* rather than live for a hundred years as a gangaswarupa (these terms are not familiar in

www.pathagar.com

Bengal and some other provinces, but will be easily understood) but nevertheless it is a crul *faux pas* to speak of the death of a wife before her husband.

But I was completely bowled over when I met the parents and heard the opinion of the mother regarding her predicted death as an *akhandasaubhagyavati*. 'Oh no,' 'she said firmly but sweetly, 'I would not dream of popping off (in Bengali ' tensne jawa'— a humorous slang like say kicking the bucket) before him.' while she looked at the thin emaciated and a very silent gentleman with infinite tenderness in her eyes. ' Oh, no', she continued, 'If I should die earlier he will be as utterly helps as an orphan of six months. He will just perish inspire of my three daughters-in-law who are extremely fond of him but cannot give him the company he is accustomed to.' And I was throughly convinced that she was perfectly right.

Here then was a case of love turning into friendship in old age, which has been described by the Grand Maitre of tender scenes, Alphonse Daudet in, his famous short : 'Lex Vieux.'

While staying in a abandoned mill in Provence he received a request from a Parsian friend to call on his grandparents who lived a few miles away. Daudet goes and on seeing them says. 'I was touched to find them so like each other! With a fringe and some yellow ribbons he (the grandfather) might have been called Mamettee (the grandmother), Even in their infirmity they resembled. Daudet sitting between the two of them had to go on and on chattering away (Et, patati : et patata) on their dear and above all *brave* (in the French sense) grandson Maurice. 'The old man would draw closer to me to say 'Speak louder—She's a little hard of hearing—'

And she on her part would say :

`A little louder, pray... He does not hear very well...'

Through the communicating door Daudet saw two little beds and 'I could not keep my eyes off them. They were hardly bigger than cradles and I pictured them at break of day when they are still buried under their fringed curtains. Three O'clock strikes. This is the hour when all old people wake :

"Are you asleep Mamette?"

"No, my dear'."

www.pathagar.com

Here I must draw the reader's attention to the very important fact that in the French original it is not 'mon cher' which would be 'my dear' but 'MON AMI' which strictly speaking is ' MY FRIEND'. And that is exactly what I have been driving at right from the begining. Love, passionate love, turns into friendship and it is impossible to say when and how the process begins. But when it is completed the husband and wife, at least according to Daudet, resemble each other. It is therefore not quite wrong that in certain parts of the Persian-speaking countries a couplet is recited by the bridegroom, after the formal wedding ceremony is over :

'Man tu shudam, tu man shudi, man tan shudam, tu jan shudibad as in Ta kasi no guyad, man diagram, tu digari.'

'I have become you, and you have become me, I have become the body and you have become jan.

So that no one may say after this you are different and you are different.'

We have the same in Sanskrit and I am told that just like the Persian couplet it is recited by the bridegroom and the bride in certain parts of India :

'yadet hrdayam mama tadastu hrdayam tava
Yadet hrdayam taba tadastu hrdayammama.'
'Let this heart of mine become thy heart
Let this heart of thine become my heart.'

If two hearts melt into one, it is but natural that in course of years, as Daudet points out, they should resemble one another bodily also, indeed there is a couplet in mixed Bengali which says :

'Sunori sunori tehar nam
Sundari Radhe hoilo Shyam.'

Ordinarily it is translated as 'Recalling his (Krisna's) name over and over again the beautiful Radha became dark (Shyam, dark, Krisna)' but other pundits maintain that she actually looked like Krisna. But as they were not married to one another and did not live for any length of time together actual friendship did not grow up between them. Had Lord Shrikrisna returned to Vrindavan again it might have been different. Some say he did visit again when Shriradha was a full hundred years old! Well. I presume that was rather late in the day for either love or friendship.

www.pathagar.com

A personal experience

' It can't hurt now' was Mr Sherlock Holmes's comment when for the tenth time in as many years I (Watson) asked his leave to reveal a delicate incident. In my case it is not *ten* hut close upon forty! When I was student in Bonn from 1930 to 1932 I fell deeply in love— not a calf-love— with a medical student who belonged to Stuttgart area. As I spoke precious little German when I met her for the first time and she spoke it perfectly well as also showed keen interest in India and Indian things (actually Tagore visited the Marburg University in summer 1930 and Mariana bought everything available by him and on him) we were drawn very close together. Well, in Germany Studentenliebe (love or/& friendship among university students) is equated with Semesterliebe (love of/& friendship only for a Semester which is a university term of six months)... German students are passionately fond of shifting from one university to another at the end of a Semester till they settle down for good at some particular university to prepare their thesis but neither I nor Mariana dreamed of seperation. I got my doctorate in the beginning of 1932 and left Mariana and Bonn in tears. Shortly afterwards Mariana wrote to me to say that she just could not stand the sight of Bonn, the Rhine and above all the Venusberg where we used to go out for long walks and on Saturday nights often used to greet the rising sun. Bonn was a small university town forty years ago and practically everyone who had anything to do with the university students knew that our love was 'feste' (unshakeable) 'solide' (solid, *pucca*) and when I left for India and Mariana for Munich it was palpable to our colleag, at Mensa (students' restaurant), the old woman at the newspaper kiosk, waiters, the few policemen on beat that Bonn could boast of and finally even my good old professor Carl Clemen who had international fame in Comparative Religion and knew that we were inseparable would raise his hat and bow profusely whenever he met her in the street that ours was not he notoriously proverbial Semesterliebe but of full five Semesters when circumstances separated us.

Five years is a pretty long time and when you are separated by thousands of miles. Our correspondence became irregular, for we had nothing else to tell each other except the cruel pangs of separation. Such depressing letters are not conducive to increase the tempo in

www.pathagar.com

correspondence, besides, I knew, that she, being the only child of an aristocratic family, was expected by her parents to marry and continue the name of the family, at least from the maternal side, Mariana's sense of *noblesse oblige* was one of the strongest traits of her character and although I am perfectly certain that her parents, to whom I was presented as a *de rigueur*, whenever they visited Bonn, never brought to bear any pressure on her to marry, much less a *marriage de convennce* which though not quite *la mode* was quite commeil faut among she Swabian elite (I am deliberately using these French expressions to show the profound French influence on the German aristocracy).

Mariana married in, I believe, 1936. I went to Germany a number of times since then but just as her *noblesse oblige* made her get married my common sense— on *amour propre*— prevented me from getting in touch with her. It is just not done.

Last year, however, I somehow come to know that her husband had died thirteen years ago. I wrote to her and got an immediate reply. She did not write in detail. She said she had two sons aged twenty four and nineteen. She concluded by saying that as a large number of Indians are visiting Germany since independence why should I not find a way to do the same. She finished her letter by 'As long as I am alive you are most welcome to my house.'

Alas for Mariana! She does not know the Sanskrit proverb 'Vasundhara Virabhogya' (The world belongs to the heroes viras) but today it is 'vasundhara tadbirbhogya.' it belongs to those who are masters of tadbir, pulling the strings, buttering up the paladins of the imperial court or/and the various foreign missions. As I am fast approaching the other world destined for me (sadhonachitadham) I would rather employ whatever tadbir I am capable of for gaining a better seat, if not in Dante's paradise, at least in the purgatory.

But Allah's ways are inscrutable. Certain quite unexpected circumstances and a couple of friends created a situation which found me in a Air India plane bound for America over Europe. The service was excellent, the food delicious but as that particular plane did not stop anywhere in Germany I got down at Zurich and took a train to Luzern which I have visited at least four times and shall never be tired of saying 'Gruess Gott' to her again.

www.pathagar.com

The Meeting

I caught an evening plane and reached Stuttgart when the light was fading. But there could be no mistake that it was Mariana. As she came towards me from the parking place I could distinctly see the same gait, the same bearing and I believe with a view to please me she had put on a Kostum and even the same coiffeur she used to have forty years ago. As I approached her she smiled but I did not ask her whether she recognized me at the first glance— who knows what disappointing answer I might get.

Of course she had grown old (I should say 'elderly', according to a German who told me that there are no old ladies in Germany but elderly ladies). She had crow's feet at the corner of her eyes, lines on her forehead and upper lip and her eyes had lost some of their sparkle but inspite of all, the contour of her face and the body was the same. Her 'figu' (face in French) had, as I have said, heed lines but strange to tell, her figure (taken in the English sense) had not, I was glad to note that she needed no artificial teeth, for often enough they change the entirely the contour of the face, and you feel, for good or bad, as if your are not looking at a familiar face. Or as Daudet puts it, looking at a friend through a fog.

'It is actually only forty miles to my village home as the crow flies,' she said as she started to drive in a tiny but delightful car, 'but it is a strain to drive thought the crowded Stuttgart and in the country the lights dazzle my eyes. During the past years I have driven to Stuttgart only twice.' I apologized profusely and remembering that Mariana had poor eyes even forty years ago said, 'I could have taken an earlier plane, if I only knew. Besides, 'I could have come from Stuttgart to your home by train. I told you so in my letter.' But I knew in the heart of my hearts that she knew, ever since we met for the first time that while travelling as good as an Eskimo in Berlin. But I believe that was not the main reason. She really wanted to do something for me symbolic at the very first moment of our meeting which will give us a good start in our new relationship for, after all, the Germans themselves define friendship as a relationship of mutual attraction between two persons based on sympathy, understanding,

www.pathagar.com

respect for each other, common interest and readiness to help one another. I felt hat I had not made a mistake in seeking out Mariana after forty years. I was certain that she was not boasting of the trouble she had taken to come to Stuttgart, for she replied immediately as she always did, 'Don't be silly!' which came as naturally as her mentioning the difficulty of driving in the dusk.

Pea soup, Wiener Schnitzel (escalope de veau a la viennoise) and that famous Rhine wine, hoc, par excellence (Liebfraumilch or Liebfrauenmilch), Strange! how she remembered my favorite dishes & wines which I love & could hardly afford in my student days. After dinner she told me important and occasionally very unimportant events of the past forty years of her life. Mariana's parents were Antinazis and her husband was dragged to the denazification court which caused his untimely death.

I wish I could write in greater detail of my stay at the huge zamindari home where Mariana lived lonely and all by herself; the sons came only during the holidays but I presume, here, the 'Moderns' expect 'hot stuff' from me and I shall have a disappoint them. Our days flowed smoothly like oil from a bottle without any tempestuous entracts. Of course we were inseparable. Even while she cooked one by one all my favourite dishes I gave her company in the kitchen. During those days Herr Brandt and his Foreign Minister Herr Scheel were stoutly defending their Ostpolitik in the Parliament and although the whole of Germany was watching it on the television screen, we, having given only one chance to the two Herren, went back to our reminiscences.

But I left Mariana with a deep wound in my heart which will never heal. Amongst other things she said, as if it were of little consequence `You know, when it can be really very, very cold here and the whole locality is snowbound it is really cheerless and I feel extremely lonely. Well, I think it can't be helped.' She changed the topic.

And this winter was particularly cruel in Europe just to spite me. Sitting in a warm temperature of seventy degrees I read that it had snowed even in the south of Italy after many years. Mariana must have been buried in at least Six feet of snow. She does need a friend.

www.pathagar.com

Friendship

Nonetheless some great thinkers have maintained that true friendship can exist only between a man and a man and there is no doubt that there are classical examples which have been sung by great poets. The friendship between Achilles and Patrocles, Krisna (Parthasarathi) and Arjuna, the Prophet Mohammed and Abu Bakr, and in recent times German literature has been considerably enriched by the friendship between Gothe and Schiller, as English by Hallam and Tennyson.

Perhaps there is a lurking suspicion in the minds of those thinkers that the friendship between a youngman and a maiden must ultimetaly turn into love.

Bana, in his famous novel *Kadambari,* has introduced the motif of friendship between a young prince Chandrapida and the daughter of a king, taken captive by Chandrapida's father called Patralekha and brought up by the queen as her own daughter but much to our disappointment, does not elaborate the theme. Tagore has discussed *it in extenso* in his article 'The Neglected in Poesy' (Kavye Upekshita) where he counts her Along with Lakshman's wife Urmila, the two companions of Shakuntala— Priyambada & Anasuya.

According to Bana, when Chandrapida was sixteen, her mother sent through a chamberlain (kanchuki) a charming young girl, who had not reached her full youth (anatiyauvana), with the message that the prince should accept her as the 'bearer of pan-supari' (tambulakarankavahini) that she should not be treated as a servant, but as disciple, a *Friend* (suhrid) so that the might become his permanent companion.

Tagore comments Patralekha in not a wife, not a beloved, not a servant; she is the companion (sahachari) of a male. This curious friendship is like a sand beach between tow seas. Haw can it excape destruction? That puissant and perrennial attraction which exists between young folk in their early youth— why does it not attack the narrow dam and destroy it?

'But alas! the poet has made the poor orphan princess sit for all times on that narrow strip; what could be a grosser negligence of the poet towards this ill-fated war prisoner? Living as she did behind a thin

www.pathagar.com

curtain she never attained her normal status. She kept awake near the heart of a man but could never step into it.'

But not even the thinnest muslin curtain separated them when it was a matter of friendship. She accompanied him everywhere 'like his own shadow' and there proximity was more than ordinary, or shall I any bizarre. While out on military conquests, Chandrapida would make her first sit on an elephant and then take his place behind her. While in the military camp, the prince would converse with his friend Vaishampayana deep into the night. *FRIEND* (sakhi) Patralekha would spread her blanket on the earth and sleep near the Prince.

This relationship is indeed very touchingly sweet but it rejects the full recognition of the right of womanhood. Bana has brought them as close as possible and yet he does not for a moment show any alarm, he does not appear even to be worried that the narrow strip of the sandy beach may be washed away and friendship turn into love. According to Tagore, here, Bana has shown his extreme indifference towards the woman in Patralekha. Had he but shown the least bit of concern with their intimacy— an intimacy which is utterly free from all bashfulness such as is enjoyed between two women only— it would have been some compliment paid to Patralekha, a recognition of her womanhood, however small.

Finally, to crown it all, Chandrapida falls in love and marries Kadambari, but Patralekha occupies such a very insignificant place in Chandrapida's life that the poet does not bother to throw her out. Indeed Kadambari does not feel the least bit jealous of Patralekha either. Indeed the latter serves as a messenger between Kadambari and Chandrapida when the former is away and she stays with her for some time.

But, asks Tagore, was she not disturbed at all by the scenes of amour which were acted between the prince and her wife? Did not the heat of the prince's impetuous youth ever make the blood in her vein run faster? With supreme nonchalance Bana, according to Tagore, does not pay the least attention to this divine aspect of Chitralekha's life and does not touch even the fringe of the question.

But who knows? Perhaps Bana wanted to paint a new conceit unknown to Sanskrit Kavya and he was afraid to bring them closer lest the reader should expect the eternal triangle, the stock-in-trade of many

www.pathagar.com

a Sanskrit dramatist. Perhaps the character and even more the situation of Chitralekha is tragic but it is certainly unique.

Tolstoy firmly believed in the friendship between man and woman. In his criticism of the famous short story of Chekhov `Darling' he goes to the length of considering Mary Magdalene as a source of inspiration of Lord Jesus, and 'the relations of friendship and sympathy between St. Clara and Francis were very close and there can be no doubt that she was one of the truest heirs of Franci's inmost spirit'. (E. B.) In Bengal we remember Sister Nivedita not only as a disciple of Swami Vivekananda (whose birthday is being celebrated as I write this) but as one of his closest friends. associate in all his activities and the most important inspirer in his life, It is by far the best example of friendship I know of, for unlike Magdalene and St. Clara Nivedita had to go beyond her creed, country and kinsfolk.

Wether we believe it or not :
'Love is only chatter
Friends are all that matter.'

There is no doubt whatsever when the Persian says,

'Dushman chih kunad
agar mehrban bashad dost.'

'What can enemies do, if a friend is mehrban.'

www.pathagar.com

রায় পিথৌরার কলমে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

একদা হিন্দুকুশের উত্তরপ্রান্ত ও পারস্যের পূর্ব সীমান্তের বল্‌হিক ও কপিশা, গান্ধার (বর্তমান বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ) এইসব অঞ্চল ভারতের অংশরূপে গণ্য করা হইত এবং এইসব প্রদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী ভারতে আগমনপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করিত। পরবর্তী যুগে নালন্দা-তক্ষশিলায় দূরতর দেশ হইতে আগত বহু ছাত্র বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের চর্চা করিত, এ তথ্যও আমাদের অবিদিত নহে।

বৌদ্ধধর্মের পতনের পর মুসলমানরা এই দেশের বড় বড় নগরে বিস্তর মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপনা করেন। প্রাচীন পন্থানুযায়ী তুর্কিস্থান, বল্‌খ্‌, কাবুল, জলালাবাদ হইতে পূর্বেরই ন্যায় বহু মুসলমান ছাত্র এই দেশে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আগমন করিত। অদ্যাবধি বহু উজবেগ (বাংলায় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত 'উজবুক'), হাজারা, আফগান তুর্কমান ভারতের দেওবন্দ, রামপুর, রাঁদের মাদ্রাসায় আগমন করিয়া ন্যূনাধিক চতুর্দশ বৎসর যাপন করত শেষ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিত। ভারতবিভাগের পরও এ স্রোতধারা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে; কারণ পাকিস্তানে দেওবন্দ, রামপুরের মতো উচ্চ শ্রেণির বিদ্যায়তন নাই।

ব্রিটিশ যুগে ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিল। ব্রিটিশ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দিল, আমরা তাহা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা এই শিক্ষা যে কতদূর পদার্থহীন, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া আপন সাধ্যমতো স্বদেশে বিদ্যায়তন নির্মাণ করিতে যত্নবান হইল। এই ব্যবস্থা ইংরেজেরও মনঃপূত হইল। পৃথিবীর সহিত আমাদের যোগসূত্র যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ইংরেজের স্বার্থ ছিল সেই দিকে।

স্বরাজ লাভের পর আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যে উন্নততর হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার জন্য পুনরায় একটি ক্ষীণ স্রোত বাহিয়া অল্পবিস্তর বিদ্যার্থী এই দেশে আগমন করিতেছে।

বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা উদ্বাহু হইয়া বিদেশাগত ছাত্রকে অভ্যর্থনা করে, তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য বহু প্রকারের ব্যাপক ব্যবস্থা করে। এই দেশে সেই জাতীয় কোনও আন্দোলন অদ্যাবধি আরম্ভ হয় নাই।

তাই যখন দিল্লির জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী কয়েকদিন পূর্বে দিল্লিবাসী বিদেশি ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন তখন আমার অবিমিশ্র উল্লাস হইল। নিমন্ত্রণাগত একটি ছাত্র বলিল যে, প্রায় দুইশত বিদেশি ছাত্র দিল্লিতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের একটি আপন প্রতিষ্ঠানও আছে।

www.pathagar.com

পূর্ব আফ্রিকাগত দুইটি নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হইল ও তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইল। অতিশয় ভদ্র এবং নম্র স্বভাব এবং মনে হইল, এই দেশের প্রতি তাহারা ভক্তি পোষণ করে। আমাকে বিনয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল— তাহা হইতে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাও অনুভব করিলাম। নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে আমাকে তাহারা পূর্ব আফ্রিকায় সহৃদয় নিমন্ত্রণ জানাইল।

দিল্লিবাসীর কর্তব্য ইহাদিগের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে আতিথেয়তা প্রদর্শন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন জ্ঞান অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসার করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহাদিগের প্রবাসক্লেশ লাঘব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

* * *

এই শীতে বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা দিল্লি আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে আরও সদুপদেশ দিবার বাসনা হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই বহু সদুপদেশ বহুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে— অতএব নিবেদন, যাঁহারা সস্ত্রীক আসিবেন, এই উপদেশ তাঁহাদের জন্য নহে। কারণ আমার উপদেশ যদি গৃহিণীরা মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া পালন করেন, তবে দাম্পত্যকলহ শুরু হইবার সমূহ সম্ভাবনা এবং বঙ্গভূমে প্রত্যাবর্তন করিবার পাথেয় অবশিষ্ট না থাকিবার গুরুতর ভয়ও রহিয়াছে। সবিস্তর নিবেদন করি।

চাঁদনি চৌকে গৃহিণী কত বস্তু ক্রয় করিবেন, তাহার অল্পবিস্তর ধারণা আপনার হয়তো আছে, কিন্তু অধুনা ভারত সরকার দিল্লিতে যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিস এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে গৃহিণী প্রবেশ করিলে আপনার কী দুরবস্থা হইবে, তাহার কল্পনা আমি করিতে অক্ষম। অমৃতশহর হইতে ডিব্রুগড়, কুমায়ুন হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যত প্রকারের কুটির-শিল্প আছে, তাহার তাবৎ নিদর্শন সরকার এই গৃহে সঞ্চয় করিয়া এক বিরাট প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

তাহাতে কাহার আপত্তি, কিন্তু হায় সেইগুলো বিক্রয়ার্থে। যাদুঘরে গৃহিণীকে লইয়া যান পরমানন্দে, নির্ভয়ে। মানিব্যাগ, চেক বুক-পকেটে বিরাজমান— কোনও ভয় নাই— গৃহিণী অশোকস্তম্ভ কিংবা যক্ষিণীর প্রতিমূর্তি ক্রয় করিতে চাহিলেও আপনাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না, কিন্তু এই স্থলে যমুনার স্রোত পর্বতাভিমুখী। সরকার এই প্রতিষ্ঠানে যেসব তরুণীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বিক্রয় করার কলাকৌশল এমনি মোক্ষম আয়ত্ত করিয়াছে যে, আমার গৃহিণীর মতো কৃপণাও লোহিত-বর্তিকা প্রজ্বলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (এই বিষয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় করিব না, আমি আমার দাম্পত্যজীবনে শান্তি কামনা করি)।

যদিও-বা আপনি এই কুম্ভীরের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন, তথাপি আপনার জন্য দিল্লিতে আর একটি ব্যাঘ্র রহিয়াছে।

কাশ্মির সরকারের নিজস্ব কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান।

বড়ই মনোরম বিপণি। কত প্রকারের শাল-দুশালা, পট্টু-ধোসা, পাপিয়ের মাশের কলাসামগ্রী, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র— দেখিতে দেখিতে আপনার গৃহিণী চঞ্চল হইয়া উঠিবেন, তাঁহার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকিবে, কল্পনার চক্ষে তিনি দেখিবেন কোন শাল ক্রয় করিলে তিনি ডলি মলি তাবৎ সুন্দরীদিগকে কলিকাতার সান্ধ্যক্লাবে নির্মমভাবে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবেন আর আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্তিকার যে বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন,

www.pathagar.com

তাহার কল্পনা করিয়া আমার বিঘ্নসন্তোষী হৃদয় বিপুলানন্দ লাভ করিতেছে। আমার নিজস্ব নিদারুণ অভিজ্ঞতা এই স্থলে বর্ণন করিব না।

ধর্ম বলেন, আমার অনুচিত এইসব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা, কিন্তু আমি নিরুপায়। দিল্লিতে বাস করি, এই দুইটি মনোরম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সুপরিচিত। আমার কি কর্তব্যবোধ নাই যে, আপনাদিগকে সত্যসুন্দর মঙ্গলের সন্ধান দিব না? আমি কি এতই কাপুরুষ যে, সামান্যা অবলাদিগের ভয়ে সত্য গোপন করিব?

অবশ্য আমার সাহস সম্পূর্ণ অন্য কারণে। 'আনন্দবাজারে'র স্কন্ধ কর্তন করিলেও সেই মহাজনগণ আপনাকে আমার বাসস্থানের উদ্দেশ দিবেন না। তাঁহারা নরহত্যার ঘোরতর বিরোধী। আপনার মঙ্গলও তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

* * *

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দার্শনিকগণ দেহলিপ্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিক কাল নানা প্রকারের গবেষণা আলোচনা করিবেন। ইঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কী প্রকারে উভয় ভূখণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান একত্র করিয়া পৃথিবীতে সত্যশিবসুন্দরের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যান্ড, ইতালি, ইংলন্ড, জাপান, মিশর, তুর্কি, সিংহল, আমেরিকা ও ভারতের দর্শন-শার্দূলগণ ইতোমধ্যে স্ব স্ব সহানুভূতি ও সহযোগিতা স্থাপন করিয়া পত্র বিনিময় করিয়াছেন।

দর্শনের সেবা করিবার সৌভাগ্য না ঘটিয়া থাকিলেও দার্শনিকদের সেবা করিয়াছি বলিয়া ইঁহাদের সকলেই আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন।

বিশেষত জর্মনির অধ্যাপক হেল্‌মুট্ ফন্ প্ল্যাজেনাপ্। সংস্কৃতে ইঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং বর্তমান ভারতের সঙ্গেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ইঁহার অন্যতম পুস্তক 'বুদ্ধ হইতে গাঁধী' পুস্তক পাঠ করিয়া আমি পুনঃপুন সাধুবাদ দিয়াছি। ইনি একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং আলঙ্কারিক। তাঁহার ভারত-প্রেম অতুলনীয়। ইনি জর্মনির পক্ষ হইতে ভারত আগমন করিবেন।

তাঁহার পিতা জর্মন ব্যাঙ্কে বহুকাল একচ্ছত্রাধিপত্য করিয়াছেন। তিনিও ভারতীয় বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত। স্পষ্ট স্মরণ নাই, তবে বোধ হইত তিনি কবি ইকবালের সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার কাব্যাংশ জর্মনে অনুবাদ করিয়া ইকবাল তাই লইয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

পাঠক, দেহলি-প্রান্তের এই আসন্ন সভার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তুমি লাভবান হইবে।

দুই

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সেক্রেটারি ডক্টর তারাচান্দ ভারতীয় রাজদূতরূপে ইরান যাইতেছেন।

ডক্টর তারাচান্দ যুক্তপ্রদেশ তথা দিল্লি অঞ্চলে সুপরিচিত। সংস্কৃত, ফারসি আর উর্দু এই তিন ভাষাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বহু বিদ্বজ্জনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির আবেদন সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছেন,

www.pathagar.com

তাহাতে যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে— চিত্র, সঙ্গীত, নাট্যকলায় তাঁহার সূক্ষ্ম রসানুভূতি তাঁহার পুস্তকরাজিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সক্ষম হইয়াছে। দারাশিকুহ'র সম্বন্ধে তাঁহার প্রামাণিক প্রবন্ধ দেশে-বিদেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত তারাচান্দ শব্দ এবং ধ্বনিতত্ত্বে সুপণ্ডিত বলিয়া দারার যুগের সংস্কৃত উচ্চারণ কিরূপ ছিল তাহা তিনি দারাকৃত সংস্কৃত শব্দের ফারসি লিখন পদ্ধতি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তারাচান্দের সংস্কারবর্জিত মন হিন্দু-মুসলমান উভয় বৈদগ্ধ্যের সম্পূর্ণ সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইরান এবং মিশরে এতদিন যাবৎ দুইজন মুসলমান ভারতীয় রাজদূত ছিলেন। কাজেই ওই দেশবাসীদের মনে এই ভুল ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে, ভারতবর্ষের হিন্দুরা বুঝি আরবি-ফারসির চর্চা করেন না এবং মুসলমানেরাও বুঝি সংস্কৃত, হিন্দি তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন।

মৌলবি তারাচান্দ যখন উত্তম উচ্চারণ সহযোগে রুমি-সাদি, হাফিজ-আত্তারের বয়েত আওড়াইয়া ইরানের মজলিস-মুশায়েরা সরগরম করিয়া তুলিবেন তখন যে তিনি অকুণ্ঠ প্রশস্তিকীর্তন শুনিতে পাইবেন তাহার কল্পনা করিয়াও আমরা উল্লাস বোধ করিতেছি।

ডক্টর তারাচান্দের যাত্রা জয়যুক্ত হউক।

* * *

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ছাত্র, নেপাল যাদুঘরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রদর্শনী দিল্লিতে সুরসিকজনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

হিন্দুর যেমন শাক্ত-বৈষ্ণব, মুসলমানের যেমন শিয়া-সুন্নি, ইংরেজের যেমন লেবার-কনসারভেটিভ, দিল্লির তেমনি 'অল ইন্ডিয়া ফাইন্ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্ সোসাইটি' এবং 'শিল্পীচক্র'। প্রথমটি আভিজাত্যাড়ম্বরে আমন্ত্রিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী— এবং অত্যন্ত অনটনের সময় অর্থমন্ত্রী— ইঁহারাই এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে হোতা হইবার অধিকার ধারণ করেন। বিদেশাগত যাবতীয় রাজদূতমণ্ডলী, তাঁহাদের ভামিনীকামিনীগণ নগরশ্রেষ্ঠী, ধর্মাধিকারী এবং তাঁহাদের পুত্রকলত্র এইসব প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য যেসব রথ আরোহণ করিয়া আগমন করেন একমাত্র সেইগুলিকেই পরিবেক্ষণ করিবার জন্য রবাহূত অনাহূতগণ যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে দ্বিতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ফেলে।

উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। দৈনিক মাসিক সর্বত্র সাধুবাদ মুখরিত হইয়া উঠে। নিজেকে ধন্য মনে করি। সার্থক আমাদের দিল্লিবাস!

আর 'শিল্পীচক্র' নিতান্তই অব্রাহ্মণ শ্রেণির জনপদ প্রচেষ্টা। ইহাতেও উত্তম উত্তম চিত্র প্রদর্শিত হয়। মন্ত্রিবর্গ সচরাচর এই স্থলে আগমন করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না, তবে বিদেশাগত রাজদূতমণ্ডলীর সুরসিক দর্শকেরা 'শিল্পীচক্রকে' অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখেন নাই। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় সৌজন্যের সঙ্গে জীর্ণবাস শিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। তাঁহাদের ললনাগণ উদার স্মিতহাস্যে শিল্পীকে আপ্যায়িত করেন।

দুইটি প্রতিষ্ঠানই দিল্লিনগরের জন্য প্রয়োজনীয়। উভয়েই আপন আপন আদর্শ পালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

www.pathagar.com

অর্থাভাবে 'শিল্পীচক্র' অনেক সময় আপন প্রদর্শনীগুলিকে অনাড়ম্বর এমনকি জীর্ণ বেশে পরিবেশন করেন। রসিকজন তাহাতে দুঃখিত হন, কিন্তু বিচলিত হন না। কদলীপত্র অতিথি-সেবকের দৈন্যের পরিচয় দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কদলীপত্রে আতপান্ন ভক্ষণ বিস্বাদ প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু সে দৈন্য রুচিহীনতার পরিচয় দেয় না। বিনোদবিহারীর চিত্র চিত্র-বিচিত্ররূপে পরিবেশিত হয় নাই। রসিকজন তাহাতে বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কলাপ্রচেষ্টা অনায়াসে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু এই সংসারে কাণ্ডজ্ঞানহীনেরও অভাব নাই। রসবোধ তাহাদের নাই জানি কিন্তু কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকিলে অরসিকজন আপন রসহীনতা প্রকাশ করে না। এস্থলে যে ব্যক্তি বিনোদবিহারীর নিন্দা করিয়াছেন তিনি রস হইতে বঞ্চিত সে তত্ত্ব আমরা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তিনি যদি ভাষণ না করিতেন, তবে হয়তো পণ্ডিতরূপেই শোভাবর্ধন করিতেন। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই; শুধু যে নগরে গুণীজনের অহেতুক নিন্দা হয় সে নগরের নাগরিকমাত্রই নিজেকে বিড়ম্বিত মনে করেন।

* * *

কলিকাতা মহানগরীতে ফুটবল খেলা দেখিবার মতো ধৈর্য এবং শক্তি আমার আর নাই এবং দিল্লি শহরে দেখিবার মতো প্রবৃত্তিও নাই।

এক বন্ধু বলিলেন, 'বিবেচনা করে এই রাজস্থান এবং পূর্ববঙ্গের মল্লযুদ্ধ যদি তুমি দেখিতে চাও তবে তোমাকে অন্ততপক্ষে তিনশটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিয়া কলিকাতা গমনাগমন করিয়া তাহা দেখিতে হইবে। অপিচ, উভয়পক্ষের যুযুধান ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত। দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বলিলে যেখানে সামান্যতম অতিশয়োক্তি হয় মাত্র সেই রাষ্ট্রপতি সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া ক্রীড়াজনিত ক্ষাত্রধর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন, সে স্থলে তুমি ন্যূনাধিক তিনটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ? হা ধর্ম! ঘোর কলিকাল! ধিক্ তোমাকে!'

সবিনয় প্রশ্ন করিলাম, 'মূল্য-পত্রিকা ক্রয় করিবার জন্য কত প্রহর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের প্রধান তোরণে উপস্থিত হইতে হইবে?'

সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, 'এ কী বাতুলের প্রশ্ন? অর্ধঘণ্টাই প্রশস্ত।'

এই সুসংবাদ শুনিয়া চিত্তে পুলক সঞ্চারিত হইল না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের পীঠস্থান কলিকাতা নগরে মল্লযুদ্ধ দেখিতে হইলে দ্বাদশপ্রহর পূর্বে ঘৃতলবণ তৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বন্ধুবান্ধবসখাসজ্জন লইয়া উপস্থিত হইতে হয়, আর এই মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থে মাত্র অর্ধঘণ্টা।

আমার দ্বিধা অমূলক নহে।

ইন্দ্রপ্রস্থের সজ্জনগণ মল্লক্রীড়া নিরীক্ষণ করিলেন, ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া করতালি দিলেন, যত্রতত্র অবান্তর সমালোচনা করিলেন, ভদ্রজনোচিত পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং ক্রীড়াশেষে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ মুনিজনের ন্যায় শান্তসমাহিত চিত্তে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইবার আমি বলিলাম, হা ধর্ম!

বিকট চিৎকার, ছত্রহস্তে লম্ফঝম্প, শ্রাবণের বারিধারার মতো শোকাশ্রু আনন্দবারি বর্ষণ, মল্লবিশেষের নামোল্লেখ করিয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার চতুর্দশ পুরুষকে অভিসম্পাত, পার্শ্বে

www.pathagar.com

দণ্ডায়মান, বিপক্ষানুরাগীকে নিদারুণ চপেটাঘাত, ফলস্বরূপ অনুরাগীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, তস্য ফলস্বরূপ ছত্র ও পাদুকা ক্ষয়, রক্তপাত অঙ্গাঘাত, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর জয়ী হইলে সন্দেশ বিতরণ, পরাজিত হইলে গৃহিণীকে কটু বাক্যবর্ষণ—

কিছুই না?

এবম্বিধ ক্রীড়া দর্শনে কালক্ষেপ করে কোন সুরসিক?

তিন

একই সময়ে দিল্লি শহরে দুইটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে; প্রথমটিতে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্য ইউরোপের চিত্রতারকাগণ যে কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন; দ্বিতীয়টিতে ইন্দোনেশিয়ার কলা সৃষ্টির সর্বাঙ্গসুন্দর সঞ্চয়ন।

এই দুইটি প্রদর্শনী দেখিয়া মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কি একই রসের অনুসন্ধান করিয়াছে এবং সেই রস যদি একই রস হয়, তবে তাহা উভয় ভূখণ্ডের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে?

কলের জিনিস সস্তায় তৈয়ারি বলিয়া ইউরোপের বাড়িঘর, তৈজসপত্র, বেশ-ভূষা, এমনই এক সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহাতে আর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির রসানুভূতি প্রকাশ পায় না। স্বীকার করি, ইউরোপীয় রমণী পর্দা কিনিবার সময় আপন রুচির উপর নির্ভর করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই পর্দা অন্য লক্ষ লক্ষ পর্দার সঙ্গেই মিলিয়া যায়। পর্দার ক্ষেত্রে কোনও কোনও রমণী হয়তো নিজের হাতে তাহার উপর কিছু কিছু কারুকার্য করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেন, কিন্তু টেবিল-চেয়ার, বাসন-কোসনের বেলা তাহার কিছুমাত্র অবকাশ থাকে না।

কল সবকিছু তৈয়ার করিয়া দিতেছে, সেখানে মানুষ রসসৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইতেছে না— অথচ সেরকম মানুষ সব দেশেই আছে বিস্তর— তাহাদের তখন উপায় কী?

তখন মানুষ নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রকে আর কারুকার্য বিভূষিত না করিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলাসৃষ্টি আরম্ভ করে। ফলে চিত্র এবং ভাস্কর্য মানুষের রসসৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। তাই কলের জিনিস যেখানে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত— দৃষ্টান্তস্থলে মধ্য ইউরোপ— সেখানেই প্রচুর পরিমাণে চিত্র অঙ্কিত হয়, মূর্তি নির্মিত হয়। আমার বিশ্বাস প্যারিস-বার্লিন দুই শহরে যে পরিমাণ চিত্র অঙ্কিত হয়, সমস্ত প্রাচ্য দেশে এত ছবি আঁকা হয় না।

আর একটি তত্ত্ব এস্থলে লক্ষণীয়; নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের কোনও অভাব এইসব চিত্র পূরণ করে না বলিয়া তাহারা দশের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে না এবং ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়ায় এবং খুব বেশি হইলে মাত্র সেই গোষ্ঠীরই চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করে যাহারা রসের সংসারে সমগোত্রীয় এবং তাহার শেষ ফল এই হয় যে, এ ধরনের চিত্র এবং ভাস্কর্য অতিশয় অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করে।

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই মধ্য ইউরোপীয় চিত্রকলার এই পরিণতি ঘটিয়াছিল। প্যারিস যদিও বহু বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন আলোড়নের কেন্দ্রভূমি ছিল, তথাপি বার্লিন

www.pathagar.com

যখন একবার এই আন্দোলন গ্রহণ করিল, তখন তাহার পরিণতি অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল।

দিল্লির চিত্রপ্রদর্শনীতে আজ আমরা প্রধানত সেইসব চিত্রের কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছি।

ইহাতে ভালো চিত্র নাই, এই কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু মানুষের অধীর চিত্তকে যে শান্তি দেয়, তাহার সন্ধান এই প্রদর্শনীতে বড়ই কম। যেখানে সমস্তক্ষণ চিত্রকার নূতন ভাষা, নূতন শৈলী, নূতন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেখানে দর্শক সমাহিত রসের সন্ধান করিলে নিরাশ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

গুণের দিক দিয়া অতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই চিত্রগুলিতে প্রাণ আছে। প্রচেষ্টার ফল ভালো হউক, মন্দ হউক, প্রচেষ্টা মাত্রই দর্শকের চিত্তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সে চাঞ্চল্য গতানুগতিক কিংবা মৃত কলা অপেক্ষা অতি অবশ্য সর্বথা কাম্য।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার কলা সেই দেশের জনসাধারণের কলা। প্রদর্শনীতে যেসব বস্তু রাখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এমনকি তৈজস এবং মূর্তিগুলি পর্যন্ত হয় গৃহসজ্জায় নয় পুতুলরূপে আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বালির পুতুল, কি গরুড়ের মূর্তি, কি পরিধান বস্ত্রের নকশা, কি বেতের ঝাঁপি, বারকোশ, কি বালা ব্রোচ আংটি, কি 'বাতিকের' কারুকার্য সর্বত্রই স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে কোনও নূতন শৈলীর অনুসন্ধানে উন্মত্ত নৃত্য নাই। রস কী করিয়া প্রত্যেক বস্তুটির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয় তাহার সন্ধান ইন্দোনেশিয়ার কলাকার বহু শতাব্দী পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং সেই সত্যপথ ধরিয়া তাঁহারা প্রতিদিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্যের আর কোন বস্তুকে আরও সুন্দর করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। এককালে আমাদের দেশের শিল্পীরাও প্রত্যেকটি জিনিসকে রসরূপ দিবার চেষ্টা করিতেন; এখন তাঁহাদের পরাজয়ের পালা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন মিলের কাপড়, এলুমিনিয়মের বাসন আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বিবেচনা করি, এমন দিনও আসিবে যখন দুর্গাপ্রতিমা কলে তৈয়ারি হইয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এই প্রদর্শনীর বহু বস্তুর সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছি, এ জিনিসটির কি কোনও দোষ, কোনও ত্রুটি নাই? স্পষ্ট ভাষায় বলি, এমন বহু জিনিস দেখিলাম যাহাতে সত্যই কোনও প্রকারের ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। সর্বাঙ্গসুন্দর কলাসৃজনের এইরূপ অভিনব সঞ্চয়ন আমি আমার জীবনে আর কোথাও দেখি নাই।

রসবস্তু বিচারে কোনওপ্রকারের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতার স্থান নাই এই সত্য বারম্বার স্বীকার করিয়াও যদি নিবেদন করি, কোনও সুন্দরী রমণীর মুখে যদি আমি আমার মাতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই তবে সেই সুন্দরী কি আমার কাছে প্রিয়তর মনে হয় না?

মাতা, ভগ্নী, সকলকেই বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি, ঢাকাই শাড়ি পরিতে। দাওয়ায় বসিয়া কত সহস্রবার দেখিয়াছি, বাঁশের বেড়ায় শাড়ি শুকাইতেছে এবং সেইসব পাড়ের নকশাই তো আমাকে রসশাস্ত্রের প্রথম অ আ ক খ শিখাইয়াছে। জ্বরের ঘোরে যখন বালক তাহার দৃষ্টিশক্তির কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে তখন সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে মাসিমার শাড়ির

www.pathagar.com

পাড়ের দিকে। চেতন-অর্ধচেতন উভয় মনই বাল্যকাল হইতে আপন অজানাতে এইসব বস্তু দিয়াই তাহার 'শিল্পসূত্র' (ক্যানন্‌স অব আর্ট) নির্মাণ করে।

অকস্মাৎ এই প্রদর্শনীতে দেখি, ঢাকাই পাড়ের নকশা! দেহলি প্রান্তের রসযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে ঢাকাই নকশা অনাদৃতা। তাই অর্ধপরিচিত সমুদ্রপারে আদৃত (না হইলে এই নকশা প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে কেন) এই নকশা দেখিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা শ্রীযুত বিনোদ এবং মহারাজা উভয়ই ইন্দোনেশিয়ার কলাতে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। তদুপরি এই তথ্যও জানি ভারতের বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সর্বাধিক বাণিজ্য করিয়াছে। আরও জানি ঢাকাই শাড়ির নকশা উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত নহে।

তাহা হইলে আমার সুপরিচিত ঢাকাই শাড়ির নকশাই তো এই নকশাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তাহা হইলে আমারই অনাদৃত আমার দেশের তন্তুবায় একদা রসভূমিতে ইন্দোনেশিয়া জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাঠক আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনি পারেন না। আমিও পারি নাই।

কবিগুরু কর্তৃক রচিত 'বালি দ্বীপ' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এই উপলক্ষে উল্লেখ করি :

"সন্ধ্যাতারা উঠল যবে গিরিশিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা সাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দু খানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি—
'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে; কহিলে 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে—
তনুদেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি করবী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।—"

চার

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল সবদেশেই আছে, কিন্তু যদি জিগ্যেস করা যায় আজ পর্যন্ত কোন দেশ সবচেয়ে বেশি কৌতূহল দেখিয়েছে এবং সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে কে, তা হলে সকলের পয়লা নাম নিতে হয় জর্মনির।

www.pathagar.com

আর কিছু না; শুধু যদি এই মাপকাঠিই নিই, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে কোন ভাষায় তা হলেই জর্মনি পয়লা প্রাইজ পেয়ে যাবে। এখানে অবশ্য এমন সব কেতাবের কথা উঠছে না যেগুলো সুদ্ধমাত্র ভারতবর্ষকে কবজা রাখার জন্য ইংরেজ লিখেছে বা লিখিয়েছে, কিংবা এমন সব কেতাবের কথাও উঠছে না যেগুলো পড়া থাকলে হাতি শিকারের সুবিধে হয় অথবা ক্রিকেট খেলার 'পিচ' বানাবার সময় কাজে লাগে। সোজা বাংলায় যাকে বলে 'শাস্ত্র-চর্চা' আমি সেই শীল সেই অধ্যবসায়ের কথা ভাবছি।

* * *

জর্মনিতেও ভারতের চর্চা আরম্ভ হয় পঞ্চতন্ত্র নিয়ে। পঞ্চতন্ত্রের পেহলভি তর্জমার আরবি তর্জমার লাতিন তর্জমার জর্মন অনুবাদ হয় ট্যুবিঙ্গেন শহরে সেখানকার রাজার আদেশে। তার পর আঠারো আর উনিশ শতকে জর্মনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত আর অর্ধ-মাগধী শিখে ভারত সম্বন্ধে যে চর্চাটা করল তার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার মাথা নিচু করতে হয়। এ চর্চাতে যে শুধু ভাষাবিদ পণ্ডিতেরাই যোগ দিলেন তা নয়, জর্মন দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবিরা পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

* * *

প্লাতো, দেকার্ত আর তার পরেই কান্ট।

দার্শনিক কান্টও যে ভারত নিয়ে চর্চা করেছিলেন এ তত্ত্ব কজন লোক জানে?

কান্টের সময় ভারত সম্বন্ধে ইয়োরোপের জ্ঞান এত সামান্য ছিল যে কান্টের পক্ষে ভারতীয় দর্শন চর্চা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে যে সামান্য দু একটি খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন তারই জোরে বলে যান, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা ভারতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের বাণী শোনেন; কিন্তু ভারতীয়রা আশ্চর্য হল এই দেখে যে ক্রিশ্চান মিশনারিদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই।'

এ তত্ত্ব আজ আমরা সবাই জানি, কিন্তু আশ্চর্য সে যুগে কান্ট ওটা জানলেন কী করে? খ্রিস্টধর্ম যে এদেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করল না সেই তো তার প্রধান কারণ। ভাবের জগতে তো 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক' অচল!

* * *

গ্যোটে 'শকুন্তলা'র প্রশস্তি গেয়েছিলেন— তারই খেই ধরে রবীন্দ্রনাথ একখানা উত্তম প্রবন্ধ লেখেন সেকথা আমরা সবাই জানি।

তার পর বিখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনে কল্পনার চোখে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভারি চমৎকার কয়েকটি কবিতা লেখেন। জর্মন ছেলে-বুড়ো কোনও ভারতীয়কে পেলেই সেসব কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে আনন্দ পায়। ভারতীয় গর্ব অনুভব করে— অবশ্য বলে রাখা ভালো নিছক কল্পনার উপর খাড়া বলে হাইনের কবিতাতে দু একটি বর্ণনার ভুল থেকে গেছে। গঙ্গার জলে হাইনে পদ্ম ফুটিয়েছেন এবং সেই পদ্মার সামনে হাঁটু গেড়ে পুজো করছে ভারতীয় তরুণী।

তাতে কিছু যায়-আসে না। কারণ ওদিকে আবার বশিষ্ঠ-বিশ্বমিত্রের কলহে হাইনে গণতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্রের দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন এবং জর্মনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

www.pathagar.com

* * *

আসল কৃতিত্ব কিন্তু জর্মনরা দেখিয়েছে বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ গীতা, শ্রৌত সূত্র, গৃহ্য সূত্র, ষড়্‌দর্শন, ভক্তিবাদ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র নিয়ে।

ঋগ্বেদের অনুবাদ উনিশ শতকে হয়; তার পর তুলনামূলক ভাষা চর্চার ফলে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই পুরাতন অনুবাদই চালু থাকে। মাক্‌স্‌ম্যুলারের পর ঋগ্বেদ অনুবাদ করবার মতো দুটো মাথা কটা লোকের ঘাড়ে আছে?

সেই সাহস দেখালেন আরেক জর্মন পণ্ডিত— মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেল্‌ড্‌নার।

গেল্‌ড্‌নারের ঋগ্বেদ-অনুবাদ আশ্চর্য বই। গ্রাসমান, লুডবিশ, ম্যাক্‌স্‌ম্যুলারের যুগ থেকে ১৯২০ (মোটামুটি) পর্যন্ত ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ যত ভাষায় লেখা হয়েছে তার সামান্যতম মূল্যবান জিনিসও কোনও কোনও উপলক্ষে গেল্‌ড্‌নারের অনুবাদে স্থান পেয়েছে। ফলে এই হয়েছে যে আজ ঋগ্বেদ সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও তথ্য অনুসন্ধান করার সময় বিশ্বভুবন খুঁজে বেড়াতে হয় না— গেল্‌ড্‌নারের জর্মন অনুবাদখানাই যথেষ্ট।

* * *

কিন্তু এর শেষ কোথায়? ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যা বলা হল তা-ও তো অতিশয় সংক্ষেপে। এখন যদি আর তিনখানা বেদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করি, তা হলে লিখতে হবে আরেকখানা মহাভারত এবং সে মহাভারত ব্যোটলিঙ্ক-রোটের সংস্কৃত-জর্মন অভিধানের আকার ধারণ করবে।

ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধানখানি সার্থক বই। এ অভিধানকে হার মানাতে পারে এরকম অভিধান পৃথিবীতে নেই।

এর পশ্চাতে একটুখানি ইতিহাস আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জর্মনরা বলল, 'ভালো অভিধান ছাড়া আর তো সংস্কৃত চর্চা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।'

ব্যোটলিঙ্ক-রোট দুই গুণী অভিধানখানা লিখতে রাজি হলেন। বিরাট সাত ভলুমে সে অভিধান শেষ হল, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এ অভিধান ছাপাতে যাবে কোন প্রকাশক— এত রেস্ত আছে কোন গৌরী সেনের?

গৌরী সেন রাজা ছিলেন না— তাই তুলনাটা টায়-টায় মেলে না। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ অভিধান ছাপাবার মতো পয়সা আছে শুধু রাশিয়ার জারের।

তখন জর্মন পণ্ডিতরা পাকড়াও করলেন তাঁকে— জারটি ভালো মানুষ ছিলেন (রামচন্দ্র! কম্যুনিস্ট ভায়ারা না আবার চটে যান) এবং টাকাটা অকাতরে ঢেলে দিলেন।

শুধু এই অভিধানখানিকে ভালো করে কাজে লাগানোর জন্যই জর্মন ভাষা শেখা উচিত।

মনে পড়ছে, প্রথম যৌবনে 'ক্রন্দসী' শব্দের সামনে কাঁদ কাঁদ হয়ে মেলা অভিধান ঘাঁটার পর ব্যোটলিঙ্ক-রোটের অভিধান খুলে শব্দের হদিস পাই। (স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহোদয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই— তিনি বাঙালির গৌরবস্থল ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাই তাঁর সামান্য দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাঁর আত্মা বিরক্ত হবেন না বলে আশা রাখি। তাই এই উপলক্ষে নিবেদন করি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিধানে 'ক্রন্দসী' শব্দ উল্লেখ

www.pathagar.com

করে যে বলেছেন 'সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু রোদসী পাইয়াছি' পুনরায়, 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত' এই দুটি বাক্যই খুব ঠিক নয়।)

* * *

বপ, ডয়সেন, অল্ডেনবুর্গ, য়াকোবি, হিলেব্রান্ট, ড্যুটওয়া এঁদের সবাইকে বাদ দিয়ে তাঁদের কথায়ই আসি না কেন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছে।

এই ধরুন ল্যুডার্স। গেল্ড্নারের পরেই চতুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন এই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

মোন-জো-দড়ো নিয়ে যখন বিশ্বভুবন মাথা ফাটাফাটি করছে, এ কোন সভ্যতা, এর বয়স কত, একে গড়ে তুলল কে, তখন জর্মনি ল্যুডার্সকে অনুনয় করে বলল, 'চতুর্বেদে হেন বস্তু নেই যা আপনার অজানা। আপনি মোন-জো-দড়ো ঘুরে এসে বলুন, বেদে বর্ণিত কোনও কিছু কী মোন-জো-দড়োতে আছে যার থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে মোন-জো-দড়ো আর্য সভ্যতা।'

ল্যুডার্স ঘুরে গিয়ে বললেন, 'না, বেদের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই।'

ব্যস্। সব মাথা-ঘামানো বন্ধ।

সব শাস্ত্রেই ল্যুডার্সের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শেষ বয়সে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করে তার সঙ্গে গ্রিক অলঙ্কার শাস্ত্র মিলিয়ে যখন বক্তৃতা দিতেন তখন দেখেছি তাঁর শ্রোতারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যেতেন। এরকম পণ্ডিত জর্মনিতে আবার জন্মাবেন কবে?

* * *

কিংবা ধরুন কির্ফেল।

জৈন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত যাকোবির (ইনি স্বাধীনভাবে হিসেব করে লোকমান্য টিলকের সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হন) শিষ্য কির্ফেলকে একদিন জিগ্যেস করেছিলুম, 'উপস্থিত কোন বিষয় নিয়ে মগ্ন আছেন?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পুরাণ নিয়েই তো জীবনটা কাটল। অন্য জিনিস ভালো করে পড়বার ফুর্সৎ পেলুম কই।'

জিজ্ঞাসা করি, পুরাণের দেশ ভারতবর্ষে কয়জন লোক পুরাণের জন্য প্রাণ দেয়? একজনকে জানি— বাঙালি মাত্রই তাঁকে জানে।

কিন্তু আজ এ শিবের গীত কেন?

এ সপ্তাহে দিল্লিতে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন জর্মন পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্ল্যাজেনাপ। বিষয় ছিল, জর্মনির ওপর ভারতীয় প্রভাব। সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলুম।

শ্লেগেল থেকে আরম্ভ করে উইন্টারনিৎস-ল্যুডার্স পর্যন্ত তিনি পণ্ডিতের ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ইতিহাস দিলেন। বয়স হয়েছে, স্মরণশক্তির ওপর আর নির্ভর করতে পারিনে, তবু টুকতে পারিনি।

তাই যেটুকু মনে ছিল তার সঙ্গে পিথৌরার অভিজ্ঞতা জুড়ে দিয়ে আপনাদের সামনে নিবেদন করলুম।

www.pathagar.com

প্ল্যাজেনাপ তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করে এবং তার উত্তর দিয়ে। জর্মনি ভারতীয় শাস্ত্র নিয়ে এত চর্চা করে কেন?

উত্তরে বলেন, 'উভয় জাতিই উচ্চ চিন্তাতে আনন্দ পায়।'

আমরাও স্বীকার করি।

পাঁচ

ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করাতে, ফরাসি উত্তম ছবি আঁকতে, জর্মন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করাতে কৈবল্যানন্দ অনুভব করে আর বাঙালি 'বলেছিলুম, তখুনি বলেছিলুম' বলতে পারলে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করাতে সে সুপটু একথা সপ্রমাণ করতে পারলে জীবনে তার আর কোনও বাসনা থাকে না।

তাই আমিও আজ সোল্লাসে বলছি, 'বলিনি, তখন বলিনি শ্রীযুত মুখুজ্যে মশাইকে লাটসাহেব বানিয়ে ভারত সরকার অতি উত্তম কর্ম করেছেন?' ভদ্রলোক মাইনে নেন নামমাত্র, আর আজ শুনতে পেলুম, তিনি নাকি বলেছেন, এত বড় বিরাট লাট-ভবনের তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি মাত্র দু একখানি ঘর নিয়ে বাদবাকি অন্য কাজের জন্য ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু একটা জিনিসে মনে একটু খটকা লাগল। শুনলুম, লাটবাড়ির ফালতো ঘরগুলোতে নাকি আপিস বসবে।

* * *

আমার জনকয়েক গুণী বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস তার চেয়ে যদি ওই ঘরগুলো দিয়ে কোনওপ্রকারের বৈদগ্ধ্যগত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায়, তবে লাটবাড়ির সম্মান বজায় থাকবে, বাঙালিরও উপকার হবে।

এই ধরুন না, রবীন্দ্রভবন। কলকাতার কবি রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা বাংলা দেশের রাজধানীও বটে। তবু এই কলকাতা শহরেই যদি আপনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ লিখতে চান, তবে আপনাকে একাধিক জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সব জিনিস পাবেন কি না, সে বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লাটবাড়িতে এ ব্যবস্থাটা করলে হয় না?

কিংবা মনে করুন, একখানা উত্তম চিত্রশালা খুললে হয় না?

আরও কত কিছু করা যেতে পারে। আমার পাঠকেরা গুণী লোক— মাথা না চুলকিয়েও গুম গুম করে পঁচিশখানা ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা বাতলে দিতে পারবেন। আমার মনে হয়, গুণীদের এ বিষয়ে চুপ করে থাকা উচিত নয়। আমাকে যদি পত্রযোগে জানান, তবে আমি তাঁদের মোক্তার এবং মুহুরিরূপে পাঠক-ধর্মাবতারের এজলাসে পেশ করতে পারি।

কিন্তু আপিস, না স্যার, লাটবাড়িতে আপিস— ও কোনও কাজের কথা নয়। শালিগ্রাম দিয়ে মশারির পেরেক পোঁতা? (ক্ষিতিমোহনবাবুর কপিরাইট)।

* * *

www.pathagar.com

দুই দোরে ডবল পর্দা, দরজায় হুড়কো, ভেন্টিলেটারে কালো কাগজ সাঁটা তবু দুপুরবেলা ঘরে বসেই আমেজ করতে পারলুম বাইরে কিছু একটা হচ্ছে— ভূতের নৃত্য কিংবা পিশাচিনীর শ্রাদ্ধ।

অতি সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করে দেখি— মারাত্মক কাণ্ড।

আসমানজমিন গাছপালা সবকিছুর যেন জন্ডিস হয়েছে। অতি সূক্ষ্ম ধুলোর ঝড় বইছে— এখানে যাকে বলে আঁধি— আর সেই ধুলো আকাশে-বাতাসে এমনি ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হয়, যেন জন্ডিসের কুয়াশায় সবকিছু আচ্ছন্ন।

মনে হল যেন, পরশুরামের সেই ছবি দেখছি। কুয়াশার ভিতর দিয়ে শোনা গেল 'সব আছে, হরিনাথ, সব আছে।'

নিজাম প্রাসাদে, জানিনে, কোন কাষ্ঠরসিক গুটিকয়েক ঝাউগাছ গজিয়েছেন। বিরাট বিরাট গাছ— এদের আসল জন্মভূমি পাহাড়ে। সমস্ত বৎসর এরা বিরস বিবর্ণ মুখে কাটায়, শুধু শীতকাল এলে দেশের হাওয়া পেয়ে যেন চঞ্চল নৃত্যে নেচে ওঠে।

গ্রীষ্মকালে গরমের তেজে এদের থোকা থোকা সবুজ নিডল (পাতা) ঝলসে গিয়ে একদম হলদে হয়ে যায়, আর যেন কোনও গতিকে গাছের গায়ে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকে।

দেখি ঝড়ের হাওয়া ঠাস ঠাস করে ঝাউয়ের গায়ে থাবড়া মারছে আর খাবলা খাবলা নিডলের গুচ্ছো তুলোর মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে পড়ে গিয়েও এদের নিষ্কৃতি নেই। আঁধির জল্লাদ খুন করে চলে গেল, এখন তারই মুর্দফরাস এদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— বাগানের এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক।

তিনটে বাজল, চারটে বাজল— ঝড়ের বেগ— বেড়েই চলেছে। কী অলক্ষুণে কাণ্ড!

* * *

রাত তখন আটটা। শুনলুম, প্রধানমন্ত্রীর প্লেন অতি কষ্টে নাকি অ্যারোড্রোমে নামতে পেরেছে, আর তার আধঘণ্টাটাক পরেই মাদ্রাজের প্লেন মাটিতে নামতে না পেরে দুর্ঘটনায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে— একটি প্রাণীও বাঁচেনি।

আমি জানি, আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু সমস্ত দুপুর আমার মনে কেমন যেন একটা অজানা ভয় জেগে রয়েছিল, কিন্তু শেষটায় যে এতগুলো জীবন নষ্ট হবে, তার কল্পনাও মনে করতে পারিনি। আর কল্পনা করলেই-বা কী করতে পারতুম?

পরদিন সুহৃদ ডাক্তার মজুমদার এবং লেডি ডাক্তার স্বরূপের সঙ্গে দেখা। এঁরা দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অকুস্থানে যান। যে কজনের তখনও প্রাণ ছিল, তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

আমার মনে শুধু এটুকু সান্ত্বনা যে, আমার বন্ধু মজুমদার এবং আমার শিষ্যা (ডাক্তারিতে না) শ্রীমতী স্বরূপ আর্তজনের সাহায্য করাতে কোনও ত্রুটি তো করেননি— স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা সফদরজঙ্গ হাসপাতালে কর্ম করেন— অ্যারোপ্লেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে এঁদের কোনও সরকারি দায়িত্ব নেই। ভগবান এঁদের মঙ্গল করুন।

* * *

দিল্লিস্থ শান্তিনিকেতন-আশ্রমিক সঙ্ঘ এবং নিউদিল্লি বাঙালি ক্লাব যুগ্মভাবে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীকে ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে দিল্লিতে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রীযুক্ত

www.pathagar.com

প্রমথনাথের লেখার কদর কে কতটা দেন, তার বিচার রায় পিথৌরা করবেন না। কিন্তু একথা ঠিক, বাংলা সাহিত্যের সেবা আজকের দিনে যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত বিশীই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রৌঢ়। তাঁর স্বাস্থ্য তখন অটুট, ওদিকে কবিত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি তখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অক্লান্ত অধ্যাপনা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টিও চলছে। এবং সর্বশেষ কথা, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছিলেন অকৃপণভাবে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুত বিশীর কাব্য এবং সাহিত্যপ্রচেষ্টার প্রশংসা করতেন আবার প্রয়োজন হলে কঠিন সমালোচনাও করতেন। নিতান্ত আত্মজন না হলে রবীন্দ্রনাথ কারও কঠোর সমালোচনা করতে চাইতেন না। (আর সাহিত্যের বাইরে তেল কিংবা কালির জন্য তিনি যেসব সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেগুলোর মূল্য কতটুকু সে তো সবাই জানেন) তাই শ্রীযুত বিশী সেদিক দিয়েও ভাগ্যবান।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাংলা দেশ শ্রীযুত বিশীর সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করতে পারেনি।

* * *

পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকায় বহু ভারতীয় বসবাস করেন। মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবন এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয়।

এসব জায়গায় বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন, খাস ইয়োরোপীয়। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন ভারতীয়। তার পর বোধ করি আরব এবং সর্বশেষে দেশের মাটির ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ নিগ্রোরা।

ইংরেজ যে ভারতীয়দের ভালো চোখে দেখে না, সে তো জানা কথা কিন্তু সেখানকার ভারতীয়রা যখন নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে, তখন আমার মনে বড় লাগে। 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় এই বেদবাক্য বলে গিয়েছেন, সেকথা তাঁরা জানেন না (আমরাই জানি কি?)।

পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত আরাসাহেব পর্যন্ত দিল্লি এসেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকা, ইংরেজ, ভারতীয়, আরব, নিগ্রো সবাই মিলিয়ে একটা অখণ্ড সমাজ যদি না গড়ে তোলা যায় তবে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁর বিশ্বাস এই অখণ্ড সমাজ গড়ে তুলতে পারে প্রধানত তথাকার ভারতীয়রাই। তাই তিনি মনে করেন, এখানকার ভারতীয়েরা যেন পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেই সন্তুষ্ট না হন, তাঁরা যেন সেই অখণ্ড সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে আপন প্রচেষ্টা ধাবিত করেন।

মহাত্মাজির সহকর্মী শ্রীযুত কাকাসাহেব কালেলকর পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে বহু সৎকর্ম করেছেন। আপন অভিজ্ঞতা একখানা উত্তম হিন্দি পুস্তকে প্রকাশ করেছেন— সে পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে।

আরেকটি গুণী লোক পণ্ডিত শ্রীঋষিরাম। ইনি উপস্থিত আফ্রিকাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করছেন। আমাকে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেসব ছবি পাঠান, সেগুলো দেখে ভগবানকে বলি, আসছে জন্মে যেন নিগ্রো হয়ে জন্মাই।

উঁহু; সেটি হবার জো নেই।

www.pathagar.com

তন্দুরি, মুর্গি মাফিক দিল্লির গ্রীষ্ম জাহান্নম তন্দুরি-আদমি বনে যাওয়ার পর তো। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করাতে দিল্লি যা উৎসাহ দেখায়, কলকাতার তুলনায় সে কিছু কম না। অবশ্য দিল্লি শহরে গণ্ডায় গণ্ডায় সুসাহিত্যিক নেই; কাজেই রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বহুমুখী এবং বিস্তর আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন ঠিক ততখানি হয়তো হয়ে ওঠে না।

এবারে কলকাতা থেকে এলেন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী সেই অভাব খানিকটে পূরণ করতে। কালীবাড়ি ক্লাবে শ্রীযুত বিশী বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত বিশী সম্বন্ধে দিল্লির নগণ্য নাগরিকরূপে রায় পিথৌরা কী ধারণা পোষণ করেন, সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে নিবেদন করেছি এবং এ সপ্তাহে সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, তাঁর ধারণা ভুল নয়।

অন্যান্য স্থলে ভাষণ দেন শ্রীযুত হুমায়ুন কবীর এবং শ্রীযুত দেবেশ দাশ। একই দিনে প্রায় সবকটি পরব হয়েছিল বলে রায় পিথৌরা দু একটির বেশি সামলে উঠতে পারেননি। তবে এঁদের পাণ্ডিত্যের খবর রাখি বলে লোকমুখে যখন শুনলুম এঁদের বক্তৃতা সত্যই উপভোগ্য হয়েছিল তখন সেকথা অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারলুম।

'শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘ' *চিত্রাঙ্গদা* গীতিনাট্যের প্রায় সবকটি গান গাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুত নীলমাধব সিংহ নিষ্ঠার সঙ্গে গানগুলোর পরিচালনা করেন এবং অনুষ্ঠানটি যে সফল হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছেলেমেয়েরা গানগুলো অতি সযত্নে বহু পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিল। শ্রীমান কৌশিক ও শ্রীমতী নন্দিতা এবং আরও অনেকেই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সাহায্য করেন। রায় পিথৌরাও মাঝে মাঝে 'উপর চাল' মারার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কেউ বড় একটা আমল দেয়নি।

* * *

অনেকেই বলেন, একই দিনে অনেকগুলো পরব না করে কোনও এক কেন্দ্রীয় স্থলে মাত্র একটি বিরাট সভা করা উচিত। আমি এ মত পোষণ করিনে। দিল্লি বিরাট শহর এবং এক স্থল থেকে অন্য স্থল যাওয়ার যা কুব্যবস্থা তাতে করে সেই কেন্দ্রীয় সভায় দিল্লির অধিকাংশ রবি-ভক্তরাই উপস্থিত হতে পারবেন না। তাই একই দিনে কালীবাড়ি, লেডি আরউইন স্কুল, লোদি কলোনি এবং বিনয়নগরে যদি রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তবে সেই ব্যবস্থাই ভালো।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় একটি সভা হলে আরও ভালো। গেল বৎসর 'টেগোর সোসাইটি' নিউদিল্লি এবং টাউন হলে তার আগের বৎসর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় সভার আয়োজন করেছিলেন। এ বছর কেন হল না বোঝা গেল না। তবে একটা কারণ এই যে, দিল্লিতে 'প্রফেশনাল' সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যসেবী কেউ নেই— সকলকেই কোনও-না-কোনও দপ্তরে সুবো-শাম কলম পিষতে হয়, তাই সবাই প্রতি বৎসর সবকিছু করে উঠতে পারেন না।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ-জন্মোৎসব আরও কিছুদিন ধরে চলবে। এ জিনিস যত বেশি দিন ধরে চলে ততই ভালো।

* * *

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী বিদায় নেবার সময় বলেন ভারতবর্ষের কোনও খাদ্যমন্ত্রীই কিচ্ছুটি করতে পারবেন না, যদি তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে চাপরাসিরূপে না পান।

তাতেও কিছু হবে না। মন্ত্রীদের চাপরাসি মহাশয়গণের প্রধান কর্ম চেয়ারে বসে বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে মেঘগর্জনে ঘুমনো। পর্জন্য যদি চাপরাসি হন তবে তিনি ওই গর্জনই ছাড়বেন— ওই একই পদ্ধতিতে— বৃষ্টি নামাবেন না।

দ্বিতীয়ত পর্জন্যকে চাপরাসি ইতঃপূর্বে একবার হতে হয়েছিল তবে কি না যার চাপরাসি তিনি হয়েছিলেন সে বেচারি খুন হয় এক মানুষেরই দ্বারা।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু আবছা মনে পড়ছে—

ইন্দ্র যম আদি করে বাঁধা আছে যার ঘরে
ছয় ঋতু খাটে বারো মাস
সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে মৃদু গতি হয়ে
দেব রক্ষ যক্ষ যার দাস।

সেই শ্রীমান রাবণ যখন বেঘোরে প্রাণ দিলেন, তখনই ইন্দ্রকে পুনরায় চাপরাসি করতে যাবে! কে?

আমার মনে হয়, মুন্সীজি উত্তমরূপে বিবেচনা না করে এ প্রস্তাবটি করেছেন। যদি ধরেই নিই, তিনি ইন্দ্রকে কবজাতে এনে ফেলেছেন— তা হলে? তা হলে তো তাঁকে রাবণ বলে ডাকতে হবে। রাম, রাম!

* * *

কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়।

ইন্দ্র কে, বৃষ্টিই বা কী?

শাস্ত্র বলেন, জল কারারুদ্ধ করে রাখে বৃত্র এবং সেই বৃত্রকে বধ করে ইন্দ্র জলকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জন্য নাবিয়ে নিয়ে আসেন। কোনও মুনি বলেন, হিমালয়ের গিরিকন্দরে বৃত্র জলকে বরফে পরিণত করে দেয় বলে সে জল আর জনপদভূমিতে নেমে আসতে পারে না। ইন্দ্র হচ্ছেন বসন্তের সূর্য। শীতের শেষে তাঁর রৌদ্রবাণ বরফকে খণ্ড খণ্ড করে দেয় আর গভীর গর্জনে জলধারা নেমে আসে গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। অন্য মুনি বলেন, বৃত্র জলকে কারারুদ্ধ করে রাখে কালো মেঘে। ইন্দ্র তাঁর বজ্র হানেন, বিদ্যুৎ চম্‌কায়, দামিনী ধমকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে বৃষ্টিধারা, নববরিষণ।

এই মুনিগণের মতবাদের প্রতি লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন—

দহনশয়নে তপ্তধরণী
পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের
অমৃতবারির বার্তা।

www.pathagar.com

মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ
নব-অঙ্কুর জয়পতাকায়
ধরাতল সমাকীর্ণ
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর।

আমার মনে হয়, ইন্দ্রদেব তাঁর কর্ম এখনও করে যাচ্ছেন বৈদিক যুগে যেরকম করে গিয়েছিলেন। বেদের ঋষি সে যুগে তাঁর প্রশস্তি যেরকম ধারা গেয়েছিলেন, এ যুগে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রশস্তি ঠিক সেই রকমই গেয়েছেন।

বৃষ্টি হয়, বরফ গলেও জল নামে, কিন্তু আমরা সেই জলের ব্যবহার করতে জানিনে।

মিশরে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি হয় সুদানে। কিন্তু মিশরীয়রা নাইল দিয়ে যে জল নেমে আসে, সেই জল নালা কেটে কেটে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আপন জমি ভেজায়— মাঠে মাঠে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে ওঠে।

আমরা সেই কর্মটি করিনে। আমাদের নদী-নালা দিয়ে কি কিছু কম জল সাগরে গিয়ে পড়ে? আমরা কি সে জলের সদ্ব্যবহার করছি?

* * *

মুন্সীজি যে ব্যাকরণে ভুলটি করলেন, তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

তিনি সুসাহিত্যিক— গুজরাতিতে উত্তম উত্তম পুস্তক লিখেছেন, কিন্তু আমার বড় দুঃখ সেগুলো বাংলাতে অনূদিত হয়নি।

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লেখাবার জন্যও মুন্সীজি ব্যাপক বন্দোবস্ত করেছেন।

আমার মনে হয়, মুন্সীজির পক্ষে রাজনীতি বর্জন করাই ভালো।

সাত

শেক্সপিয়র বলিয়াছেন, 'এই সত্য জানাইবার জন্য ভূতের কী প্রয়োজন ছিল, মহারাজ—' ড. শাখ্‌ট্ যে অতিশয় গুণী— লোককে সেকথা জানাইবার জন্য রায় পিথৌরারও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আশ্চর্য হইলাম লোকটির অসাধারণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণতা লক্ষ করিয়া উদয়াস্ত নানাপ্রকারের লোকের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনার পর সামান্য মানুষ অপরাহ্ণের দিকে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়ে। তখন সে জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন শুনিতে পায় না, শুনিলেও বিষয়বস্তুটি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদুত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হয় না।

এবং আমরা যে কয়টি প্রাণী তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের প্রত্যেককে অর্থনীতি ক্ষেত্রে অপোগণ্ড শিশু বলিলে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ হয় না। অথচ কী অদ্ভুত ধৈর্য ও মনোনিবেশ সহকারে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া সোৎসাহে উত্তর দিতে লাগিলেন। কণ্ঠে বর্ণনামাত্র ক্লান্তি নাই, বচনভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র ক্লৈব্য নাই।

এই বিশাল সংসারে অরসিক জনের অভাব নেই। তাঁহাদের একজন ড. শাখ্‌টের স্বন্ধে জর্মনির পুনরায় সশস্ত্রীকরণের দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। ড. শাখ্‌ট্ তাহার কী উত্তর

www.pathagar.com

দিলেন, সেই কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে বিরাট আট ভলুমে নুরেনবের্গ মোকদ্দমার দলিল দস্তাবেজ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই জ্ঞানী পাঠক এই ব্যাপারে তাবৎ বর্ণনা পাইবেন।

আমার ইচ্ছা হইতেছিল হঠাৎ অট্টহাস্য করিবার। যে মার্কিন, ফরাসি, ইংরেজ রুশের প্রতিভূ শাণিতবুদ্ধি উকিলগণ শাখ্‌ট্‌কে নুরেনবের্গে কণামাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই, অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ যুক্তি এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা পদে পদে বিপক্ষকে নিদারুণ বিড়ম্বিত করিলেন, তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন, বামনের শশাঙ্ক-করতলকরণ ইত্যাদি যাবতীয় তুলনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া ফেলে।

বুদ্ধিমানের সংখ্যা ইতরজনের তুলনায় কম হইলেও সেই সভাতে তাঁহাদের অনটন ছিল না। সহসা তাঁহারাই একজন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন।

'শবব্যবচ্ছেদ কর্মে কী মোক্ষলাভ? ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ; তাহার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ সমস্যা। বরঞ্চ যদি শাখ্‌ট্ মহাশয় সেইসব ব্যাপারে আমাদিগকে জ্ঞানদান করেন, তবেই আমাদের সার্থক উপকার হয়।'

সোল্লাসে সকলেই সম্মতি জানাইলাম।

পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। শাখ্‌ট্ বলিলেন, 'আমি পরিকল্পনাটি পড়িবার জন্য সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। আগামীকল্য কাশ্মিরের পথে পাঠ করিবার বাসনা রাখি। কিন্তু কী প্রয়োজন এইসব বিশাল কলেবর পরিকল্পনা করিবার? তাহা হইতে অনেক শ্রেয়ঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করিয়া দিবার এবং আমার বিশ্বাস সেইসব কর্মই সর্বপ্রথম আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে বিপুল বিত্তের প্রয়োজন হয় না এবং যে স্থলে এক, দুই কিংবা তিন বৎসরের ভিতরই ব্যয়িত অর্থ সুফল প্রদান করিয়া হস্তে পুনরাগমন করিতে থাকে। তাহাতে রাজকোষের অর্থ সঞ্চয় হইবে, সেই অর্থ তৎক্ষণাৎ অন্য কর্মে নিয়োজিত করিয়া দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। জনগণের মনে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা দৃঢ়তর হইবে এবং এই পন্থাতেই আশু সুফল লাভের সম্ভাবনা।'

ভারতবর্ষে বহু বিত্ত সঞ্চিত আছে, সেকথা কাহারও অজ্ঞাত নয়। এই অর্থ প্রধানত যুদ্ধের সময় উপার্জিত হয় ও বণিকগণ সে বিত্তের রাজকর বা ইনকামট্যাক্স দেন নাই বলিয়া এক্ষণে সে অর্থ কোনওপ্রকারের পরিকল্পনায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না। রাষ্ট্র শ্যেন দৃষ্টিতে বিত্তশালীদের প্রতি কর্ম পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং আপনার ন্যায্য রাজকর উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছেন এবং ধনিকগণও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সেই অর্থ গোপন রাখিতেছেন।

ড. শাখ্‌টের বিশ্বাস, দেশের উন্নতির জন্য যখন এই অর্থের একান্ত প্রয়োজন এবং অন্য কোনও সূত্র হইতে কোনওপ্রকারের অর্থ লাভের আশাও নাই, তখন অতীতে কে কোন উপায়ে বিত্তশালী হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া এবং ধনিকগণকে লাভের প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ বাহির করিয়া দেশ নির্মাণকর্মে নিয়োজিত করাই ভারতের পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা।

ড. শাখ্‌ট্ পুনঃপুন বলিলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, যখন একথা স্থিরনিশ্চিয় হইয়া গিয়াছে। যে দেশ-নির্মাণকর্ম আরম্ভ করিতেই হইবে, তখন আর এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর অর্থ কোথা

www.pathagar.com

হইতে আসিবে। যেকোনো কৌশলেই হউক অর্থ একত্র করিতে হইবে এং কর্ম আরম্ভ করিয়া দিতেই হইবে।'

আমি ভাবিয়াছিলাম, ডা. শাখ্ট্ অর্থনৈতিক পণ্ডিত; তাহার কণ্ঠে শুনিব শান্ত সমাহিত উপদেশ। বিস্মিত হইলাম যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রকাশ করিলেন এবং দেশ-নির্মাণ সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য শুধু যুক্তিতর্ক নয়, স্থির বিশ্বাসের গভীর অনুভূতিও নিয়োগ করিলেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ভারতের প্রতি তাঁহার প্রেম অকৃত্রিম ও তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

* * *

প্রায়ই দেখিতে পাই, ইংরেজ এবং মার্কিন এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিজ্ঞাপন কিংবা বরপক্ষের স্বগুণ কীর্তন লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা করুন, আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

কিন্তু প্রশ্ন, তাঁহারা ভারতীয় বিজ্ঞাপনের দিকেই কটাক্ষ হানেন কেন?

সুইজারল্যান্ড হইতে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত একখানি বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পড়িলাম। আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুযায়ী তাহার অনুবাদ নিবেদন করিলাম।

'আমি আমার এক ত্রিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী বান্ধবীর জন্য একজন জীবনসঙ্গী অনুসন্ধান করিতেছি। আমার আশা, সেই জীবনসঙ্গী যেন আমার বান্ধবীর পঞ্চবর্ষীয় পুত্রের স্নেহময় পিতার আসন গ্রহণ করেন। আমার বান্ধবী উত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তন্বঙ্গী, ১৭৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ (প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি— অনুবাদক), ক্যাথলিক, গৃহকর্মে সুনিপুণা এবং বহু রমণীসুলভ মোহিনী গুণ ধরেন। উচ্চশিক্ষা ও দৃঢ় চরিত্রবল ছিল বলিয়া জীবনে বহু দুর্যোগ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার রসবোধ হইতে বঞ্চিত হন নাই। পাঠক, তুমি যদি এই জাতীয় অমূল্য সম্পদের গুণগ্রাহী হও এবং প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী আকাঙ্ক্ষা কর, তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ফটোগ্রাফসহ নিম্নে উদ্ধৃত পোস্টবক্সে পত্র লেখ। বিষয়টি গোপনীয়ভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া উভয় পক্ষ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।'

বিস্তর মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না, এই কাতররোদন এবং ভারতীয় অরক্ষণীয়ার মধ্যে মূলত পার্থক্য কোথায়? এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, রমণী ভদ্রবংশোদ্ভবা, আমরা বলি মুখোপাধ্যায়, কুলীন, খড়দা মেল। এস্থলে বলা হইয়াছে, তিনি ক্যাথলিক, আমরা বলি তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কিংবা কায়স্থ। গৃহকর্মে সুনিপুণার প্রতি লোভ হটেনট্ট হইতে প্যারিসের বিদগ্ধজন সকলেরই আছে এবং আমরা সুন্দরী বলিয়াই ক্ষান্ত দিই, এস্থলে কিন্তু দৈর্ঘ্যের উল্লেখ পর্যন্ত রহিয়াছে। অবশ্য আমরা জীবনের ঝঞ্ঝাবার্তার বিষয় উল্লেখ করি না, কারণ আমাদের বিজ্ঞাপন সচরাচর বিধবা রমণীর জন্য নহে। সুতরাং পঞ্চবর্ষীয় পুত্রের উল্লেখও আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজন।

শুধু তাই নয়, বরপণ বস্তুটিও ইয়োরোপে অবিদিত নয়। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়।—

'শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবা বিবাহ ও বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক। বিশ হাজার ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন।'

স্পষ্টই বুঝা গেল, এস্থলে অর্থ অনর্থ নয়। যে কুমারীকে যুবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহার কুল-গোত্র-রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক হইলেই হইল।

www.pathagar.com

কিন্তু ইহাকেও পরাজিত করিতে পারে এমন বিজ্ঞাপনও দেখিয়াছি।—

'নিজস্ব বাড়ি আছে এমন রমণীকে স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত যুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। বাড়ির ফটোগ্রাফ পাঠান।'

আট

বিবেচনা করি এই শীতকালেও বহু শত বাঙালি দিল্লি আসিবেন। যাঁহারা নিছক পারমিটের জন্য এখানে আসিবেন ভগবান তাঁহাদিগকে মঙ্গল করুন। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের কোনওপ্রকারের যোগাযোগের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু যাঁহারা নিতান্ত মহানগরী দিল্লি দেখিবার জন্যই আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কদলী বিক্রয় করিবার দুষ্টবুদ্ধি যাঁহাদের নাই তাঁহাদের উদ্দেশে দুই-একটি নিবেদন আছে।

প্রথমত পাড়ার পাঁচজনের কাছে বড়াই করিবার জন্য অনর্থক পঞ্চাশটা কবর মসজিদ দুর্গ মন্দির দেখিয়া কোনও লাভ নাই। সবকিছু আখেরে ঘুলাইয়া যাইবে— লোদিদের বাগানে কুতুবমিনার চাপাইয়া বসিবেন, লালকিল্লার মাঝখানে শের শাহের মসজিদ দেখিয়া কী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্বপ্ন দেখিবেন, বিড়লা মন্দিরের সঙ্গে কুতুবের যোগমায়া মন্দির মিশাইয়া লইয়া অতিশয় অদ্ভুত স্থাপত্য নির্মাণ করিয়া বসিবেন। অতএব নিবেদন, অল্প দেখিবেন কিন্তু অতি উত্তমরূপে দেখিবেন। একটি ক্যামেরা— তা সে বক্স কিংবা বেবিই হউক— সঙ্গে আনিবেন এবং যদিও ভালো ভালো দালান ইমারতের উত্তম উত্তম ফটো সর্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায় তবুও আপন রুচি অনুযায়ী ছবি তোলাতে যে বিশেষ আনন্দ আছে, সেই তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয়ত ভারতের একখানা ইতিহাস সঙ্গে আনিবেন।

ভালো বায়োস্কোপ দেখিবার পর হৃদয়ে স্বতই বাসনা জাগে পুস্তকখানি পড়িবার। ঐতিহাসিক স্থাপত্য দর্শনের পর ওই একই অভিলাষ জন্মে। যখন শুনিবেন, এই ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বাদশা ফররুখসিয়ার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাহানদার শাহকে বন্দি করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং আট বৎসর যাইতে না যাইতেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সেই ফররুখসিয়ারকে অন্ধ করিয়া ওই ত্রিপোলিয়া তোরণের উপরেই বন্দি করেন ও পরে তাঁহাদের আদেশেই তিন নরপিশাচ তাঁহাকে ঠগীদের পদ্ধতিতে ফাঁসি লাগাইয়া খুন করে, তখন আপনার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইবে তাবৎ ইতিহাস অদ্যোপান্ত পাঠ করিবার। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন গাইড মাত্রই বিশুদ্ধ গঞ্জিকা না হউক কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী। গাইড হিসাবে আমারও ন্যূনাধিক সে দুর্বলতা আছে; কিন্তু ইতিহাসের অত্যাচারে সেই দুর্বলতা সম্যক প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায় না।

তৃতীয় স্থাপত্য দর্শনকর্ম আরম্ভ করার পূর্বেই স্মরণ রাখিবেন দিল্লিতে হিন্দু স্থাপত্যের বিশেষ কিছু নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়াও দিল্লিতে প্রাক কুশান যুগের কোনও কিছু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। অতএব হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ জাতীয় কোনও বস্তু দেখিবার আশা পোষণ না করাই প্রশস্ততর।

www.pathagar.com

একেবারে যে কিছুই নাই তাহাও নয়। কুতুবমিনারের কাছেই রাজা চন্দ্রের(এই চন্দ্রটি কে তাহা ঐতিহাসিকেরা এখনও বলিতে পারেন না।) একটি মনোহর লৌহস্তম্ভ আছে; ফিরোজ তুগলুক নির্মিত ফিরোজ শাহ কোটলাতে একটি অশোক স্তম্ভ এবং উত্তর দিল্লিতে আর একটি; গিয়াসউদ্দিন তুগলুক নির্মিত তুগলুকাবাদের প্রায় ক্রোশ পরিমাণ দূরে সূর্যকুণ্ড (এই কুণ্ডটি সত্যই হিন্দু না মুসলমান সে বিষয়ে মুনিদের ভিতর এখনও মতভেদ আছে), এবং কুতুবমিনারের কাছে যে কুওওৎ উল-ইসলাম মসজিদ আছে তাহার স্তম্ভগুলি— এই স্তম্ভগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির হইতে নেওয়া হইয়াছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

সংবাদ শুনিলাম, যে স্থলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেই স্থলে রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পালি ভাষার চর্চার নিমিত্ত এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে নাকি তিব্বত, চীন, বর্মা, শ্যাম এবং সিংহলের ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

সংস্কৃতের কোনও উল্লেখ নাই!

হায়, আমি মূর্খ, আমার ধারণা ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা হইত তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্মের এবং মহাযানের অধিকাংশ এবং হীনযানের বহুলাংশ শাস্ত্র পালিতে নয়, সংস্কৃতে লিখিত। আমি মূর্খ, আমি তো জানিতাম, হিউয়েং সাঙ এই মহাযান শাস্ত্রই সংস্কৃতের মাধ্যমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি নিতান্ত জড়ভরত, আমি তো জানিতাম নালন্দাতে শিক্ষাদান প্রদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। আমি অতিশয় নির্বোধ, আমার কুসংস্কার ছিল সংস্কৃতের সাহায্য ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের উচ্চতম বিকাশ, অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন ও তর্ক কণামাত্র আয়ত্ত করা যায় না।

কিন্তু সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। নবনির্মিত সংস্কৃত বিবর্জিত নালন্দার নব-বিদ্যায়তনের মোহমুদ্গর আমার মোহ চূর্ণ চূর্ণ করিল, সদ্‌গুরুর ন্যায় অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিল।

এখন শুনিব, গ্রিক ভাষা শিখা থাকিলেই ইয়োরোপীয়ন দর্শন করায়ত্ত হয়। ফরাসি জর্মন (কিংবা কেবল মাত্র ইংরেজির মাধ্যমে) শিখিয়া দেকার্ত, কান্ট, হেগেল পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। প্লাতো, এরিসততেল অধ্যয়ন করা থাকিলেই তাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শন হস্ততলগত।

* * *

কোন রাজাকে নাকি এক বুদ্ধিমান বিশেষ একপ্রস্থ 'পোশাক' নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সে পোশাক নাকি অসাধু জনের চক্ষুগোচর হইত না। রাজা একদিন সেই 'পোশাক পরিধান' করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে পাত্র অমাত্য অসাধুরূপে সন্দিহান হইবার ভয়ে করতালি ধ্বনি করতঃ 'পোশাকের' ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র বালক চিৎকার করিয়া বলিল, 'কিন্তু পোশাক কোথায়, মহারাজ তো কিছুই পরেন নাই।'

চীন হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় অমাত্য ও অন্যান্য গুণীজন বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতেছেন চীন দেশ কম্যুনিস্ট নয়। ইঁহাদের কোনও অসাধু অভিসন্ধি নাই সে সম্বন্ধে আমি

www.pathagar.com

স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু আমি প্রত্যাশা করিতেছি সেই বালকের। কখন না চিৎকার করিয়া বলে 'চীন তো কম্যুনিস্ট' এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

* * *

আমি এই তত্ত্বটি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম না। ইংরেজ যখন বলে 'জানো, লোকটি ভারতীয়, কিন্তু একদম আমাদের মতো; ভারতীয়দের সঙ্গে তাহার কোনও সামঞ্জস্য নাই' কিংবা যখন কোনও বাঙালি বলে 'জানো, লোকটা আসলে ছাতুখোর কিন্তু আচার ব্যবহারে ঠিক বাঙালির মতো', তখন আমি আশ্চর্য হই। 'ছাতুখোর' থাকিয়াও কি বাঙালির প্রশংসা অর্জন করতে পারে না?

অর্থাৎ চীনকে কম্যুনিস্টরূপে স্বীকার করিয়াও কি তাহার প্রশংসা করা যায় না কিংবা তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না? তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে 'চীন কম্যুনিস্ট নয়, সে আমাদের মতো' তবেই বন্ধুত্ব সম্ভবে? এবং চীন কি আমাদের এই চিৎকার শুনিয়া উল্লসিত হইবে?

ইংরেজ যখন বলে 'এই ভারতীয় মোটেই ভারতীয়ের মতো নয়, একদম আমাদের মতো' তখন কি আমরা উল্লাস বোধ করি?

* * *

মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণকরতঃ হিন্দু-সন্তান ইহলোক-পরলোক নষ্ট করুক এ অভিসন্ধি আমি কিছুতেই করিতে পারি না; তৎপূর্বে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।

কিন্তু আমার বহু 'পারসিক, মুসলমান, খ্রিস্টানি' বন্ধু আছেন, তাঁহাদের কল্যাণার্থে নিবেদন করি তাঁহারা যদি কখনও দিল্লি আসেন তবে যেন একবার আফগানি নান (তন্দুরপক্ব রুটিবিশেষ) এবং 'তন্দুরি মুর্গি' ভক্ষণ করিয়া 'দেহলি' বাস সার্থক করেন।

এই দুই বস্তু বস্তুত গান্ধার দেশীয়— অর্থাৎ পেশাওয়ার হইতে কাবুল পর্যন্ত এই দুই বস্তু সানন্দে ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু বিচলিত হইবেন না, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য পাঠান দন্ত কিংবা উদরের প্রয়োজন নাই। ঈষৎ অবান্তর, তবুও নিবেদন করি পাঠানের দন্ত বাঙালি অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট। বড়ই কোমল জিনিস এবং তন্দুরের অভ্যন্তরে সুপক্ব করা হয় বলিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য ধারণ করে। গান্ধার দেশে লঙ্কার প্রচলন সংকীর্ণ বলিয়া তন্দুরিতে কোনওপ্রকারের তীব্র আস্বাদ নাই।

একদা এই দুই বস্তু দেহলি প্রান্তে প্রচলিত ছিল না। দেশবিভক্তির ফলে এক পেশাওয়ারি শিখ মহোদয় এই দুই মহাশয়কে দিল্লিতে প্রচলন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

কিন্তু সাধু ভক্ষক, সাবধান। মস্তক কর্তন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলেও তন্দুরি ছুরি-কাঁটা দিয়া খাইবে না। উভয় হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তন্দুরিকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ সোল্লাসে সশব্দে হোটেল রেস্তোরাঁ সচকিত করিয়া নির্লজ্জভাবে 'কড়কড়ায়েত মড়মড়ায়েত' করিবে। যদি সাহস না থাকে আমাকে নিমন্ত্রণ করিও।

* * *

স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত বন্ধুবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন।

ইউ.এন.ও. রায়ের বিধবাকে সারাজীবনের জন্য মাসিক চারি শত টাকার ভাতা এবং তদুপরি রায়ের পুত্র ও কন্যার শিক্ষাব্যয় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন!

ইউ.এন.ও.-র জয় হউক।

www.pathagar.com

নয়

এক ইংরেজ সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে বাষ্পাকুলকণ্ঠ অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, 'হায় হায়, কোটিপতি স্মিথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।'

সখা সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি আপনার নিকট-আত্মীয় ছিলেন?'

প্রথম ইংরেজ বলিল, 'না, আমার দুঃখ তো সেই জন্যই।'

ডক্টর মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের ছোটলাট হওয়াতে আমার শোক বহুলাংশে সেই জাতীয়ই। বরঞ্চ বলিব, অনেক বেশি; কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম কিন্তু হায়, তখন কি জানিতাম যে তিনি একদিন লাট সাহেবের গদিতে আরোহণ করিবেন! এই সরল শান্ত অমায়িক লোককে কি কখনও রাজ্যপালরূপে কল্পনা করিতে পারিয়াছি? তাহা হইলে কি তাঁহার এইরকম অবহেলা করিতাম? তিনি যখন সাদর আমন্ত্রণ করিয়া বলিতেন, 'আসুন, আসুন : বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় সুপক্ব আম্র আগমন করিয়াছে; ভক্ষণ করিয়া আপনি তৃপ্ত হউন, আমিও আনন্দ লাভ করি', হায়, তখন জানিলে কি আমি ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতাম না, অতিশয় সবিনয় তাঁহার কুশল সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার চিত্তজয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইতাম না? হায়, কী মূর্খ আমি, ধিক্ আমাকে!

কিন্তু প্রলাপ বকিতেছি। রে রসনে, তুমি সংযত হও।

আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সজ্জন ব্যক্তি। যদিস্যাৎ সাক্ষাৎ হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রসাল ভক্ষণে পুনরপি সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন।

সত্যই বলিতেছি, আমি ও আমার প্রতিবেশীগণ সকলেই মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যপালত্ব প্রাপ্তিতে অবিমিশ্র উল্লাস উপভোগ করিয়াছি। একে অন্যকে আনন্দ অভিনন্দন জানাইয়াছি এবং বলিয়াছি, 'কলিকাতায় আর বাসস্থানের দুর্ভাবনা রহিল না।'

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন আর্তসেবা, জ্ঞানসঞ্চার এবং সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ভগবানের সাহায্য ও গুরুজনের আশীর্বাদ তাঁহার উপরে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু দৃষ্টত সর্বপ্রকার সৎকর্ম তিনি স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি যে পদমর্যাদা ও তৎসংযুক্ত রাজদণ্ড হস্তে পাইলেন তাহার সাহায্যে প্রচুরতর সৎকর্ম সাধন করিতে পারিবেন এমত আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয়। আর যদি না করিতে পারেন তবে বুঝিব ফিরিঙ্গি-প্রবর্তিত এ পদ এখনও 'স্বদেশী' হয় নাই। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও যদি এ পদের রূপ পরিবর্তন না করিতে পারেন তবে আর কেহই পারিবে না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান, অগণিত মুসলমান তাঁহাকে অন্নদাতা বস্ত্রদাতারূপে ভক্তি করে আর হিন্দু সমাজের তিনি স্বজন ছিলেন তো বটেই। তিন সম্প্রদায়ই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সানন্দ অভিনন্দন জানাইবেন।

মুখোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ দেশের দশের মঙ্গল সাধন করুন।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

* * *

শ্রীযুত কাটজুর বঙ্গত্যাগে বহু লোক তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। তিনি অমায়িক, নিরহঙ্কারী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ধীরে ধীরে বঙ্গভূমির প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্তও হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

দিল্লিবাসী বাঙালিরা শ্রীযুত কাটজুর দিল্লি আগমনে উল্লসিত হইলেন। ধর্ম জানেন, আজ বাঙালির বেদনা বুঝিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও 'মুরুব্বি' নাই। বঙ্গদেশাগত বাঙালি প্রয়োজনবশত দিল্লিতে আগমন করিলে এক্ষণে অন্তত শ্রীযুত কাটজুর দ্বারস্থ হইতে পারিবে; দিল্লিবাসী বাঙালিও মনে মনে সে আশা পোষণ করে।

শ্রীযুত কাটজু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে হতাশ করিবেন না।

* * *

সাংস্কৃতিক যোগসূত্র দৃঢ়তর এবং নবীন যোগসূত্র স্থাপনা করিবার জন্য কতিপয় চৈনিক বিদগ্ধ পুরুষরমণী মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদের শুভাগমনে সর্বসম্প্রদায়ের লোককে এক হইয়া ইঁহাদিগকে স্বাগত অভিবাদন জানাইতে দেখিলাম। কংগ্রেস সরকার যদিও প্রধান অতিথিসেবক, তবু দেখিয়াছি কম্যুনিস্ট ভ্রাতাদের আনন্দোল্লাস কিছুমাত্র কম নহে এবং অন্যান্য শ্রেণিও বিস্মৃতির ভয়ে যত্রতত্র ঘনঘন পদচারণা করিতেছেন।

চৈনিকমণ্ডলী উদয়াস্ত যেসব অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হইতেছেন তাহার নির্ঘণ্ট দিতে গেলেই এ পত্রের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যাইবে। এই রবিবারেই দেখিতেছি তিনটি পর্বে এই অভাজনকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। অভিজাত প্রতিষ্ঠান 'অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটস্ সোসাইটি', ব্রাত্য 'শিল্পীচক্র' ওই দিন ইহাদিগকে সম্মান দেখাইবেন ও সন্ধ্যায় চৈনিক রাজদূত বিদেশাগত বিদগ্ধমণ্ডলী এবং দিল্লি নাগরিকদিগকে পানাহারে তৃপ্ত করিবেন। চৈনিকদের অতিথিবাৎসল্য তাঁহাদিগকে কতদূর মুক্তহস্ত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা আমার আছে— এই পর্বেও তাহার ব্যত্যয় হইবে না। তাহার বর্ণনা একদিন সুযোগ সুবিধামতো নিবেদন করিব।

বিদগ্ধমণ্ডলীকে অভর্থনা করিবার সময় নানা মহাজন নানা জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ কেহই করেন নাই বলিয়া অতিশয় সভয়ে তাহা নিবেদন করি।

সকলেই জানেন বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু মূল সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থ চিরতরে লোপ পাইয়াছে; কিন্তু এইসব গ্রন্থের চীনা (এবং তিব্বতীয়) অনুবাদ এখনও চীন দেশে পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থ পুনরায় ভারতীয় ভাষাতে (কিংবা ইংরেজিতে) অনুবাদ না করিলে বৌদ্ধধর্মের সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপ আমাদের সম্মুখে বিকশিত হইবে না এবং এই সুবৃহৎকর্ম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

এই চৈনিক বিদগ্ধমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যদি সরকার এই সুবর্ণ সুযোগে একটা সুব্যবস্থা করিয়া লইতেন তবে আমরা উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইতাম।

যে দুইটি ভারতীয় উপর্যুক্ত বিষয়ে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, কই, তাঁহাদের কাহাকেও তো এই উপলক্ষে দিল্লিতে দেখিলাম না।

* * *

ইন্দ্রলুপ্তজন বিল্ববৃক্ষতলে একাধিক বার যায় না— ইহা আপ্তবাক্য।

ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আর যাই না।

'রে রে পাষণ্ড' শব্দোচ্চারণ করিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধে অবতরণ করিলেন না। মল্লপক্ষদ্বয় একে অন্যকে ভীতনেত্রে পর্যবেক্ষণকরতঃ অতিশয় সন্তর্পণে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

www.pathagar.com

দর্শকমণ্ডলী ততোধিক সন্তর্পণে করতালিধ্বনি করিলেন। দশ মিনিট যাইতে না যাইতে যখন প্রথম মল্ল গতাসু হইলেন তখন যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল সে ধ্বনি 'রক্তদুর্গ' মস্তকে থাকুন 'দেহলি-তোরণ' পর্যন্ত পৌঁছিল না। ক্রীড়ারম্ভেই অন্যতম মল্লের পরলোকগমন যে কী গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিস্থিতি তাহা কি দর্শকমণ্ডলী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না? তবে কি মুহুর্মুহু মল্লপতন না হইলে দর্শকজনমধ্যে আনন্দোল্লাসের সঞ্চার হয় না? বহ্বান্ন ভক্ষণই কি সুরুচির লক্ষণ? ভূমাতে সুখ তাহা জানি, কিন্তু অল্পেই বা কি কম? ঋষিবাক্য আছে, যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী মহানগরী ত্যাগ করার পূর্বে বক্তৃতা-ভাষণে বিপুল শ্লেষ বর্ষণ করিয়া যান। প্রতি আমন্ত্রণে প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণে তিনি সাতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ববিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই একটিতে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, 'হে দিল্লি যুবক সম্প্রদায়, যখনই দেখি তোমরা মাতা, কন্যা কিংবা প্রিয়াকে দ্বিচক্রযানের পশ্চাদ্দেশে বসাইয়া তাঁহাদের ভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছ তখন আমি উল্লাস বোধ করি।'

মল্লভূমির তোরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, অসংখ্য যুবক উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বহু বালাকে আনয়ন করিলেন।

এই দৃশ্য কলিকাতায় বিরল।

এক ইংরেজই বলিয়াছেন, দ্বাবিংশাধিক লোমাবৃত মূর্খ (টুয়েনটি টু ফ্ল্যানেলড্ ফুলস) একটি চর্মাবৃত গোলক লইয়া জীবনমরণ পণ করিয়াছে, দেখিবার জন্য আসে আরও বিংশতি সহস্র মূর্খ! ইহারই নামান্তর ক্রিকেট!

ভদ্রলোক ক্রিকেটের মূল তত্ত্বটাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রথদর্শন এস্থলে অবান্তর।

এই যে কপোত-কপোতী তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গি নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আপন আপন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তন্বঙ্গী কোমলাঙ্গীগণ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশ— অধুনা উদরও অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে— প্রদর্শনকরতঃ বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন, উচ্চ হাস্যে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণকরতঃ তাহাদের চিত্তে উৎসুক্য লহরির সঞ্চার করিতেছেন, তদ্বিনিময়ে তরুণগণ ক্রিকেট শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন যেন এক স্বয়ম্বরসভায় আপন গুণস্বরূপ সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই তো মুখ্য, ইহাই তো তত্ত্ব, এষাস্য পরমাগতি।

দশ

ইউফ্রেতিস তাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বাবিলনীয় সভ্যতা বেরোল, নীল নদের পারে মিশরীয়, পীতনদের পারে চৈনিক। গঙ্গাপারের আর্যসভ্যতা এদের চেয়ে কয়েক হাজার বছরের ছোট। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহুকাল ধরে মনে মনে আশা পোষণ করছিলেন যে গঙ্গা কিংবা সিন্ধুপারে হয়তো-বা একদিন কোনও এক প্রাক-আর্য এবং আসিরীয় বাবিলনীয় মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ওই জাতীয় প্রাচীন সভ্যতা বেরুবে।

www.pathagar.com

তাঁদের সে আশা পূর্ণ করলেন স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব-জগৎ একদিন বিস্ময় মেনে শুনল সিন্ধু নদের পারে মোন-জো-দড়ো নামক স্থানে রাখালদাস এক প্রাক আর্যসভ্যতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সভ্যতা সম্বন্ধে এস্থলে সবিস্তর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই এ সভ্যতার উৎপত্তি বিকাশ পতন সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর রাখেন।

গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এ সভ্যতা কেবলমাত্র সিন্ধু পারে-পারেই বিকশিত হয়েছিল। তাই তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন 'সিন্ধ উপত্যকা সভ্যতা'। কিছুদিন পরে ক্রমে ক্রমে সে ভুল ভাঙল—দেখা গেল, এ সভ্যতা সিন্ধু পেরিয়ে এবং ছাড়িয়ে সুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল।

তারই সন্ধানে অরেলস্টাইন ভাওয়ালপুর স্টেট (পাকিস্তান) ও তারই সীমান্তে বিকানির রাজ্যে ১৯৪১ সালে খোঁড়াখুঁড়ি করেন। তারই প্রতিবেদন অরেলস্টাইন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করেছেন— তার কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা পরে প্রকাশিত হবে।

নানা কথার ভিতর অরেলস্টাইন একথাও বলেন যে, ভাওয়ালপুর স্টেটের ফোর্ট আব্বাসের পূর্ব দিকে আর কোনও জায়গায় মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অরেলস্টাইন এ মন্তব্যটি করেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। আজকের ভাষায় বলা হবে, পাকিস্তানেই মোন-জো-দড়ের শেষ নিদর্শন পাওয়া যায়— পূর্বদিকে অর্থাৎ ভারতে পাওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহ-অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমলানন্দ ঘোষ এ বছরে শীতকালটা বিকানির স্টেটে খোঁড়াখুঁড়ি করে ফিরে এসেছেন।

তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল সরস্বতী নদীর মধ্যভূমি— মনু এ ভূমিকে পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত নামে উল্লেখ করেছেন। দৃষদ্বতীর উত্তরে এবং সরস্বতীর দক্ষিণে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র— মহাভারতকার বলছেন, কুরুক্ষেত্রে বাস স্বর্গলোকে বাস করার ন্যায়।

শ্রীযুত অমলানন্দ ঠিক কোন কোন জায়গায় তাঁর অনুসন্ধানকর্ম সমাধান করেছেন তার সবিস্তর বর্ণনা খবরের কাগজের মারফতে পেশ করা কঠিন— এখন অসুবিধা এই যে তার জন্য ম্যাপের প্রয়োজন; মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে তিনি সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী দুই নদীর পারে পারে অনুসন্ধান করতে করতে তাদের সঙ্গমভূমি এবং তারও পশ্চিমে অনূপগঢ় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অনূপগঢ় থেকে প্রায় ছ মাইল দূরে ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানা। শ্রীযুত ঘোষ ভাওয়ালপুর যাননি। ভাওয়ালপুর যাওয়ার উপায় নেই— সে জায়গা পাকিস্তানে সবাই জানে।

অরেলস্টাইনের মতো গুণী বলে গেলেন এ তল্লাটে কিছু পাবে না— এমনকি শ্রীযুত ঘোষ যেসব জায়গা খুঁজেছেন তারও দু একটা স্টাইন খুঁড়ে নাকচ করে দিয়ে গিয়েছিলেন— আর তখন যদি ঘোষ সেখানে গিয়ে দুম করে হারাপ্পা মোন-জো-দড়োর খোঁজ পান তখন ব্যাপারটা কীরকম হয় বলুন তো?

এই বেলা পাঠককে একটু সাবধান করে দিই।

যাঁরা মোন-জো-দড়ো সভ্যতা খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা জিগ্যেস করবেন, তবে কি ঘোষ মোন-জো-দড়ো সভ্যতার নরনারীর জাত-গোত্র ঠিক করে ফেলেছেন— তারা আর্য না দ্রবিড় না অন্য কোনও জাত— তবে কি ঘোষ হারাপ্পা-লিপির পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন,

www.pathagar.com

তবে কি তিনি সপ্রমাণ করতে পেরেছেন যে, আর্য এবং হারাপ্পা সভ্যতাতে সঙ্ঘর্ষ বেধেছিল, তবে কি তিনি বলতে পারেন হারাপ্পা সভ্যতা হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল কী প্রকারে?

ঘোষ এসব প্রশ্নের একটারও উত্তর দেননি। তবুও আমি ঘোষের প্রত্নতাত্ত্বিকতায় এত উল্লাস বোধ করছি কেন?

প্রথমত, দৃঢ়নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়ে গেল যে, মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা শুধু সিন্ধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পূর্বদিকে উজিয়ে উজিয়ে বিকানির পেরিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব অবধি এসে ঠেকেছিল অর্থাৎ আগে যে বলা হয়েছিল মোন-জো-দড়ো হারাপ্পা সভ্যতা গুটিকয়েক জায়গাতে (শহরে) সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সপ্রমাণ হল বেলুচিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাব এই সাত শো মাইল এক বিরাট সভ্যতার লীলাভূমি ছিল এবং এই বিস্তৃতি সে যুগের পৃথিবীর যে কোনও সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

দ্বিতীয়, এ সভ্যতা লোপ পাওয়ার পর এক দ্বিতীয় সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন। তার বৈশিষ্ট্য যে সে হারাপ্পার রঙ ও নকশার হাঁড়ি কলসি বানায়নি— তার রঙ গ্রে (মেটে) এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এ সভ্যতা হারাপ্পার পরের সভ্যতা। এই মেটে সভ্যতার (গ্রে ওয়েসার) নরনারী কারা সে সম্বন্ধেও এখনও কিছু বলা যায় না, তাদের যুগনির্ণয়ও সুকঠিন, তবে মোটামুটি আন্দাজে বলা যেতে পারে যে, এদের সভ্যতার কেন্দ্রক্ষণ খ্রি. পূ. ৬০০। তা হলে নিচের দিকে হয়তো মৌর্যদের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু উপরের দিকে হারাপ্পার সঙ্গে এর সংযোগ হয়নি। কারণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হারাপ্পা সভ্যতা যেসব আবাসভূমি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল (কিংবা নৈসর্গিক কোনও কারণে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল) সেগুলোতে এরা আপন বাসভূমি নির্মাণ করেনি। (মুসলমানরা রায় পিথৌরা, অর্থাৎ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে তাঁরই রাজধানীতে আসন গেড়েছিল; সাত শো বছর পরে আজও রায় পিথৌরার দুর্গের দেয়াল কুতুবমিনারের চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়।) তা যাই হোক না কেন, এদেরই খেই ধরে ভবিষ্যতে মেলা আবিষ্কার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, যে আরেক সভ্যতার সন্ধান ঘোষ পেয়েছেন তার নাম দিয়েছেন, 'রঙ্গমহল' সভ্যতা, কারণ বিকানিরের আধুনিক রঙ্গমহল অঞ্চলে এ সভ্যতার বিস্তর উদাহরণ তিনি পেয়েছেন। 'রঙ্গমহল' মুসলমানি যুগের শব্দ— অর্থাৎ এ সভ্যতার অন্তত হাজার বছর পরেকার, কিন্তু রঙ্গমহল জায়গাটি বিকানিরে সুপরিচিত বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।

এ সভ্যতা মেটে সভ্যতার পরবর্তী এবং নিঃসন্দেহ কুশান যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছিল,— এমনকি গুপ্ত যুগ পর্যন্ত, কারণ, গুপ্ত যুগের গান্ধার শিল্পের নিদর্শনও এতে রয়েছে।

এ তিন সভ্যতার নির্মাতা কারা, ঠিক ঠিক কোন যুগে এরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছিল, একে অন্যের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্ব হয়েছিল কি না, এসব তত্ত্ব এবং তথ্য জোর গলায় আজ বলা অসম্ভব।

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ বিকানিরে যে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন তাতে মেলা প্রশ্ন মাথা তুলেছে।

যেসব প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়েছেন সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করাও প্রত্নতাত্ত্বিকের কর্ম। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে— ঘোষ এখনও যুবক— তিনি অনেক কাজ করে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হবেন।

www.pathagar.com

গত বৃহস্পতিবার আমাদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ঘোষ আমাদের এ বাবদে বক্তৃতা দিয়ে তালিম দেন। সব জিনিস ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি বলে হয়তো ঘোষের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ঘোষ সহৃদয় লোক, এ লেখা যদি তাঁর হাতে পৌঁছয় তিনি মাপ করে দেবেন এ আশা মনে পোষণ করি। আমার উদ্দেশ্য, গুণীরা যেন এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে শ্রীমান ঘোষকে উৎসাহিত করেন।

এগার

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মিস মেয়ো কিংবা বেভারলি নিকলস্ যে উদ্দেশ্য আর যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন শ্রীমতী রজোভেল্ট আদপেই সে রূপ নিয়ে আসেননি। ভারতবর্ষের ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য নিয়ে তিনি যেমন কড়া কড়া কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন না ঠিক তেমনি তিনি অকারণ অসময়ে আমাদের পিঠ চাপড়ে আমরা যে বড্ড সুবোধ ছেলে সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চান না।

তাঁর দৃষ্টি আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে। আজকের দিনে আমেরিকারই অঢেল রেস্ত আছে; ভারতের উন্নতির জন্য এদেশীয় বহুলোক খাটবার জন্যও তৈরি আছেন। এ দুয়ে মিলে যে অনেক সৎকর্ম সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই। শ্রীমতী রজোভেল্ট ঠিক এই জিনিসটিই মনে রেখে এ দেশে বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন ও দিল্লির তাবৎ সভা এবং পার্টিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন— অতিশয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে সর্ব প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন।

এদেশের অনেকেরই মনে ভয়— শুধু কম্যুনিস্ট না, অন্য পাঁচজনেরও— আমরা যদি একবার মার্কিন টোপ গিলি তা হলে আর মার্কিন রাজনৈতিক বড়শি থেকে কস্মিনকালেও ছাড়া পাব না। এর উত্তরে প্রথম বক্তব্য ইংরেজি প্রবাদ, 'নো রিস্ক্, নো গেন' সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। দেশীয় প্রবাদের ভাষায় বলি, সাপ মারতে গেলে লাঠি ভাঙবেই ভাঙবে একথা হলফ করে বলা যায় না, মাঝে মাঝে না-ও ভাঙতে পারে।

দ্বিতীয়ত আমার বিশ্বাস পৃথিবীর বুদ্ধিমান জাত এখন আর ডাণ্ডা বুলিয়ে অন্য দেশের ওপর রাজত্ব করতে চায় না। এখন সে চায় অর্থনৈতিক রাজত্ব— অর্থাৎ পৃথিবীর আর পাঁচটা জাতের কাছে নিজের সুবিধেয় মাল বেচতে। তবে যদি বলেন, আমেরিকার কাছ থেকে রেস্ত নিলে আমরা তাদের অর্থনৈতিক আওতায় এসে যাব তা হলে নিবেদন, রুশ ভিন্ন পৃথিবীতে আজ কোন জাত মার্কিনি আওতার বাইরে? এই যে মহামান্য ইংরেজ মহাপ্রভুরা দুনিয়ার সর্বত্র দাবড়ে বেড়ান তেনাদের অবস্থাটা কী? আজ যদি তাঁরা মার্কিনের সঙ্গে বড্ড বেশি তেড়িমেড়ি করে তবে কাল কাক-কোকিল ডাকবার আগেই মাংসটা আণ্ডাটার দাম চড় চড় করে আসমানে চড়ে ডালটার উপর বসে ঠ্যাং দুলাবে। বাজার করতে গিয়ে তার চরণের ধুলোটি স্পর্শ করা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, আলবৎ, স্বেচ্ছায় আমরা এরকম অবস্থা বরণ করে নেব কেন?

আমার অন্ধ বিশ্বাস ভারত বিরাট দেশ তাই সে কারও ধামাধরা না হলেও বেঁচে থাকতে পারবে। তার পূর্বে অবশ্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কৃষির সুব্যবস্থা করা। তার জন্যে প্রয়োজন

www.pathagar.com

জলের বাঁধ, বিজলির আলো। আরও দরকার কৃষির জন্য উন্নত কলকবজা, সার। এসবের জন্য উপস্থিত রেস্ত'র প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, একবার তার কৃষি আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলে তখন আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, রায় পিথৌরা অতিশয় অমায়িক লোক। তিনি কারও কাছে অঋণী হয়ে মরতে চান না, তাই যদি এসব বাবদে রুশরা সাহায্য করতে চান, তবে তিনি তাদেরও সাহায্য নিয়ে রুশ জাতটাকে কৃতার্থম্মন্য করতে প্রস্তুত আছেন।

রুশের আওতায় পড়ে যাব? তার ভয় আরও কম। পূর্বে বলেছি, 'বুদ্ধিমান' জাত অন্য দেশের ওপর রাজত্ব করতে চায় না। তাই ইন্দোচীনে ফ্রান্সের কাণ্ডকারখানা দেখে কী বলব ভেবে পাইনে।

গোড়ায় আমেরিকা ইন্দোচীনের ঝামেলায় নামতে চায়নি। ওদিকে ফ্রান্সের গাঁটে এত কড়ি নেই যে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে একখানা আস্ত লড়াই চালাবার মতো বিলাস উপভোগ করতে পারে। তাই ফরাসিরা মেলা কায়দাকেতা করে, মেলা নল চালিয়ে মার্কিনকে নামাল তার দয়ে।

ওদিকে মার্কিন নামা সত্ত্বেও রাধা-নাচের ন'মণ তেল জ্বালাতে গিয়ে ফ্রান্সের আপন দেশে লাল বাতি জ্বলে আর কি। ফ্রান্সে এখন বহু বিচক্ষণ লোক দ'টা থেকে কোনও গতিকে বেরুতে পারলে বাঁচেন কিন্তু হায় ইতোমধ্যে মার্কিন চটে গিয়ে বলছে, 'ইয়ার্কি পেয়েছ? আমাকে নামিয়ে দিয়ে এখন কেটে পড়তে চাও? সেটি হচ্ছে না— যে জল ঘোলা করেছ সেটা তোমাকেও খেতে হবে।' মার্কিনি ভাষায়, 'ইন ইয়োর ওন জুস'— আপন রসে সিদ্ধ হও।

ফ্রান্সের লোক বেহুলার ভাসান শোনেনি— তা হলে ইন্দোচীনের ঘাটের দিকে যেত না—

'ও ঘাটে যেয়ো না বেউলো
বেউলো আমার মা
চাঁদের ব্যাটা দুশমন নখা
দেখলে ছাড়বে না।'

* * *

শ্রীযুত সুবিমল দত্ত আমাদের ভারতের রাজদূত হয়ে জর্মনি যাচ্ছেন। উপস্থিত জর্মনির রাজধানী 'বন' শহরে— তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন মহাশয় বনবাসে চললেন।

বন জর্মনির সেরা সুন্দর শহর। সামনে রাইন নদী, পিছনে 'ভিনাস' পাহাড়, রাইনের ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' বা 'সপ্ত পর্বত'। চতুর্দিকে বাগান, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি— শহরের ভিতরেও বিস্তর কাঁচা সবুজ পার্ক।

আর লোকগুলো ভারি চমৎকার। বন শহরটা জর্মনের সীমান্তে, বেলজিয়ামের গা ঘেঁষে। ফ্রান্সের সঙ্গেও তার বিস্তর দহরম মহরম। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর বিদেশি ছাত্র পড়াশোনা করে, ততোধিক টুরিস্ট বনে প্রতিবছর বেড়াতে আসে তাই বন-বাসিন্দা চিরকালই একটুখানি আন্তর্জাতিক বিশ্বনাগরিক প্রকৃতির— খাঁটি প্রাশানদের মতো কুনো আর দাম্ভিক নয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজের তাড়া খেয়ে খেয়ে বহু ভারতীয় শেষ আশ্রয় নিত জর্মনিতে। জর্মনরা কোনও কালেই ভারতীয়দের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেনি। তাই যখন যুদ্ধের পর অনেক জাত কে কত ক্ষতিপূরণ পাবে তার আলোচনা করছিল তখন ভারতীয়

www.pathagar.com

সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, জর্মনদের ওপর আমাদের কোনও দাবি-দাওয়া নেই। যেসব ভারতীয়দের জর্মনির সঙ্গে কোনওপ্রকারের যোগাযোগ ছিল তাঁরাই এ সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করেছিলেন।

যৌবনে বন শহরে রায় পিথৌরা জর্মন সতীর্থদের সঙ্গে বসে বসে স্বাধীন ভারতের সুখস্বপ্ন দেখতেন। সেসব সতীর্থেরা সংস্কৃত ও ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোচনা করতেন বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারাল কী করে। এবং তাই বোধহয় তাঁরা জোর গলায় বারবার বলতেন, ভারতবর্ষ খুব শীঘ্রই পুনরায় তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। কিংবা হয়তো আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলতেন, কে জানে?

স্বাধীনতা লাভের পরই আমি এঁদের কাছ থেকে বহু আনন্দ অভিনন্দন পাই। একজন লিখলেন, 'তুমি তোমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেখাতে সবসময়ই লজ্জা অনুভব করতে। এইবার ভারতীয় পাসপোর্ট বুকে দুলিয়ে সোজা জর্মনি চলে এস।'

ভারতের স্বাধীনতা লাভে এঁরা কতখানি উল্লাস বোধ করেছেন সেকথা আমি জানি, কিন্তু প্রকাশ করার মতো ভাষার দখল আমার নেই।

দত্ত মহাশয়কে জর্মনরা সাদরে গ্রহণ করে নেবে সেকথা আমি নিশ্চয় জানি, তার প্রধান কারণ দত্ত মহাশয় অতিশয় অনাড়ম্বর লোক। জর্মনির প্রতি তাঁর প্রীতি আছে— কিছুদিন পূর্বে ডা. শাখ্ট্ যখন ভারতে আগমন করেন তখন উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল।

যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরা বলতে পারবেন জর্মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রের ফলে আমাদের কী কী লাভ হবে। আমি বলতে চাই, তার চেয়েও আমাদের বেশি লাভ হবে যদি আমাদের মধ্যে বৈদগ্ধ্যগত আদান-প্রদান নিবিড়তর হয়। জর্মনিতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয় বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনও সে চর্চা জোর এগিয়ে চলছে। বনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র উত্তমরূপে স্থাপিত হলে এদেশের সংস্কৃত-চর্চা অনেকখানি উৎসাহ পাবে।

রাজদূতের মেলা কর্ম, অনেক ঝামেলা। কিন্তু দত্ত উচ্চশিক্ষিত লোক; তিনি কৃষ্টিগত যোগসূত্র স্থাপনে উৎসাহিত হবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

রুশদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে।

একদা মিশনারিরা এদেশে অকাতরে বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ বাইবেল বিতরণ করেছিলেন। ফ্রি বলে সেগুলো লোকে পড়ত না। তখন মিশনারিরা বাইবেল বিতরণ একদম বন্ধ করে দিলেন। ফলে আজ যদি আপনি বাইবেল পড়তে চান, তবে গাঁট থেকে অন্তত টাকা দশেক না খসালে একখানা ভালো বাইবেল পাবেন না। কাজেই অবস্থা পূর্ববৎ— বাইবেল এখনও কেউ পড়ে না।

রাশানরা দিল্লির বাজারে ছেড়েছে এন্তার মার্কস, লেনিন, স্টালিন, লের্মেন্টফ, চেখফ, কিন্তু একদম ফ্রি নয়, আবার ন্যায্যমূল্য থেকে অনেক সস্তা। দেড় টাকায় লের্মেন্টফ পেয়ে যাচ্ছেন— ভালো কাগজ উত্তম ছাপা। আপনাকে ঠেকায় কে? এবং যেহেতু কাঁচা পয়সা ফেলে তেল কিনছেন তখন সে তেল আজ না হোক কাল মাখবেনই।

এসব বইয়ের চাপে পড়ে মার্কিন মুল্লুকের সস্তা কেতাব ছাড়া ইংরেজি আর কোনও কেতাব আমার বাড়ির সামনের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টলওলা বলল, রাশায় ছাপা ইংরেজি বই বিক্রি করলে কমিশনও নাকি বেশি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আমার শুধু দুঃখ রাশানরা যত না মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিন-স্টালিন ছাড়ছে তার শতাংশের এক অংশও টলস্টয়, পুসকিন, দস্তায়ফ্স্কি, তুর্গেনিয়েফ দিচ্ছে না।

বারো

ভূতনাথ এবং তস্য বন্ধু মদনগোপাল কী করিয়া যে গঞ্জিকাসক্ত হইল তাহার সঠিক সন্ধান মেলে না। পরোপকারার্থে তাহারা প্রায়ই নিমতলা, কেওড়াতলা গমনাগমন করে; হয়তো-বা সেই উপলক্ষে বন্ধুদ্বয় এই ধূম্রাত্মক রসে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

গুরুজনরা এই সংবাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহারা ভূতনাথ ও মদনগোপালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রসন্তানের এ কী আচরণ! আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়াছি।'

ভূতনাথ মদনগোপাল অতিশয় নম্র স্বভাব ধারণ করে; নতমস্তকে গুরুজনদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

কোনওপ্রকারের আপত্তি অনুযোগ কিংবা উচ্চবাচ্য করিল না বলিয়া গুরুজনদের হৃদয় ঈষৎ দ্রবীভূত হইল। একজন বলিলেন, 'পালা-পার্বণে, অবরে-সবরে না হয় কিঞ্চিত সন্মার্গভ্রষ্ট হইলে; কিন্তু নিত্য নিত্য— ' এইমাত্র বলিয়া সহৃদয় গুরুজন তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

ভূতনাথ এবং মদনগোপাল ওই পন্থাই অবলম্বন করিবে মৌনভাবে এইরকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহের দেহলি প্রান্তে গোধূলি লগ্নে ভূতনাথ ও মদনগোপাল নির্জীবের মতো পড়িয়া আছে। গঞ্জিকালগ্ন গতপ্রায়— ধূম্ররস না পাইয়া উভয়ই অতিশয় বিরস বদন। কিন্তু উপায়ান্তরই-বা কী? গুরুজনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, পালা-পার্বণ ব্যতীত গঞ্জিকারসে নিমজ্জিত হইবে না।

হঠাৎ রোদনধ্বনি শোনা গেল। মদনগোপাল তৎক্ষণাৎ সংবাদ নিতে প্রস্থান করিল। মুহূর্তেক মধ্যেই দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিয়া চিৎকার করিল 'ওরে ভূতো, ঝপ্ করিয়া একটা চিলিম সাজো। চুনীর মাতা গত হইয়াছেন।'

ভগবান দয়াময়। পালা-পার্বনের সন্ধানে থাকিলে চুনীর মাতার মৃত্যুও পালারূপেই গণ্য করা যাইতে পারে।

রায় পিথৌরা ভূতনাথ গোত্রীয়।

হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমার সম্মুখে স্ব স্ব পালা-পার্বণে আনন্দে নিমজ্জিত হইবেন এবং আমি 'দাঁড়িয়ে বাহিরে দ্বারে মোরা নরনারী'র একজন হইয়া সেই রসস্রোতে নিমজ্জিত হইতে পারিব না, এই কুব্যবস্থার কল্পনামাত্র করিতেই আমি শিহরিয়া উঠি। তাহা হইলে আমি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলাম কোন দুঃখে? অস্মদ্দেশীয় মহাপুরুষগণ হিন্দুর মন্দিরদ্বার উন্মোচন করেন, ঈদোৎসবে মুসলমান সখাগণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েন, এই তাবৎ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে আমিই-বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের পালা-পার্বণে নিজেকে কূপমণ্ডূকের ন্যায় সীমাবদ্ধ করিব!

বড়দিন আসিল কিন্তু হায় কোথায় সেই ইংরেজ সম্প্রদায় যাঁহাদের প্রসাদাৎ গুরুভোজন এবং গুরুতর পানের সুব্যবস্থা হইত। খ্রিস্ট জন্মদিনের পূর্ব সন্ধ্যায় দেহলি প্রান্তে তাই অতিশয়

www.pathagar.com

বিরস বদনে মনে মনে ইংরেজকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, 'স্বরাজ প্রদান করিলে তো করিলে (সে তো অস্থিমজ্জায় বারম্বার অনুভব করিতেছি) কিন্তু এই দেশ ত্যাগ না করিলে কি তোমাদের বাইবেল অশুদ্ধ হইয়া যাইত? অন্ততপক্ষে খ্রিস্টদিগকে খ্রিস্টধর্মে বাপ্তিস্ম করিবার সর্ববাসনা কি তোমাদিগের চিরতরে লোপ পাইয়াছে।'

দেহলি প্রান্তে বিশ্বেশ্বর বলুন, কাবা বলুন, এখানকার চক্রবর্তী কনট (পাঞ্জাবি উচ্চারণ 'ক্লাট সার্কল') সার্কল। সুসজ্জিত বিপণিমণ্ডলী চক্রাকারে এক সুরম্য উদ্যানকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপূর্বদর্শন কামিনীগণ সুরম্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই আপন-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। কোনও ললনা পাদুকা ক্রয় করিতে উপবেশন করিয়াছেন— রাতুল নখাগ্র ('চরণ' বর্বর-যুগে প্রচলিত ছিল) সম্প্রসারিত করিয়া মধুর কণ্ঠে কাম্য পাদুকার নখ-শির বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখের পাদুকা-স্তূপ হিমাচলকে অনায়াসে লজ্জা দিতে পারে, সেই গগনচুম্বী স্তূপের পশ্চাতে আপণ-স্বামী কিংবা আপন স্বামী কাহাকেও আর দেখা যাইতেছে না। আহা কী মধুর দৃশ্য!

কোনও নাগরী কঞ্চুলিকার জন্য গলবস্ত্র হইয়াছেন— অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠী চীনাংশুক খণ্ড অমলধবল গলে জড়িত করিয়া পুনঃপুন নিরীক্ষণ করিতেছেন বর্ণসামঞ্জস্য শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত হইতেছে কি না। সখীগণ নানাপ্রকারের সদুপদেশ দিতেছেন, পরমগুরু পতিদেব বস্ত্রমূল্য শ্রবণকরত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদকল্পে ওষ্ঠাধর উন্মোচন করিবার পূর্বেই নাগরীর নাসিকা স্ফীত হইতে লাগিল।

রায় পিথৌরা দ্রুতগতিতে বিপণি ত্যাগ করিলেন।

হায় খ্রিস্ট জন্মোৎসব! বিপণি-আপণ প্রদর্শন করিয়াই আমার উৎসব সমাধান হইবে?

অকস্মাৎ স্কন্ধোপরি চপেটাঘাত। দেখি, পারসি মিত্র, রুস্তম ভাই মিনুচিহর নাদির শাহ। 'তুমি মোহময়ী (বোম্বাই) ত্যাগ করিয়া দেহলি প্রান্তে কেন?'

'কর্মোপলক্ষে।'

'উত্তম উত্তম।'

'খ্রিস্ট জন্মোৎসব পালন করিতেছ না?'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'খ্রিস্টান বন্ধু কেহই নাই।'

নাদির শাহ স্কন্ধোপরি পুনরায় চপেটাঘাত করিয়া বলিল, 'এইমাত্র অনটন, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে আমার পিতামহ জরথুস্ত্র ধর্ম ত্যাগকরতঃ খ্রিস্টের স্মরণ লইয়াছিলেন। আইস বৎস, এই নির্বান্ধব পুরীতে কোনও ভোজন এবং পানশালাকে আমাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করি।'

নাদির শাহ অতিশয় গুণী ব্যক্তি। ভোজনগৃহে প্রবেশকরতঃ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিল, 'শিশির ঋতুতে ব্র্যান্ডিই প্রশস্ত। তৎপর অন্য বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।'

আমি বলিলাম, 'আমার দুর্বলতা আহারাদির প্রতি।'

নাদির শাহ বলিল, 'ভ্রাতঃ, আমার মাতামহী বিশুদ্ধ ইরানবাসিনী, বাল্যকাল হইতে আমি ইরানি খাদ্য ভূরি ভূরি আহার করিয়াছি। প্রথম যৌবন দিল্লিতে কর্তন করি— মোগলাই খাদ্য আমার অপরিচিত নহে। গৃহিণী ফরাসিনী; অতএব ভ্রাতঃ, বিবেচনা কর এই সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কিছু বেশি।'

www.pathagar.com

প্রথম আসিল ফরাসিস পদ্ধতিতে অরদ্যভ্র্ (hors-d'oeuvre)। নানা অংশে বিভক্ত যে বিরাট খুঞ্চা আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে অন্তত দশাধিক রকমের খাদ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্মন (ফ্রাঙ্কফুটার) সসিজ, ভর্জিত এবং অভর্জিত বেকন এবং হ্যাম, জলপাই তৈলসিক্ত টোস্টাসিন রৌপ্যবর্ণের সার্দিন মৎস্য, অতিশয় নমনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমলেট খণ্ড, সিরকা-নিমজ্জিত পলাণ্ডু-ত্রপুষী-কোষাম্র (প্যাঁজ-কাঁকুড়-জলপাই), রুশদেশ হইতে সদ্যাগত 'কাভিয়ার' বা মৎস্য-ডিম্বের স্যান্ডউইচ, সেই রুশ পদ্ধতিতে মাইয়নেজ মধ্যে সুপক্ব কুক্কুটু-ডিম্ব। অন্য খাদ্যবস্তুগুলির গোত্রবর্ণ অনুমান করিতে পারিলাম না।

নাদির শাহ বলিল, 'ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণতর করিবার উপাদান। স্পর্শ করিবে মাত্র— অনাহারের জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা।'

ধন্য নাদির শাহ।

বলিল, 'সুপ খাইলে অনর্থক উদর পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব সুপ সর্বথা বর্জনীয়। ডাচেস অব উইনজার নিমন্ত্রণে কদাচ সুপ পরিবেশন করেন না। অতএব এক্ষণে আসিবে তন্দুর-মৎস্য।'

আমি বলিলাম, 'তন্দুর-মুরগি খাইয়াছি কিন্তু তন্দুর-মৎস্য?'

অর্থাৎ তন্দুরে প্রস্তুত মৎস্য— ওভেন-বেক্ড্ ফিশ।

সে মৎস্য দেখিয়া মনে হইল অপক্ব বস্তু। যেন মৃত মৎস্য খাইতে দিয়াছে। অথচ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি নমনীয় কমনীয় খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তন্দুরের উষ্ণতা চতুর্দিক হইতে সমভাবে মৎস্যের সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি অপূর্ব রসনাভিরাম রসবস্তু হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

নাদির শাহ আদেশ দিল, 'ইহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভিয়েনিজ ক্রোয়াসাঁ ভক্ষণ কর।'

তুর্করা যখন ভিয়েনার নগরদ্বারে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয় তখন সেই ঘটনার স্মরণার্থে ভিয়েনা-বাসীরা অর্ধচন্দ্রের (ক্রোয়াসঁ-ক্রিসেন্ট) আকারে এক কোমল অথচ মর্মরিত রুটি নির্মাণ করে। অতিশয় উপাদেয় লঘু খাদ্য।

অতঃপর তন্দুরি-মুরগি এবং আফগানি নান-রুটি। তাহার বর্ণনা আমার সুরসিক পাঠকদিগকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি।

নাদির শাহ একার্ধাধিক নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণকরতঃ বলিল, 'এইবারে সত্য আহার আরম্ভ হউক।' ওয়েটারকে বলিল, 'মটর-কোপ্তা-বিরিয়ানি, আলু-মটরশুঁটি মুরগি কারি, কিঞ্চিৎ কোপ্তা নরগিস্ (কলিকাতার ডেভিল) এবং অত্যল্প শূল্যপক্ব মিশরি কাবাব (কলিকাতার শিক কাবাব)। আর দেখ, মুরগি-কারিতে যদি যথেষ্ট ঝোল না থাকে তবে এক পাত্র রৌগন-জুশ এবং কিঞ্চিৎ ক্রিম-লেটিস্ সালাড্। উপস্থিত (এবং এই শব্দটি নাদির যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করিল) ইহাই যথেষ্ট।'

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বলিতে পারো, মূর্খেরা সালাড্ কেন জলপাই (অলিভ) তৈল দিয়া প্রস্তুত করে? সেই তৈলে না আছে গন্ধ না আছে কোনওপ্রকারের তীব্রতা। সালাডের পক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত সরিষার তৈলই প্রশস্ততম। তুমি এক কাজ কর। কিঞ্চিৎ মাস্টার্ড জলে তরল করতঃ সালাডের সঙ্গে সংমিশ্রণ করিয়া দাও।'

www.pathagar.com

ধন্য ধন্য নাদির শাহ; তুমি বঙ্গভূমিতে পদার্পণ না করিয়াও কী প্রকারে অবগত হইলে আমরা স্ফীততণ্ডুল সরিষার তৈল সহযোগে ভক্ষণ করি।

আহারে ক্ষান্ত দিয়া নাদির বলিল, 'ইহারা ঘৃতসিক্ত উত্তম পরোটা নির্মাণ করিতে জানে না। নতুবা পোলাও-কারির অন্তরালে মধ্যে মধ্যে সেই বস্তু চর্বণ রসনাকে বহ্বান্ন ভক্ষণে উৎসাহিত করে।'

অতঃপর নাদির শাহ বলিল, 'মিষ্টান্ত সম্বন্ধে অহেতুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়ো না। আমি তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছি।'

রসগোল্লা লেডিকিনি এবং সন্দেশ!!

নাদির বলিল, 'শুনিয়াছি, কলিকাতার তুলনায় নিকৃষ্ট। তুমি অপরাধ নিয়ো না।'

ধন্য নাদির। নাদির ভারত জয় করিয়াছিল; তুমি খাদ্যব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়াছ।

আশা করি, এই খাদ্যনির্ঘণ্ট দেহলি প্রান্তাগত বঙ্গবাসী স্মরণ রাখিবেন। আমাকেও।

তের

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বহু পুস্তক এদেশে লোপ পেয়েছে, কিন্তু অনুবাদ তিব্বত, চীন, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পূর্ব তুর্কিস্থানের নানা ভাষাতে এখনও পাওয়া যায়। শুধু বৌদ্ধ মঠেই যে এদের সন্ধান মেলে তা নয়, মধ্য এশিয়ার বালির নিচ থেকেও এসব অনুবাদের বই এখন বেরুচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণের জন্য এসব অনুবাদ গ্রন্থ অবর্জনীয়। কিন্তু প্রশ্ন এই বিরাট কর্মভার গ্রহণ করতে যাবে কে?

কিছুকাল পূর্বে নাগপুরে শ্রীযুক্ত রঘুবীর ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক পরিষদ ('ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব্ ইন্ডিয়ান কালচার') প্রতিষ্ঠা করেন। এ পরিষদের কাজ যাতে করে দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীদের সাহায্যে ভালো করে গড়ে ওঠে, তার জন্য পরিষদ জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ইতালি, জর্মনি, ইংলন্ড, হল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের পণ্ডিতদের সহায়তা চেয়ে আহ্বান জানান এবং ইতোমধ্যেই সহৃদয় উত্তর পেয়েছেন।

দিল্লিতে এসে শ্রীযুক্ত রঘুবীর বললেন, পশ্চিম জর্মনির মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত নোবেল মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'সুবর্ণ প্রভাসসূত্র' পুস্তকখানা সর্বপ্রথম প্রকাশ করবেন। পরিষদ ক্রমশ কী কী পুস্তক বের করবেন তার একটি খসড়াও অধ্যাপক নোবেল তৈরি করেছেন।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব কোনও সন্দেহ নেই। ভারতের বৈদগ্ধ্যগত ইতিহাসের প্রতি যাঁরই কণামাত্র মমতা আছে, তিনিই এ কর্মে সহায়তা করবেন এ বিশ্বাস আমাদের মনে আছে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতেরাই যদি একাজে সহায়তা করেন, তা হলেই অল্পদিনের ভিতর বিস্তর উন্নতি দেখানো সম্ভবপর হবে।

এ কাজের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর।

www.pathagar.com

এ কাজ যখন সম্পূর্ণ করতেই হবে, তখন টাকাও যোগাড় করতেই হবে।

কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এসব বই পড়বে কে?

সংস্কৃত ভাষার (পালি ও প্রাকৃতের কথা থাক) চর্চা বাংলা দেশে এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেকথা যাঁরা 'আনন্দবাজারে' 'চিঠিপত্রে জনমত' পড়ে থাকেন তাঁরাই জানেন। কেউ কেউ স্কুল-কলেজে সংস্কৃত চর্চার জন্য যে 'ব্যবস্থা' করতে চান, সেটা বাচ্চাকে ক্রমে ক্রমে মায়ের দুধ ছাড়ানোর মতনই। অন্যেরা বাচ্চাটাকে বাকি জীবন আধমরার মতো করে রাখতে চান। যাঁরা ভালো করে সংস্কৃত পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে চান, তাঁরা যেন কল্কে পাচ্ছেন না বলে মনে হচ্ছে। বাংলার বাইরেও অবস্থা প্রায় একই। টোল-পাঠশালা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পণ্ডিতদের দু মুঠো অন্ন দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে জানিনে।

শেষটায় কী হবে বলা শক্ত। তবে আশা করি, পাঠক আমার ওপর চটে যাবেন না, যদি নিবেদন করি যে, এ দেশে সংস্কৃতচর্চা ব্যাপকভাবে হওয়ার আশা দুরাশা। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ, যেখানে ক্লাসিক্স্ পড়ানোর জন্য গণ্ডা গণ্ডা জলপানি রয়েছে, সেখানেই যখন বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতির মোহে পড়ে ছাত্রেরা ক্লাসিক্স্ বর্জন করেছে, তখন এ গরিব দেশ সংস্কৃতের জন্য কাকে কী প্রলোভন দেখাতে পারে?

অথচ স্বরাজ পাওয়ার পরও ভারতীয় তরুণ যদি আপন সংস্কৃতিচর্চা না করে, তবে সে এদেশে গড়ে তুলবে কী বস্তু? জলের বাঁধ, বিজলির প্রসার, কারখানার ছয়লাপ করে করেই তো একটা জাত বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মার ক্ষুধাও তো রয়েছে— আজ না হয় পেটের ক্ষুধায় সেটাকে অস্বীকার কিংবা অবহেলা করে যাচ্ছি।

অতএব আমি মনে করি, ভারতীয় সংস্কৃতি সহজবোধ্য করে তুলতে হবে।

অর্থাৎ তিব্বতি চীনা থেকে যেসব বই অনুবাদ করা হবে, সেগুলো যেন হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি ভাষাতে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ না করলেও ক্ষতি নেই— আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যখন দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ইংরেজিতে পড়ে না, কিংবা পড়তে পারে না, তখন আর চীনা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করে কী লাভ।

আমার মতো পাঁচজন বুড়ো মাথা চাপড়ে হয়তো জিগ্যেস করবেন, 'আমাদের এ অবস্থা হল কেন? সংস্কৃত কি তবে এদেশ থেকে লোপ পেয়ে যাবে?' উত্তরে বলি, কালধর্ম।

চৌদ্দ

এই খোলা মাঠের 'সিনেমা' বানাতে আমাদের এতদিন লাগল কেন? ইয়োরোপে ঠাণ্ডা, কুয়াশা, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা হতে হতে দশটা বেজে যায়— তা-ও ভালো করে অন্ধকার হয় না। সেখানে আকাশের তলায় সিনেমা বানানোর কথাই ওঠে না। আবার কাইরো শহরে বছরে আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয় কি না হয়, কুয়াশা সেখানে অজানা, আবহাওয়া না-গরম-না-ঠাণ্ডা, সেখানে তাই খোলা সিনেমার খোলতাই। দিল্লি এ দুটোর মধ্যিখানে, বরঞ্চ বলব কাইরোর গাঁ ঘেঁষে. তবু খোলা সিনেমা খোলা হল মাত্র গত সপ্তাহে।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা কিন্তু উত্তমই হয়েছে। যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটিও পুরনো দিল্লি আর নয়াদিল্লির মাঝখানে— ফিরোজ শাহ্ কোটলার পিঠে পিঠ লাগিয়ে। সিনেমার পর্দাখানা বানানো হয়েছে মামুলি পর্দার ডবল সাইজে— বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, যাতে করে হাওয়ায় না দোলে, তবে চতুর্দিকে কালো বর্ডার লাগানো হয়নি বলে চোখ অস্বস্তি অস্বস্তি বোধ করে।

বিরাট ব্যবস্থা, তাই টিকিটের জন্য মারামারি কাটাকাটি করতে হয় না। ভিতরে গিয়ে যে কোনও এক কোণে আপন আসন বেছে নিয়ে দিব্য বায়স্কোপ দেখা যায়, কেউ এসে ধাক্কা লাগায় না, মশাই আমার সিটে বসেছেন যে মাইরি, সিগারেটের ধুঁয়োর উৎপাত নেই। মোলায়েম ঠাণ্ডায় অনায়াসে দু দণ্ড ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

এখনও অবশ্য তাবৎ কাইরোর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। সেখানে ভালো টিকিট কাটলে একখানি ছোট টেবিল পাওয়া যায়, পছন্দমতো কটলিস-সসেজ, কবাব-কোপ্তা খেতে খেতে ইয়ার-বক্সিদের সঙ্গে গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে বায়স্কোপ দেখা যায়।

হবে, হবে, সে-ও হবে।

এক নরওয়েবাসী তার বন্ধুকে বলল, 'এই গরমিকালে আফ্রিকায় বেড়াতে যাচ্ছি।'

বন্ধু তাজ্জব মেনে বলেন, 'গরমিকালটাই বাছলে! সেখানে যে ও সময়ে "শেড-টেম্পারেচার" ১১২ ডিগ্রি।'

প্রথম বন্ধু ভুরু কুঁচকে বলল, 'তা আমাকে ছায়ায় বসতে বাধ্য করবে কে?'

'ওপন্ অ্যার সিনেমা'তেও তাই। টিকিটের দাম যখন কুল্লে এক টাকা, তখন ছবি ভালো না লাগলে সেখানে আপনাকে বসতে বাধ্য করবে কে?'

বিশ্বাস করবেন না এই ক'দিনে ন'খানা ছবি দেখেছি। বাঙ্গালায় যাকে বলে গোগ্রাসে গোস্ত গিলেছি। এখনও ঢেকুর উঠছে।

দু একখানার পরিচয় ইতোমধ্যেই 'আনন্দবাজার' এবং 'হিন্দুস্থান স্টাডার্ড'-এ নিবেদন করেছি। যেগুলো দেখেছি তার মধ্যে 'মিরাক্‌ল্ ইন্ মিলান' সবচেয়ে উত্তম, আর যেসব ছবি দেখার সুযোগ হয়নি, তার মধ্যে গুণীদের মতে, 'বাইসাইক্‌ল্ থিফ' 'ইউকিয়ারিসু' নাকি একেবারে রঙের টেক্কা।

* * *

মিশরি ছবি ছিল 'ইব্‌ন্ উন্-নীল' (অর্থাৎ নীলনদসন্তান)। এ ছবি দেখে সত্যি মনে হয়, একদম ভারতীয় ছবি, শুধু 'তারকারা' কুর্তা-পাজামা, ধুতি-পাঞ্জাবি না পরে আলখাল্লা আর জাব্বাজোব্বা পরেছে। নায়িকা ভিমরি গিয়েছেন, তাঁর মাথা রেললাইনের উপরে পড়ে আছে, দূর থেকে পাঞ্জাব মেল (খুড়ি, আলেকজেন্দ্রিয়া মেল) গুম গুম করে ছুটে আসছে, নায়ক তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন— এই গেল এই গেল অবস্থায় শেষ মুহূর্তে নায়িকার উদ্ধার।

ফারাক এইটুকু, বাঙলা ছবিতে তখন ডুয়েট গান আরম্ভ হয়ে যায়, 'কেন গো বাঁচালে মোরে— নিঠুর বঁধুয়া', এখানে তা হয়নি। (চীনা ছবি 'হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল' কিন্তু গান বাবদে বাঙলা ছবিকেই ছক্কা-পাঞ্জা-বোম্ দিতে পারে)।

'নীলনদসন্তান' নিরেস ছবি বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ছবি উন্নাসিকের (অর্থাৎ আপনার-আমার) জন্য বানানো হয়নি। সদর এবং মহকুমা শহরে এ ছবি বিস্তর কদর পাবে।

www.pathagar.com

তাই আমি 'হন্টরওয়ালি', 'মিস্ ফ্রন্টিয়ার মেল', 'ডাকু কি দিলরুবা', 'জাম্বু কা বেটা'র নিন্দেও কস্মিনকালে করিনি।

'বুদ্ধের জীবনী' জাপানি ছবি। অতি নবীন কায়দায় কার্টুন দিয়ে সিলুয়েট্ দিয়ে ছবিখানা তৈরি। তা-ও আবার স্টিলিসাইজড— তাই ভারতীয় নারকোল অশথ গাছ ঠিক ওৎরালো কি না, তাই নিয়ে কোনও শিরঃপীড়া হয় না। সঙ্গীত অত্যুত্তম, সবকিছু নিয়ে ছবিখানা সত্যই উপাদেয়।

* * *

বুদ্ধের জীবনের সবচেয়ে যে জিনিস চীনা-জাপানিদের আকৃষ্ট করে, সে হচ্ছে 'মারের বিভীষিকা এবং প্রলোভন!' চীন দেশের গুহাতে বুদ্ধ-জীবনীর এ অধ্যায়টি বিস্তর রঙ ফলিয়ে বহু প্রকারে আঁকা হয়েছে। জাপানি 'বুদ্ধের জীবনী' ছবিতেও দর্শক 'মারপর্ব' অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাবেন। সেখানে নাচগানও চমৎকার।

আমাদের বিশ্বাস কার্টুনে ছবি বানালে ডিস্নিকে নকল না করে উপায় নেই। ফরাসি ছবি 'সাহসী জন' দেখে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। যেখানেই 'চিত্রকার' নতুন কিছু করতে গিয়েছেন, সেখানেই তিনি মার খেয়েছেন বেধড়ক, আর যেখানে ডিস্নিকে নকল করেছেন, সেখানে তিনি পানসে— নকল করলে যা হয়।

'বুদ্ধের জীবনী' ডিস্নিকে নকল না করে সার্থক সৃষ্টি।

'মিসেস ডেরি' সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থানে' আলোচনা করেছি। ভাষা এবং তার চতুর্দিকে গড়ে ওঠা বৈদগ্ধ্য যে জোর করে কোনও জাতের ঘাড়ে চাপানো যায় না, তার অত্যুত্তম প্রমাণ পাওয়া যায় 'মিস ডেরিতে'। গান, অভিনয়, সবকিছুই এ ছবিতে ভালো হয়েছে।

* * *

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'মিরাকল ইন মিলান'। অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এ ছবিতে করা হয়েছে, সেটি ধরা পড়ে শেষমুহূর্তে। এ ছবি দেখলে 'বিরিঞ্চি বাবাদের' প্রতি ভক্তি একটুখানি কমতে পারে।

* * *

জনৈক লেখক এক খ্যাতনামা কাগজে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বিতীয় শ্রেণির কবি, ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক সেকথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন, তিনি বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ পড়েননি।

বিভারলি নিকল্স্ও এই ধরনের বই লিখেছিল। মিস মেয়োর কথা আর বললুম না, কারণ দু একজনকে বলতে শুনেছি, মেয়োর উদ্দেশ্য হয়তো খারাপ ছিল না কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচকটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের মনে প্রচুর সন্দেহ রয়ে গিয়েছে।

নিকল্সের বই যখন হুশ হুশ করে বিক্রি হচ্ছে তখন খ্যাতনামা প্রকাশক আমাকে বইখানার উত্তর লিখতে অনুরোধ করেন। বেশ দু পয়সা যে পাব সে লোভটাও দেখালেন।

আমি উত্তরে সবিনয়ে বললুম, 'মনে করুন এক হটেনটট লন্ডনে তিন মাস থাকার পর যদি শেক্সপিয়র, রাফায়েল, এঞ্জেলো, বেটোফেন, পাভলোভাকে কটুকাটব্য করে বই লেখে তবে কি কোনও সুস্থ ইয়োরোপীয় তার উত্তর লিখবে?'

প্রশ্ন হচ্ছে নিকল্স্ এবং আমাদের রবীন্দ্র-সমালোচক এ ধরনের বই বা প্রবন্ধ লেখে কেন?

www.pathagar.com

এরা চায় পয়সা, কিন্তু জানে ভারতবর্ষ তথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা লেখবার মতো মুরোদ এদের নেই। এদের বই কেউ কিনবে না। কিন্তু যদি গালাগাল দিয়ে লেখে তবে বহু লোক সেসব বইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করবে, ফলে হট্টগোলের সৃষ্টি হবে এবং সেই ডামাডোলে বিস্তর বই বিক্রি হবে। অশ্লীল বইও এই পদ্ধতিতে বাজারে কাটে।

অতএব আমাদের উচিত কী?

চুপ করে থাকা।

তবে আমি আলোচনাটা উত্থাপন করলুম কেন? তার কারণ বহু সরল পাঠক এই ছুঁচোমিটা না ধরতে পেরে হট্টগোলের সৃষ্টি করে বই বিক্রির সহায়তা করেন। আমার বক্তব্য, সবাই যেন এ বাবদে একদম 'নিশ্চুপ' 'ডেড্ সাইলিন্ট' পন্থা অবলম্বন করেন। আলোচনা উত্থাপিত হলেই নাক সিঁটকে বলবেন, 'মাপ করবেন, স্যার, এ বিষয়ে আমার কণামাত্র উৎসাহ নেই।' বলেই অন্য কথা পাড়বেন। বলবেন, 'দেখো দিকিনি, রায় পিথৌরা কী চমৎকার লেখে' কিংবা উল্টোটা। যাই করুন না কেন, রায় পিথৌরার তাতে করে দু পয়সা আমদানি বাড়বে না।

* * *

ইংরেজ বড় হুঁশিয়ার জাত। তারা এই পদ্ধতিতে ভালো বইও খুন করতে জানে।

লায়োনেল ফিলডেন নামক এক ব্যক্তি এদেশে কয়েক বৎসর 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর' বড় কর্তা ছিলেন। এদেশে ইংরেজের কীর্তিকারখানা দেখে ভদ্রলোক বিলেত গিয়ে সে সম্বন্ধে একখানা চটি বই লেখেন— একদা ডিগবি যেরকম 'প্রসপারাস' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লিখেছিলেন।

ইংরেজ বইখানা সম্বন্ধে এমনি ঠোঁট সেলাই করল যে বইখানা অতি অল্প লোকই পড়েছেন।

ঋষিরা তাই বলেছেন, নীরবতা হিরণ্ময়, 'সাইলিন্স্ ইজ গোল্ডেন!'

* * *

দিল্লির ওপর দিয়ে বড় গর্দিশ গেল। বিস্তর ফিল্ম দেখানো হল, 'তারকাদের' মিছিল হল, হাইফেৎস্ বেয়ালা বাজালেন, পণ্ডিতজি 'নেশনাল ট্রেজার্স ফান্ড' খুললেন, সবচেয়ে বড় পোলো ফাইনাল হল, এলেনর রুজভেল্ট এলেন, তার ওপর গোটা তিনেক চিত্রপ্রদর্শনী! মানুষ ক'দিক সামলায়? সব সামলাতে গেলে রায় পিথৌরার কুইনটুপ্লেটের প্রয়োজন।

বাসু ঠাকুর যে বাড়ির খুশ-নাম ষোল আনা রাখতে পেরেছেন তা নয়। অবশ্য তিনি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দু জনার কাছ থেকে যা শিখেছেন তার অনেকখানি কাজে লাগাতে পেরেছেন।

বাসু ঠাকুরের ছবিতে প্রচেষ্টা আছে। ভদ্রলোক অনেক কিছু দেখছেন এবং ভেবেছেন তার চেয়েও বেশি। তুলির জোর তো আছেই, তার চেয়েও বেশি মূর্তি গড়ার হাত। বাসু ঠাকুরের সৃষ্টি তাই যে শুধু আনন্দ দেয় তা নয়, ছবিগুলোর সামনে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু ভাবা যায়। প্রদর্শনী বহুদিন ধরে খোলা থাকবে।

* * *

ক্রিকেট ম্যাচে যখন পাশের বে-রসিক নানারকম উদ্ভট প্রশ্ন শুধায় তখন উদ্ভট উত্তরও পায়।

'ওগুলো কী?'

www.pathagar.com

বিরক্তির সঙ্গে, 'উইকেট।'

'ওগুলো দিয়ে কী হয়?'

ততোধিক বিরক্তির সঙ্গে, 'ক্লান্ত হলে খেলোয়াড়দের বসবার জন্য।'

পোলো খেলা দেখতে গিয়ে আমার সেই অবস্থা; 'চক্কর' কী, 'হাফ গোল' কারে কয়, ফাউল কখন হয় আর কখন হয় না তাই বুঝবার পূর্বে খেলা শেষ হয়ে গেল।

তবু, আহা, দেখবার জিনিস! এক গোল থেকে আরেক গোল অবধি (ফুটবল তিন সাইজ) ঘোড়াগুলো যা ছুট দেখাল তার জন্যই ও খেলা দেখার প্রয়োজন। রাজা-রাজড়াদের গদি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলাও ঝিমিয়ে আসছে। মরে গিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে এক দফা দেখে নেবেন।

পনের

খ্রিস্টের ছ শ বছর আগে বৈশালীতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বলা হয়, বুদ্ধদেব এই বৈশালী রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন এবং আপন সঙ্ঘ নির্মাণের সময় তার অনেকখানি অনুকরণ করেন। এই বৈশালীতেই মহাবীর জীনের জন্ম।

বৈশালীর স্মরণে এখনও সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব হয়। এবারকার উৎসবে শ্রীযুত কানহাইয়ালাল মুন্সী সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুত মুন্সী বলেন, আমরা যদি ভারতের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-ঐক্য এবং বিশ্ব-ঐক্যের ভিতর দিয়ে ভারতকে অখণ্ড রূপে চেনার চৈতন্য না জাগিয়ে তুলতে পারি তবে আমাদের স্বাধীনতা লোপ পাবে, স্বাধীনতা গেলে আমাদের আত্মার মৃত্যু হবে, আত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 'মহতী বিনষ্টি'।

এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনে কোনওপ্রকারের সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন, ভারতীয় কিংবা বিশ্ব-ঐক্যের সাধনার সঙ্গে প্রাদেশিক বৈদগ্ধ্যের সংঘাত আছে কি নেই? আমরা যখন বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা করি, আমি যখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তমরূপে হিন্দি শিখতে এবং লিখতে নারাজ তখন আমাকে বাঙালি কূপমণ্ডূক এবং ভারতীয় ঐক্যের পয়লা নম্বরের দুশমন বলা হবে কি না?

বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় যদি আজ আদাজল খেয়ে (আর অন্য বস্তু আছেই বা কী যে খাবে?) হিন্দি চর্চায় বসে যায়, বাঙলা বর্জন করে হিন্দিতে উত্তম উত্তম কাব্য কথাসাহিত্য রচনা করে তামাম ভারতকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দেয়, প্রবীণ হয়েও সুনীতি চট্টো নাকি দেখাতে পেরেছেন— তা হলে আমার কণামাত্র— আপত্তি নেই (যদিও একথা বলব যে কেউ যদি হিন্দি শিখে কোনও ভালো বই বাঙলায় অনুবাদ করে তবে আমি খুশি হই বেশি) কিন্তু দয়া করে আমার মতো প্রবীণদের আর এ গর্দিশে ফেলবেন না।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

গৃহিণী শুনে স্তম্ভিত যে বড়বাবুকে মাসের কুড়ি তারিখে হাওলাত দেয় তাঁরই আপিসের এক বেনে কেরানি। বড়বাবুর মাইনে সাত'শ, আর কেরানির ত্রিশ। গৃহিণী চেপে ধরলেন,

www.pathagar.com

তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে হবে সে কী করে বাড়ি চালায়। কর্তা বহুবার গাঁইগুঁই করে শেষটায় না পেরে গেলেন একদিন সন্ধের পর তারাপদ'র বাড়িতে।

বাড়ি অন্ধকার। ডাকাডাকিতে আলো জ্বলল। তারাপদ নেবে এল হাতে পিদিম, পরনে এইটুকুন গামছা। বড়বাবুকেও ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে বসিয়ে শুধাল, 'কোনও লেখা-পড়ার কর্ম আছে কি?'

'না। কেন?'

'তা হলে পিদিমটা নিবিয়ে ফেলতে পারি আর গামছাখানা খুলে রাখতে পারি।' বড়বাবু যা দেখবার জন্য এসেছিলেন তা দেখা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পাড়ার মুখে পৌঁছতে না পৌঁছতেই চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'গিন্নি, শিখে এসেছি, শিখে এসেছি কিন্তু আমার দ্বারা হবে না।'

বড়বাবুর মতো আমারও জানা হয়ে গিয়েছে, হিন্দি শিখলে আমার বহুৎ ফায়দা হবে, কিন্তু ওই যে বড়বাবু বললেন, 'আমা দ্বারা হবে না' সেই মোক্ষম কথা!

উর্দুতেও এই মর্মে একটি উত্তম কবিতা আছে। মোমিন নামক কবিকে বলা হয়েছিল, 'আর কেন? সমস্ত জীবন তো কাটালে পাপ কর্ম করে করে; এইবার একটু ধর্মে মন দাও!'

মোমিন বললেন,

'উম্র সারী তো কটী ইশ্‌কে বুতাঁ মে
মুমিন!
আখরী ওক্তমে ক্যা থাক্ মুসলমাঁ
হোঙগে?'

'সমস্ত জীবন তো কাটল প্রেম-প্রতিমাদের
মহব্বতে, রে মুমিন,
এখন এই আখেরি সময়ে কী ছাই
মুসলমান হব।'

তাই হিন্দি-উর্দু মাথায় থাকুন। যেটুকু টুটিফুটি শেখা আছে সেই 'করেঙ্গা', 'খায়েঙ্গা', 'হাই', 'হুই' করে জীবনের বাকি কটা দিন 'প্রেমসে' চালিয়ে নেব।

কিন্তু যদি বলি, বাঙলার চর্চা যে আমি আমার কট্টর বাঙালিত্বের জন্য করছি তা নয়—বাঙলার সেবার ভিতর দিয়েই আমি ভারতীয় ঐক্যের সেবা করছি; তা হলে হিন্দিপ্রেমী বাঙালিরা হয়তো আমাকে তাড়া লাগাবেন। তবু সেইটেই হক্ কথা, এইখানেই খাঁটি জাতীয়তাবাদ।

আমাকে বিশ্বনাগরিক হতে হলে তো আর বিশ্বসংসারের ভাষা শিখতে হয় না, কিংবা এসপেরান্টোও কপচাতে হয় না। আমি মালাবারের ভাষা জানিনে তবু মালাবারের লোককে আমার বড় ভালো লাগে। আমি কিঞ্চিৎ ইংরেজি জানি এবং তার অনুপাতে ইংরেজকে অপছন্দ করি অনেক বেশি।

অতএব ভারতকে ভালোবাসা যায় হিন্দি না শিখেও। রোমাঁ রোলাঁ হিন্দি জানতেন না তবু তিনি ভারতবর্ষকে চিনতেন ও ভালোবাসতেন অনেক দুবেজি পাঁড়েজির চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

www.pathagar.com

সুইটজারল্যান্ডের নিজস্ব 'সুইস' বলে কোনও ভাষা নেই। সুইসরা ফরাসি, জর্মন, ইতালীয় ও রোমানি ভাষায় কথা কয়। এবং শতকরা নব্বুইজন একাধিক ভাষা বলতে পারে না। ফরাসি-সুইটজারল্যান্ডে অতি অল্প লোকই জর্মন জানে, ইতালীয়-সুইটজারল্যান্ডেও তাই। অথচ এই চার ভাষায় গড়ে ওঠা সুইটজারল্যান্ড একতায় জর্মনি-ইতালিকে অনায়াসে হার মানাতে পারে।

আরবদেশের ভাষা আরবি, ধর্ম ইসলাম, জাতে তারা সেমিটি। আরব মাত্রেরই এই তিন-তিনটে ঐক্যসূত্র আছে— পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ বিরল। তবু দেখুন তারা কটা রাষ্ট্রে বিভক্ত— তাদের ভিতর রেষারেষি কীরকম মারাত্মক! সউদি আরব, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন, মিশর, কুওয়াইত, বাহরেন। আলজিরিয়া, তুনিসিয়া, মরক্কোর কথা আর তুললুম না— সেখানে মূররক্ত কী মেকদারে আছে জানিনে। তাই যখন করাচি 'বিশ্ব-মুসলিম সঙ্ঘ' গড়ার খেয়ালি-পোলাও খায় তখন হাসি পায়। আরবদের এতগুলো ঐক্যসূত্র থাকতেও তারা সম্মিলিত হতে পারছে না, তার ওপর তুর্ক, ইরানি, পাকিস্তানি, জাভার মুসলমানকে ডেকে এনে একতা স্থাপন করা!

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, যে ভারতীয় বৈদগ্ধ্য ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে তার বুনিয়াদ প্রদেশে প্রদেশে। প্রত্যেক প্রদেশ আপন নিজস্ব ভাষা এবং সাহিত্য, আপন জনপদসুলভ আচার-ব্যবহার চারুশিল্প, আপন প্রদেশপ্রসূত ধর্ম এবং সম্প্রদায় এসব তাবৎ বস্তুর চর্চা করে যে ফললাভ করবে তারই ওপর একদিন দাঁড়াবে বিরাট কলেবর, বৈচিত্র্যসুশোভিত, সর্বজনগ্রাহ্য ভারতীয় বৈদগ্ধ্য।

আমার এক কাষ্ঠরসিক বাঙালি বন্ধু এই দেহলি-প্রান্তেই বিনিদ্রযামিনী যাপন করছেন হিন্দি চর্চায়— ইনি সেই ব্যক্তি যিনি কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে দোস্তি জমান।

তিনি বিস্তর হিন্দি পড়েছেন। ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছেন, হিন্দির, পুল্লিঙ-স্ত্রীলিঙ্ তাঁকে কণামাত্র বেকাবু করতে পারে না, হিন্দির 'ফাউলার' শ্রীবর্মার 'অচ্ছি হিন্দি' তাঁর নখাগ্র-দর্পণে।

তিনি বলেন— আমি বলছিনে, কারণ আমার শাস্ত্রাধিকার নেই— হিন্দি ভাষা বাঙলার তুলনায় এখনও এত কাঁচা এত 'লিক্উয়িড্' যে, এ ভাষাতে যে কোনও উত্তর-ভারতীয় অনায়াসে উত্তম হিন্দি লিখতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করেন, ভালো বাঙলা লিখতে হলে যে মেহন্নত যে খাটুনির প্রয়োজন তার অর্ধেক পরিশ্রমে অত্যুত্তম হিন্দি লেখা যায়।

তাই তিনি বলেন, বাঙালির তো সব আছে। এখন তার একমাত্র পন্থা, হিন্দি মার্কেট ক্যাপচার করা— সুহৃদ ব্যবসায়ী তাই হামেশাই কারবারি ইডিয়াম ব্যবহার করেন— অর্থাৎ 'অচ্ছি হিন্দি' শিখে, রবীন্দ্রনাথ-শরচ্চন্দ্রের কাছ থেকে নেওয়া শৈলী এবং ভাষা হিন্দির ওপর চালিয়ে দিয়ে হিন্দি সাহিত্যে রাজত্ব করা।

হয়তো হক্ কথাই কয়েছেন কিন্তু আমার মন সাড়া দেয় না।

প্রথমত এই প্রস্তাবে কেমন যেন একটা উৎকট প্রাদেশিকতা রয়ে গিয়েছে, কেমন যেন একটা 'একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' গোছ ইম্পিরিয়ালিজম রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যই-বা এমন কোন গৌরীশঙ্করের চূড়োয় পৌঁছে গিয়েছে যে তার সেবকদের হিন্দি জয় করবার জন্য ছুটি দিতে পারি?

www.pathagar.com

ষোল

এককালে এদেশে বিস্তর ফারসি চর্চা হত। সরকার, মুন্সি, বখশি, কানুনগো, এসব যাঁদের পদবি তাঁদের বাপ-পিতেমো উমদাসে উমদা ফারসি শিখে এককালে মোগল রাজত্ব চালিয়েছেন। সরকার তো চিফ সেক্রেটারি, বখশি মানে চিফ পে মাস্টার অর্থাৎ একাউন্টেন্ট জেনারেল! বাপস্— এসব আপিসারদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানে তো বাঘের সামনে দাঁড়ানো। কান দিয়ে ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। আর ওনারা রেগে গেলে তো হাড্ডি বিলকুল পিলপিলিয়ে যায়।

যাক্ মোদ্দা কথায় ফিরে আসি। এইসব বখশি-মুন্সিরা কিন্তু আজকের দিনের সেক্রেটারি-একাউন্টেন্টের মতো ছিলেন না— অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যেরও চর্চা করতেন, 'মুশায়েরায়' (কবি-সম্মেলন) কবিতা পড়তেন, 'বয়ৎবাজি'তে (কবির লড়াই) মাথায় গামছা বেঁধে নেমে যেতেন।

স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই ঐতিহ্যের ভিতর আপন কবিত্বপ্রতিভার বিকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল দরদ ছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রতি। তাই তিনি হাফিজ-সাদির উত্তম উত্তম কবিতা অতি সরল বাঙলায় অনুবাদ করেন। এ কবিতাগুলো পড়ে হিন্দুরাই যে শুধু 'গুলিস্তানে'র গুলের খুশবো আর বুলবুলের মিঠি বোলি শুনতে পেতেন তাই নয়, উনবিংশ শতকের শেষের দিকের বাঙালি মুসলমান যখন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জোর চর্চা আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাবশতক' অতিশয় ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে মুখস্থ করলেন। আমার বাল্য বয়সে আমি বৃদ্ধদের (হিন্দু- মুসলমান উভয় শ্রেণিরই) গদ্‌গদ হয়ে আবৃত্তি করতে শুনেছি—

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন।

এবং সর্বশেষে

প্রেম নাই প্রিয়লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মতো ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে?

কিন্তু এসব গাজন আজ কেন?

গেল সপ্তায় বারোটি ইরানি দিল্লি এসেছিলেন; তার মধ্যে আটজন ছাত্র, দু জন শিক্ষক। এঁরা এসেছেন পশুচিকিৎসার শিক্ষাদান এবং গবেষণা দেখতে। এঁদের ভেতর দেড়জন জানেন ইংরেজি আর একজন ফরাসি।

কাজেই ফরেন-আপিসের দাওয়াতে গিয়ে দেখি ছেলেরা নিজেদের ভিতর গুজুর গুজুর করছে। কী আর করি— আমার মুরুব্বি ফারসির বাঘা মৌলবি স্বর্গত জয়রাম মুন্সির নাম স্মরণ করে চালালুম 'হাস্ত' 'হুস্ত'। ফারসি ভাষাটা কঠিন নয় আর ইরানিরা ভদ্রতোয় লক্ষ্ণৌ কিংবা চীনদেশীয়কে হার মানাতে পারে। সুতরাং তাঁরা আমার ফারসি শুনে মার তো লাগালেনই না বরঞ্চ উৎসাহের সঙ্গে গাল-গল্প জুড়ে দিলেন।

মুরুব্বি জয়রাম মুন্সি *সদ্ভাবশতক* পড়ে পড়ে আমাকে তার মূল কী, কোন কবি সেটি রচনা করেছেন এসব হদিস দিতেন— গুলস্তান বোস্তান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু হায়, আমাকে

www.pathagar.com

'শেষ-শিক্ষা' দেবার পূর্বেই খুদাতালার আপন গুলস্তানে তাঁর নিমন্ত্রণ এসে গেল, এখানকার পাট তুলে দিয়ে সেখানে গজলকসিদা গাইবার জন্য।

আমি সে রাতের খানাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙলা অনুবাদের টুটিফুটি ফারসি অনুবাদ করতে লাগলুম, আর ছেলেটা টক্ টক্ করে তার মূল ফারসি বলে যেতে লাগল। আমার ভারি আনন্দ হল যে, পশুচিকিৎসা যাদের পেশা তারা যে এতখানি সাহিত্যচর্চা করে!

আর তারা খুশি যে, ভারতের শেষ প্রান্ত বাঙলা দেশের লোক তার আপন ভাষায় হাফিজ-সাদি গেয়েছে দেখে।

* * *

বাঙালিদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়িটির প্রতি বাঙালি মাত্রের কিঞ্চিৎ দরদ থাকা দরকার। অনেক ভারতীয়েরও আছে, একথা আমি নিশ্চয় জানি। বিশেষত '৪৬-'৪৭ সালে দাক্ষিণাত্যে তাঁর যে কী প্রতিপত্তি ছিল তা-ও আমি দেখেছি।

কেন্দ্রীয় সরকার কি এ বাড়িটি কিনে নিতে পারেন না? বার্লিনে আমাদের যে রাজদূতাবাস বসবে তাঁরা ভাড়াটে বাড়িতে থাকবেন এবং সস্তায় থাকতে হলে আখেরে ভারতীয় সরকারকে বার্লিনে বাড়ি কিনতে হবে। কাজেই এই বাড়িটি কিনলে ভারতীয় সরকার কিছু অপকর্ম করবেন না।

আর যদি ভারতীয় সরকার এ বাড়িটি কিনতে রাজি না হন, তবে বাঙালি কি এ বাড়িটি কিনতে পারে না? তুমি-আমি গরিব সে আমি জানি, কিন্তু সবাই মিলে যদি একটা চেষ্টা দেওয়া যায়, তবে কি কর্মটা একেবারেই অসম্ভব?

এ নিয়ে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত।

আমরা বাড়িটি সম্বন্ধে অন্যসব খবরের তত্ত্বতাবাস করছি। ইতোমধ্যে কিন্তু আন্দোলনটা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।

* * *

শ্রীমতী রজোভেল্ট আমেরিকা ফিরে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক এবং তারা সেই আধ্যাত্মিকতা পেয়েছে তাদের ধর্ম থেকে।

এ তো বাঙলা কথা। আধ্যাত্মিকতা আসে তো ধর্ম থেকেই— এতে আর নতুন কী বলা হল?

উঁহু। ইংরেজিতে কথাটা অন্যরকম শোনায়। শ্রীমতী বলেছেন, ভারতীয়রা স্পিরিচুয়াল এবং তাদের স্পিরিচুয়ালিটি এসেছে তাদের রিলিজিয়ান থেকে।

অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটি এবং রিলিজিয়ান সচরাচর এক জিনিস নহে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বহু লোক স্পিরিট (আত্মার) সাধনা করে, কিন্তু অনেকে রিলিজিয়ান জানে না।

তাই সপ্রমাণ হল রিলিজিয়ান এবং ধর্ম এক জিনিস নহে। এবং সেই কারণেই 'হিন্দু ধর্ম' বলে কোনও জিনিস থাকতে পারে না। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের আগে 'হিন্দু' শব্দ লাগানো যায় না। ঠিক যে রকম 'হিন্দু ভগবান' 'মুসলমান ভগবান' কিংবা 'খ্রিস্টান ভগবান' হতে পারে না ঠিক তেমনি 'হিন্দু ধর্ম' আমার কানে অদ্ভুত শোনায়।

শুধু হিন্দুরাই নয়, বৌদ্ধরাও যখন ত্রিশরণ মন্ত্রে 'ধর্মাং শরণং গচ্ছামি' বলেন তখন তো 'ধর্মের' পূর্বে বৌদ্ধ শব্দ লাগান না। কুরানে ধর্ম শব্দের জন্য পাই 'দীন' কিংবা 'দীনুল্লা' অর্থাৎ

www.pathagar.com

যে 'দীন আল্লার দিকে নিয়ে যায়'। অন্য শব্দ 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের ধাতু, 'ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা।'

তাই ধর্ম শব্দের আগে 'হিন্দু' কিংবা 'মুসলমান' শব্দের প্রয়োগ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ধর্ম সর্বমানবের জন্য— তার আবার হিন্দু-মুসলমান কী?

গত বৎসর এই সময়ে রমণ মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। 'ইসলাম' শব্দের স্মরণে মহর্ষির কথা মনে পড়ল।

দাক্ষিণাত্যের তিরু-আন্নামলাই গ্রামের রমণাশ্রমে কয়েক মাস থাকার সৌভাগ্য আমার জীবনে একবার হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সচরাচর কাউকে দর্শন দিতেন না আর রমণ মহর্ষিকে উদয়াস্ত একই ঘরে পাওয়া যেত। নানা লোক নানা প্রশ্ন করত, মহর্ষি উত্তর দিতেন। অবশ্য রেসে কোন ঘোড়া জিতবে জিগ্যেস করলে চুপ করে থাকতেন, এমনকি ভগবান কেন সংসারটা তৈরি করলেন, তার উত্তরও দিতেন না। বড্ড বেশি খোঁচাখুঁচি করলে বলতেন, 'তোমার তা জেনে কী দরকার।'

একদিন আরেকটুখানি বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বললেন, 'তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেটার উত্তর আমি যদি দিই, তবে সে উত্তর তুমি বুঝবে কী দিয়ে? অবশ্য তোমার মন দিয়ে। এখন তবে প্রশ্ন, তুমি তোমার মনটাকে বুঝতে পেরেছ কি? যে ফিতেটা দিয়ে তুমি জমি মাপতে যাচ্ছ তারই যদি দৈর্ঘ্য না জানো, তবে মেপে লাভ কী? তাই সক্কলের পয়লা মনটাকে চিনতে হয়।'

একদিন দেখি জনাচারেক বয়স্ক তামিল মুসলমান মহর্ষিকে প্রণাম করে সামনের মেঝেতে বসল। দেখে মনে হল চাষাভূষা শ্রেণির কিংবা কোচম্যান হ্যান্ডিম্যানও হতে পারে।

অনেকক্ষণ মহর্ষির দিকে তাকিয়ে থেকে শেষটায় একজন অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে তামিল ভাষায় বলল, 'আমরা আপনাকে অনেক প্রশ্ন জিগ্যেস করে বিরক্ত করতে চাইনে বলে বাড়ি থেকে সবাই মিলে একটিমাত্র প্রশ্ন ঠিক করে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি উত্তর না-ও দেন, তাতেও আমাদের আক্ষেপ নেই, কারণ আপনার দর্শন আমরা পেয়েছি সেই যথেষ্ট।'

শিশুর মতো মহর্ষি সরল হাসি হাসলেন। বললেন, 'বলো।'

প্রবীণটি বলল, 'মানুষের জীবনে সবচেয়ে কাম্য ধন কী?'

তৎক্ষণাৎ মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'ইসলাম।'

চারজনই অনেকক্ষণ ধরে মহর্ষির দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর প্রণাম করে সন্তুষ্টচিত্তে বেরিয়ে গেল।

আমি জানি, মহর্ষি কোন অর্থে ইসলাম বলেছিলেন। এ চারজন বাড়ি ঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই 'ইসলাম' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করবে এবং আল্লার কৃপা থাকলে সত্য ধর্মে পৌঁছবে।

সতের

ভারতীয় পার্লামেন্টের বাঙালি সদস্যগণকে নয়াদিল্লির কালীবাড়ি গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভায় আমন্ত্রণ করে অভিনন্দিত করেন। উল্লেখ প্রয়োজন নিমন্ত্রিত বাঙালিগণ সকলেই বঙ্গবাসী নন, এঁদের কেউ কেউ বাঙলা দেশের বাইরে থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসন

www.pathagar.com

পেয়েছেন। তাছাড়া বাঙলা ভাষাভাষী উড়িয়া বিহারি আসামি সভ্যদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের কেউ কেউ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিমন্ত্রিত সদস্যগণকে মাল্যদান করত একে একে সভার সঙ্গে পরিচিত করান।

এই উপলক্ষে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কালীবাড়ির নতুন পুস্তকালয় এবং পঠনগৃহের দ্বার উন্মোচন করেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বলেন, বাঙালির আজ দুর্দিন— বাঙলার সামনে আজ নানা কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং সেগুলো সমাধান করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা দলগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সুদ্ধমাত্র খাঁটি বাঙালিরূপে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এবং এ কর্মে যে শুধু বাঙালিই যোগ দেবেন তাই নয়; বিহার, উত্তর প্রদেশের বাঙালিরাও তাঁদের সহযোগিতা দেবেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ আরও বলেন, ভারতের ইতিহাস এবং ভাগ্য নির্মাণে বাঙালির দান নগণ্য নয়; আজ যদি বাঙালি তার দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধান না করতে পারে তবে যে শুধু বাঙালিই লোপ পাবে তা নয়, তাতে করে সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। (বাঙলা শর্টহ্যান্ড জানিনে, কাজেই প্রতিবেদনে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে আশাকরি বক্তা অপরাধ নেবেন না।)

এ তো অতি খাঁটি কথা— একথা অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু প্রশ্ন আমাদের সমস্যাগুলো কী, এবং তার সমাধানই-বা কী? ডা. শ্যামাপ্রসাদ যদি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন তবে আমরা উপকৃত হতুম। তবে হয়তো প্রীতিসম্মেলন দীর্ঘ ভাষণের উপযুক্ত স্থান নয় বলেই তিনি এ নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করেননি। কিন্তু তবু অধমের বক্তব্য, অন্যত্র শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ যেসব ভাষণ দেন সেগুলো তিনি তাঁর দলের মতবাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকেই দিয়ে থাকেন। তাঁরই কথামতো তিনি যদি খাঁটি বাঙালি হিসেবে নিরপেক্ষ বক্তৃতা দিতেন তবে আমরা অর্থাৎ যারা কোনও দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই— উপকৃত হতুম। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দিল্লিবাসী বাঙালিগণকে নিরাশ করবেন না।

রায় পিথৌরার কথায় কেউ বড় একটা কান দেয় না— আর দেবেই-বা কেন, সে তো আর কেষ্ট-বিষ্টু কেউ-কেডা নয়— এবং তাই সে বড় খুশি। সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সে তাই তখন পরমানন্দে যাচ্ছেতাই (হায়, যদি ঠিক 'যা ইচ্ছা তাই' ঠিক ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারতুম তবে তো এতদিনে দেশবিদেশে কবি, সাহিত্যিক হিসেবে নাম করে ফেলতে পারতুম— দু পয়সা ভি আসত) বলে যায় এবং তারই মতো আরও কয়েকজন দায়িত্বহীন পাঠক সেগুলো পড়ে বলে, 'ঠিক বলেছ।' এঁদেরই জন্য আমি কলম ধরি; তাই আমার মনে হয়— স্বাধীনতার পর বাঙলার আকার ছোট হয়ে যাওয়াতে আমাদের নতুন সমস্যার অন্ত নেই।

তাই দেখতে হবে বাঙলার আয়তন কী প্রকারে বাড়ানো যায়।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় প্রদেশগুলোকে যদি নতুন করে গড়ে তোলা হয় তবে বাঙলার আয়তন বাড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে।

বাঙলার বাইরেও বাঙালি সংস্কৃতির স্থান আছে। একথা কে না জানে, উড়িষ্যা, আসাম ও পূর্ব বিহারের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই উত্তম বাঙলা জানেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা

www.pathagar.com

সুপরিচিত, তাঁদের বাড়ির মেয়েরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান এবং এসব প্রদেশের অশিক্ষিত জনও বাঙলা ফিল্ম দেখে।

আজ যদি এইসব প্রদেশের বাঙলাভাষী অঞ্চলগুলো বাঙলাকে দিয়ে দেওয়া হয় তবে বহু বাঙলাপ্রেমী বিহারি, আসামি এবং উড়িষ্যাবাসী আমাদের ওপর বিলক্ষণ রেগে যাবেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাগের বশে বাঙালি সংস্কৃতি বর্জন করতে আরম্ভ করবেন।

এই পরিস্থিতির কথা ভাবলেই আমি বড্ড ভয় এবং ক্লেশ পাই।

কারণ বাঙলা দেশের পরিমাণের চেয়েও আমি বহু বহু গুণে বেশি মূল্য দিই বাঙালি সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিকে। আমার ধ্যানের বাঙলা বাঙলা দেশে সীমাবদ্ধ নয়— পশ্চিমবাঙলার গুটিকয়েক জেলাই তার বিহার-ভূমি নয়— আমার ধ্যানের বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যার সুদূরতম প্রান্ত অবধি— না, কম বলা হল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, দিল্লি, জয়পুর যেখানেই বাঙলা সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে, ছায়া পড়েছে, সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙলা। পূর্ব-বাংলাও তাই এ ধ্যানের বাঙলার ভিতরে।

টমাস মান্ যখন যুদ্ধের পর বিভক্ত জর্মনির পশ্চিমাঞ্চলে নিমন্ত্রিত হন তখন তাঁকে জিগ্যেস করা হয়েছিল তিনি পূর্বাঞ্চলেও যাবেন কি না? উত্তরে মান্ বলেছিলেন, যেখানেই জর্মন সংস্কৃতি সম্মান পায় সেখানেই আমার মাতৃভূমি।

এই ধ্যানের বাঙলা যেন বিনষ্ট না হয়।

জমিদারি বাড়ানো ভালো কিন্তু জমিদারি বাড়াতে গিয়ে যদি হাজার হাজার মিত্রকে শত্রু করতে হয়, তাঁদের সঙ্গে যদি আমার আহার-বিহার বন্ধ হয়ে যায়, তাঁরা যদি আমার সভ্যতা সংস্কৃতির চর্চা বর্জন করেন তবে দেখতে হবে, ভাবতে হবে, আমার কর্তব্য কী?

ওদিকে মানভূমি, সিংভূমের বাঙালির প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ ধর্মবোধও আছে। কোনও কোনও অদূরদর্শী বিহারিরা নাকি ওইসব অঞ্চল থেকে বাঙলা চর্চা তুলে দিতে চান— আমি হলফ করে কিছু বলতে পারব না, কারণ ওসব অঞ্চলে গিয়ে উৎকট সব সমস্যার সম্মুখীন হবার দায় থেকে শ্রীগুরু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন; তাই যদি হয় তবে সেই-বা চোখ কান বন্ধ করে সয়ে নেব কী প্রকারে?

এই পিন্‌সার মুভমেন্টের সামনে আমি হিমশিম খেয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ঠিক এইখানেই তো পিথৌরাতে-শ্যামাপ্রসাদে তফাত। এ সমস্যার সমাধান পিথৌরা জানে না, দায়ও তার নয়; শ্যামাপ্রসাদ যদি শ্যামার প্রসাদ পান তবে সমস্যা-সমাধান করতে পারবেন বলে আশাকরি। না হলে নেতা হলেন কেন?

তবে শেষ কথা এই : তিনি নিজেই যা বলেছেন সেইটাই সত্যি। এ সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হবে তাঁর পার্টিগত দৃষ্টিবিন্দু বর্জন করে, একদম হানড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট নির্জলা, নির্ভেজাল খাঁটি বাঙালিরূপে।

এবং শ্যামাপ্রসাদের বাঙালিত্ব সন্দেহ করবে কে? যদি কেউ করে, তবে বিদ্যেসাগর মহাশয়ের ভাষাতে বলি (সাবধান, চ্যালেঞ্জ করবেন না, আমি গেল কয়েক মাস ধরে শুধু বিদ্যাসাগরই পড়েছি), 'তার বাপ নির্বংশ হোক!'

বাঙালিকে একথা ভুললে চলবে না, সে বাঙালি। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রিশ্চান নয়— সে বাঙালি।

www.pathagar.com

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী, বিদ্রোহী বীর, পরলোকগত উপীনদা এ সম্বন্ধে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'তে যা লিখেছেন সেটা বাঙালি যেন বারবার পড়ে, উদয়াস্ত সেই মন্ত্র জপ করে।

একবার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই একথা সবাইকে মেনে নিতে হয়।

বাঙলা-সাহিত্যের আঁতুড়ঘর বৌদ্ধ-মন্দিরে— চর্যাপদ নিয়ে, বেদবেদান্ত নিয়ে নয়। তার পর তার বৈষ্ণব রূপ। আজ বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু যে যুগে সে জন্মগ্রহণ করে সে যুগে সে ব্রাত্য— ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস ধোপানি রামীকে বলেছেন,

তুমি বেদ-বাদিনী হরের রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারে ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।

এ যদি বিদ্রোহ না হয়, এ যদি স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি না হয়, তবে স্বাধীনতা কী? তার পর বাঙলা গদ্যের সূত্রপাত রামমোহন। তিনিও বিদ্রোহী— প্রচলিত হিন্দুধর্মের কতই না জঞ্জাল তিনি লৌহ-সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন। তার পর বাঙলার শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিদ্যাসাগর মহাশয়— তাঁকে বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তের বাইরে— তিনিও 'সনাতন' ধর্মের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের বিজয়পতাকা তুলেছেন। তার পর মাইকেল— রাম রাম! তিনি তো কেরেস্তান; কিন্তু শুধাই, আজ এবং সে যুগেও কেউ তাঁকে তাই নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছে? ওদিকে পূর্ব-বাঙলায় মুসলমানরা কেচ্ছা-সাহিত্য, মুর্শিদিয়া, জারি, দর্বেশি রচনা আরম্ভ করেছেন— হিন্দু দীনেশচন্দ্র তো সেগুলো অবহেলা করলেন না! আজ মৈমনসিংহী গীতকবিতা বাংলার অলঙ্কার। তার পর বঙ্কিম; তিনি তো বৃন্দাবনের রসরাজকে সর্বজনসমক্ষে খুন করলেন (এবং আশ্চর্য, যে ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণবধর্মকে তাচ্ছিল্য করে কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' বলেন— আমার শোনা কথা— সেই সমাজের মহাপুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'রসরাজ চলে গেলে আমাদের থাকবে কী?')। এবং পশ্য, পশ্য, যে বাঙালি বঙ্কিমকে 'ঋষি' উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সে-ও রসরাজকে বর্জন করেনি। ঠিক ওই সময়ে কি না বলতে পারব না, কাঙাল হরিনাথের (কাঙাল যদি ছেলের মতো ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে) সখা মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধুতে' মুসলমানের কারবালার কাহিনী লিখলেন; এ বই 'হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস', তত্ত্ব এতে নেই, তবু বাঙালি আজও সে বই কেনে। তার পর রবীন্দ্রনাথ— তিনি কতখানি স্বাধীন চিন্তার প্রতীক ছিলেন সেকথা আপনারা আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন; তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্ম নন— তিনি বাঙালি। তার পর সুকবি নজরুল ইসলাম। মুসলমান। তাঁর তখল্লুস্ (পেননেম) 'বিদ্রোহী কবি'। একে মুসলমান, তায় বিদ্রোহী। অথচ বাঙালি হিন্দু তাঁকে কী শ্রদ্ধাই না দেখিয়েছে— আজও তাঁর জন্মদিনে তাঁর রোগশয্যার চতুর্দিকে বহু বাঙালি জড় হয়। ক্ষীণ আশা নিয়ে যদি তিনি ক্ষণেকের তরে চৈতন্য পেয়ে আরও কিছু দেন ('টুকরো খবর' দ্রষ্টব্য)। সর্বশেষ 'পরশুরাম'। তিনি আমাদের প্রচলিত ধর্ম নিয়ে যে উৎকট মশকরা করেন সে তো অবিশ্বাস্য। অন্য কোনও দেশ হলে বহু পূর্বেই তিনি লিন্‌চট্, বার্নট এট দি স্টেক, কাফিররূপে কতলিত হতেন।

www.pathagar.com

বাঙালি বাঙালি। হিন্দুধর্মের প্রতি তার সোহাগ নেই, মুসলমানকে সে অবহেলা করেনি, কেরেস্তানও তার ভাই। এরকম উদারতা কটা জাত, কটা সাহিত্য দেখিয়েছে?

আমি তো বিশ্বসাহিত্য জানিনে। অগ্রজপ্রতিম সখা শ্রীযুত সুনীতিকুমার জানেন। তিনিই বলুন না? ভুল সপ্রমাণ হলে 'দেহলিপ্রান্ত' থেকে কলকাতা অবধি নাকে খৎ দেব।

অথচ কী আশ্চর্য! হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালিই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা বাঙালি। আপনারা যদি সাহস দেন, তবে সে প্রলাপও একদিন নিবেদন করব।

উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে অপরাধ নেবেন না। এই পাণ্ডববর্জিত ইন্দ্রপ্রস্থে চণ্ডীদাস পাই কোথায়?

আঠার

বিদেশ থেকে মহামেহন্নত করে বিরাট বিরাট ছবি এদেশে এনে কেউ যদি প্রদর্শনী খোলে, তবে সে সম্বন্ধে সামান্যতম অপ্রিয় বাক্য বলতেও ভদ্রজনের বাধো বাধো ঠেকে। অথচ মৌনতা দ্বারা সম্মতি অর্থাৎ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে যে-ভদ্র-মহোদয়গণ সোভিয়েট চিত্রপ্রদর্শনী খুলেছেন তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়। আমরা যদি চুপ করে থাকি, তবে তাঁরা ভাববেন এ ছবিগুলো আমাদের পছন্দ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ছবিই পাঠাবেন। আর আমরা যদি বলি, না, আমাদের প্রাণে এ ছবিগুলো কোনও স্পন্দন জাগাতে পারেনি, তবে হয়তো ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের বিশাল ভাণ্ডার থেকে অন্য ধরনের ছবি পাঠাবেন।

* * *

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছবিগুলো ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বা রিয়ালিস্টিক। স্থূলত এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রুশ বস্তুতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তার ছবি যে একদম বস্তুরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সেই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন বস্তুতান্ত্রিক ছবি হলেই তাকে কি রঙিন ফটোগ্রাফি হতে হবে? প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি তাই; এক শ বৎসর আগে, ইম্প্রেশেনিজম আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অবনতির যুগে, এরকম ছবি আঁকা হয়েছিল। ভারতবর্ষে রবি বর্মা এ ধরনের ছবি এঁকেই এদেশে নাম করেছিলেন। এসব ছবিতে মুন্সিয়ানা বিস্তর, খাটুনি এস্তার, কিন্তু এরা ছবির পর্যায়ে ওঠে না।

* * *

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, রুশরা ভালো আঁকবার চেষ্টায় যে কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে তার তুলনায় আমাদের অধিকাংশ চিত্রকররা কোনও মেহন্নতই করছেন না। ভালো করে লাইন টানার কিংবা তুলি ধরার পূর্বেই এঁরা সব সেজান গগাঁ মাতিসের অতিশয় দুর্বল অনুকরণ করে 'অরিজিনাল' ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দেন। প্রকৃতি বা জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ না করে, আপন হৃদয়ের জারক রসে সেটা না জারিয়ে নিয়ে তাঁরা আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তুজানোয়ার বানাতে আরম্ভ করে দেন। সব ফাঁকি, সব ফক্কিকারি— পিছনে কোনও মেহন্নত নেই, কোনও সাধনা নেই।

রাশাতে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। মেহন্নত এবং উৎপাদনের মাপকাঠি দিয়ে সেখানে অর্থ এবং সম্মানের ওজন করা হয়।

www.pathagar.com

রাশানরা খেটেছে, তাই ভবিষ্যতে এরা ভালো ছবি আঁকতে পারলে বিস্মিত হব না।

সর্বশেষ বক্তব্য, প্রদর্শনীতে উত্তম ছবিও কয়েকখানা আছে— জারের পূর্বেরও, পরেরও। তবে সেগুলো খুঁজে বের করতে হয়।

* * *

ইতোমধ্যে দিল্লিতে আর্ট নিয়ে গুটিকয়েক সম্মেলন হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, আমাদের জীবনের সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক ক্রমেই ছিন্ন হয়ে আসছে এবং আমাদের উচিত আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে আর্ট শেখাবার সুব্যবস্থা করা।

* * *

আর্ট শেখানো উচিত— এ কথা বলতে গিয়ে কিন্তু অনেকেই দুটো জিনিস মিশিয়ে ফেলেন।

দেশসুদ্ধ লোককে ছবি আঁকতে কিংবা গান গাইতে (স্থাপত্য অর্থাৎ বিরাট বিরাট এমারৎ তৈরি করা শেখানোর কথাই ওঠে না) শেখানোর চেষ্টা করা ভুল— কোনও দেশ করেও না। কিন্তু এসব কলারস আস্বাদন করার শক্তি ও রুচি জন্মানো প্রত্যেক শিক্ষায়তনেরই কর্তব্য। এবং তার ব্যবস্থা আমাদের স্কুল-কলেজের কোথাও নেই। আমাদের স্কুল-কলেজের দেয়ালে অজন্তা, রাজপুত, মুগল কলা, ত্রিমূর্তি, নটরাজ, কনারক খাজুরাহো, কুৎব্ তাজের ফটোগ্রাফ টাঙানো থাকে না; কাজেই সেগুলোতে কী কলারস রয়েছে সেকথা মাস্টার-অধ্যাপক কাউকেই বুঝিয়ে বলতে হয় না।

আমাদের তাবৎ ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। গদ্য এবং পদ্যে কী রস কোথায় লুকোনো আছে, আমাদের শিক্ষকরা সেটা পই পই করে বোঝান, শুকনো চসার পর্যন্ত আমাদের বাধ্য হয়ে চিবোতে হয়, এসব বিষয়ে রচনা লিখতে হয় ও সাহিত্যের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করতে হয় (কবিতা কী করে লিখতে হয় তার তালিম অবশ্য দেওয়া হয় না— লাতিন স্কুলে যেরকম লাতিন পদ্য এবং টোলে যেরকম সংস্কৃত পদ্য রচনা করতে শেখানো হয়)। বহু বৎসর ধরে এই কর্ম চলে এবং শেষটায় কেউ কেউ সাহিত্যানুরাগী হন। যাঁরা স্কুল-কলেজে থাকাকালীন, কিংবা ছাড়ার পর, কবিতা লেখেন সেটা প্রধানত নিজের চেষ্টার ফলে— স্কুল-কলেজের তালিম দেওয়ার ফলে নয়।

কিন্তু প্রশ্ন, সাহিত্য ভিন্ন অন্য বস্তুতে শিক্ষা দেবে কে?

* * *

কালই একজন খ্যাতনামা ভারতীয় ঐতিহাসিকের লেখা একখানা ভারতের ইতিহাস পড়ছিলুম। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত; কাজেই ভারতের প্রতি যুগের এই তিন বস্তু তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা কতখানি বিশ্বাস করা যায়, কোন মুদ্রা থেকে কতখানি ইতিহাস নিংড়ে বের করা যায়, পূর্বাচার্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কে কতখানি বিশ্বাস্য কতখানি অবিশ্বাস্য এসব তত্ত্ব তিনি সূক্ষ্ম চালনির ভিতর দিয়ে বারবার চালিয়ে নিয়ে খাঁটি মাল পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু প্রতি অধ্যায়ের পর যখন ওই যুগের শিল্পকলা নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন তিনি আর পূর্ববর্ণিত অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে আলোচনা ফাঁদেন না। তখন শুধু 'অ্যাজ্ ফার্গুসন সেজ' কিংবা 'একর্ডিং টু কানিঙহাম' অথবা 'কার স্টিফেন ইজ রাইট হুয়েন হি সেনটেনস্'। তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য নেই।

www.pathagar.com

আমি একথা বলব না, আমাদের ঐতিহাসিকের কোনওপ্রকার আপন রসবোধ নেই। সাহিত্যরস তাঁর দিব্য আছে, ভাস-কালিদাস সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতেই আলোচনা করেছেন; অর্থাৎ তিনি যৌবনের যে শিক্ষা ও রুচির তালিম পেয়েছিলেন তার বিকাশ করে উত্তম ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু চারুশিল্প বাবদে তিনি কখনও কোনও তালিম পাননি বলে ভারত-ইতিহাসের সেই সুবৃহৎ— হয়তো সর্বোত্তম— অধ্যায় তিনি লিখতে পারেননি।

তাই প্রশ্ন, চারুকলার ইতিহাস (হিস্ট্রি) পাব কবে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে আর্ট হিস্ট্রি পড়াবার সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর কয়েকটি ছেলেমেয়ে এ বিষয় অধ্যয়ন করে ডিগ্রি নেন— একটি মিশরি ছেলে সরকারি বৃত্তি পেয়ে এ বিষয়ে পড়তে কলকাতা এসেছে— এবং খুব সম্ভব পরে বেকার থাকে।

আমার মনে হয় আর্ট হিস্ট্রি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়ানো উচিত। লজিক, সংস্কৃতের ন্যায় যে কোনও ছেলে যেন বিষয়টি বেছে নিতে পারে। যারা এতে অনার্স নেবে তারা যেন 'জেনারেল আর্ট হিস্ট্রি'র কোনও বিশেষ অংশ— সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে গভীরতার চর্চা করে।

এইসব গ্রাজুয়েট পরবর্তীকালে স্কুল-শিক্ষকের কর্ম নিলে সেখানে অনায়াসে কলাচর্চার গোড়াপত্তন করতে পারবেন।

* * *

দিল্লি সম্মেলনে স্কুলের ড্রইংমাস্টারদের নিন্দে করা হয়েছে। জানি, সম্মেলন যা বলেছেন সেসব অতি খাঁটি কথা কিন্তু তবু আমার বেদনা বোধ হল।

ছেলেবেলায় যে দুটি ড্রইংমাস্টার আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন তাঁরা রাফায়েল-টিশিয়ান ছিলেন না; এমনকি আজ বুঝতে পারি, তাঁরা উত্তম ছবির আদর্শ বলতে রঙিন ফটোগ্রাফই বুঝতেন— তখনও অজন্তা-মুগল আমাদের ক্ষুদ্র মহকুমা শহরে এসে পৌঁছয়নি।

সেজান চিত্রকর, জোলা সাহিত্যিক। এঁর ছবি ওঁর চিন্তাধারাকে, ওঁর চিন্তাধারা এঁর ছবির ওপর প্রভাব বিস্তার করে অপূর্ব সৃষ্টির সহায়তা করেছিল।

আমার ড্রইংমাস্টাররা সংস্কৃত এবং ফারসির শিক্ষকদের মতো অবহেলিত, অনাদৃত ছিলেন।

এঁরা যদি কোনও কলা-ঐতিহাসিক শিক্ষকের দিগ্‌দর্শন পেতেন, তবে ভ্রান্তপথ বর্জন করে আমাদের ঐতিহ্যগত কলা-সৃষ্টির নির্মাণে নিজেকে অতি সহজে নিয়োজিত করতে পারতেন এবং তাতে করে এঁদের জীবন সার্থক হত।

সবাই অবহেলা করে এঁদের বলত 'পটুয়া'— এমনকি সহকর্মীগণও এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন এমনভাবে যেন এঁরা ব্রাত্য, অপাঙ্‌ক্তেয়— যোগাযোগের ফলে জাতে উঠেছেন। ডাঙায় নগণ্য মাইনে, জলে অবহেলা— শেষটায় একজন ঢাকার থিয়েটারের সিন এঁকে আর সব মাস্টারদের পয়সার দিক দিয়ে কানা করে দিলেন। কিন্তু আমি জানি, তিনি সুখী হননি। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন; নিজে সেকথা বলেছেন। আজ বুঝতে পারি, কেন তিনি সুখী হননি।

রঙিন ফটোগ্রাফ হোক কিংবা আর যাই হোক, যখন তিনি মাস্টার ছিলেন, তখন তার একটা আদর্শ ছিল, স্টেজের সিন আঁকতে সে আদর্শটি লোপ পেল— পেলেন তিনি টাকা।

* * *

www.pathagar.com

বহু বহু বৎসর পরে আমি বার্লিন শহরে কয়েক মাস বাস করেছিলুম। সেখানে কয়েকজন মেধাবী চিত্রকরের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। এঁদের একজন আমার ঘরে এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করছেন। তার ভিতর ছিল 'চয়নিকা'— ওই একখানা বই আমি সবসময়ই বিদেশে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, বিস্তর বই নিয়ে যাবার উপায় নেই বলে।

সে বইয়ের প্রথম সাদা পাতায় আঁকা ছিল আমার ড্রইংমাস্টারের আপন তুলিতে আঁকা 'সূর্যোদয়'।

আমার জার্মান আর্টিস্ট বন্ধু হতবুদ্ধি হয়ে সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'হোয়াট এ রটন্ পেন্টিং— বাট্ হোয়াট মাস্টারি অভার টেকনিক্!'

উনিশ

পূর্ব-পশ্চিমের বহু গুণী-জ্ঞানী দার্শনিক-পণ্ডিতজন দেহলি-প্রান্তে সমবেত হইয়া সপ্তাহাধিককাল 'মানবের মূল্য' ও 'শিক্ষা-দর্শন' সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনাকরতঃ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন— কেহ কেহ ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

চরম সত্য ভঙ্গের প্রাক্কালে সমবেত দার্শনিকমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারা এবং জীবনদর্শনে কোনওপ্রকারের দ্বন্দ্ব কিংবা অন্তর্নিহিত পার্থক্য নাই।

তৎসত্ত্বেও আমার মনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তত্ত্ব এস্থলে সবিশদ আলোচনা না করিয়া অন্য একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ব-পশ্চিমের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে সেকথা স্বীকার করিয়া লইলেও তো কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আমরা ইউনিটি বা ঐক্যের সন্ধান করিতেছি— সমতা বা ইউনিফর্মিটি আমাদের কাম্য নহে। বঙ্গবাসী পাঞ্জাববাসীর ন্যায় রুটি এবং মাংস না খাইলে কি উভয়ের ঐক্য অসম্ভব? বরঞ্চ বলিব, পাঞ্জাবি এবং বাঙালি উভয়েই আপন আপন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া আপন মনীষার নব নব বিকাশ নব নব উন্মেষণ করিয়া যদি বৃহত্তর ঐক্যে সম্মিলিত হয়, তবে সেই ঐক্যই হইবে সত্য ঐক্য।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য সেইরূপ যদি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সহযোগিতা করে, তাহাতেই তো বৃহত্তর মঙ্গল; বরঞ্চ বলিব, একে অন্যের অণুকরণ করিয়া করিয়া ক্ষুদ্র সমতার সন্ধান করিলে উভয়ই আপন আপন ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইয়া আড়ষ্ট এবং ক্লীব দর্শনের পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তি করিবে মাত্র।

* * *

জনৈক ফরাসিস দার্শনিক বলিলেন, 'প্রাচী বরঞ্চ প্রতীচী সম্বন্ধে বহু জ্ঞান ধারণ করে, কিন্তু প্রতীচী সেই অনুপাতে প্রাচীর অল্প পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে তাহার মনে হয়। কারণ যেসব ভারতীয় পণ্ডিত এই দার্শনিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের অনেকেই বহু বৎসর ইয়োরোপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে ওই মহাদেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকারের তত্ত্ব এবং তথ্য সঞ্চয় করিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, মাক্স ম্যুলার, য়াকোবি, লেভি, উইন্টারসিৎস, গেল্ডনার এবং পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

যুগে যেসব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষে বাস করিয়া বহু সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়া উত্তম উত্তম সংস্করণে প্রকাশ করিলেন; কানিংহাম, ফার্গুসন, স্টিফেন, হেভেল ভারতীয় কলা সম্বন্ধে যে প্রকারের গবেষণা করিলেন, সেই তুলনায় কয়জন প্রাচ্য দেশবাসী গ্রিক কিংবা লাতিন পুস্তকের চর্চা করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন? কয়জন ভারতীয় কিংবা চৈনিক বিদগ্ধ ব্যক্তি ইয়োরোপীয় কলার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন? ব্যোটলিঙ্ক-রোট্ যে বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতীয় গ্রিক অভিধান যখন ভারতে রচিত হইবে বুঝিব আমরা সত্যই প্রতীচ্য বৈদগ্ধ্যের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছি।

* * *

এই হেমন্ত শিশিরে দেহলি-প্রান্তে যেসব কলা প্রদর্শনী দেখিলাম, তাহার মধ্যে দুইজন চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অবনী সেন।

শ্রীযুত অবনী সেন গত সপ্তাহে তাঁহার বিগত কয়েক বৎসরের চিত্রকলা দেহলি-প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেইগুলি দেখিয়া বহু গুণী মুগ্ধ হইয়াছেন।

অবনী সেন সরল এবং অনাড়ম্বর চিত্রকার। তিনি জীবজন্তু, প্রকৃতি, পুরুষ-নারী দেখিয়াছেন অতিশয় সযত্নে এবং সেইগুলির প্রকাশ দিয়াছেন নিজস্ব সরল পদ্ধতিতে। সুদ্ধমাত্র মনোরঞ্জন করিবার জন্য কিংবা 'আর্টিস্টিক' হইবার জন্য তাঁহার চিত্রে কোনওপ্রকারের ছলনা নাই। দিল্লি নগরীতে এ বড় বিস্ময়কর বস্তু। সামান্য দুই-তিনটি প্রদর্শনী ব্যত্যয়রূপে বিচারাধীন না করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিয়াছি কেহ করিতেছেন মাতিসের নকল, কেহবা সেজানের, কেহবা ভানগগের। তবুও ঈষৎ সান্ত্বনা পাইতাম যদি ইঁহারা সত্যই পূর্বোল্লিখিত কৃতী পুরুষগণের অনুকরণ করিতেন। আমার মনে হয় ইঁহারা তাঁহাদিগের সত্য বৈশিষ্ট্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই, ইঁহারা অনুকরণ করিয়াছেন এইসব গুণীদের অবান্তর অংশগুলিকে। শুনিয়াছি শিলার নাকি ডেস্কে গলিত আপেল না রাখিলে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। দিল্লিতে প্রদর্শিত অধিকাংশ চিত্রকারের চিত্রে গলিত আপেলের দুর্গন্ধ পাইয়া সন্দেহ হইল ইঁহারা শিলারের অনুকরণ করিয়াছে— শিলারের প্রতিভার সন্ধান ইঁহারা পান নাই, কিংবা বলিব, অশ্বত্থামার ন্যায় পিষ্টতণ্ডুল দর্শনে উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছেন।

সাহিত্যে এই কর্ম অহরহ হইতেছে— তাহার সন্ধান সকলেই রাখেন, কিন্তু চিত্রে এই দুষ্কর্ম মর্মান্তিকরূপে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাই নিবেদন করিতেছিলাম, অবনী সেন কোনও গলিত আপেলের সন্ধানে কালক্ষয় করেন নাই। বিচিত্র পৃথিবীকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই দর্শন তাঁহার হৃদয়ের যে অনুভূতি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি তাহারই প্রকাশ দিয়াছেন কোনও প্রকারের ছলনা না করিয়া।

এই প্রশস্তিই যথেষ্ট।

* * *

www.pathagar.com

কলিকাতা মহানগরী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বৈদেশিকদের যেসব প্রতিমূর্তি আমাদিগের নগরে নগরে বিরাজ করিতেছে ইহাদিগকে লইয়া আমাদের কর্তব্য কী? এই প্রশ্ন দিল্লিতেও উপস্থিত হইয়াছে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলোকে কোনও যাদুঘরে রাখিয়া দেওয়াই প্রশস্ততম পন্থা।

কেহ বলিতেছেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের মূল্যবান তথ্য আহরণের সূত্র বিনষ্ট করা হইবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলি স্থানান্তর করিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইবে এবং যে বিরাট ভাণ্ডার ইহাদিগের জন্য নির্মাণ করিতে হইবে তাহার জন্য অর্থব্যয় এক গৌরী সেনেই সম্ভবে।

কেহ বলিতেছেন, এইগুলিকে ইংলন্ডে পাঠাইয়া দাও। ইঁহারা ইংলন্ডের 'কৃতী' সন্তান; স্ব স্ব নগরে ইঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় এবং প্রাতর্দর্শনীয় হইয়া বিরাজ করুন।

এই ইন্দোনেশিয়ান বান্ধব আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'আপনারা বৈদেশিকদের এই প্রতিমূর্তিগুলি সহ্য করিতেছেন কেন?'

আমি প্রশ্ন করিলাম, 'আপনারা ওলন্দাজ প্রতিমূর্তিগুলির কী ব্যবস্থা করিয়াছেন?'

মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, 'দণ্ডাধিককাল মধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছি।'

* * *

স্বীকার করি বৈদেশিকের প্রতি কিংবা তাহাদের প্রতিমূর্তির প্রতি আমার এইরূপ জাতক্রোধ সহজে উপজাত হয় না। ভিনাস কিম্বা মজেসের প্রতিমূর্তি দেখিয়া আনন্দ পাই, কোনওপ্রকারের ক্রোধ চিত্তকোণ স্পর্শ করে না।

কিন্তু এই প্রতিমূর্তিগুলি যে অত্যন্ত কুৎসিত। যত দিন পর্যন্ত এই প্রতিমূর্তিগুলি নগরে নগরে বিরাজমান থাকিবে ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ ভাস্করদের সুরুচি নির্মাণের পক্ষে ইহারা নিদারুণ অন্তরায়— 'ফিল্মি গানা' যেরূপ ইয়োরোপীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেরূপ ভারতীয় স্থপতির রুচি-বিকার ঘটাইতেছে। কিন্তু হায়, ফিল্মি গানা বন্ধ করিবার উপায় নাই, মেমোরিয়াল ধূলিসাৎ করিই-বা কী প্রকারে।

ঐতিহাসিকেরা যে এই প্রতিমূর্তিগুলি হইতে বহুতর গবেষণার উপাদান পাইবেন সেকথা অস্বীকার করি না, কিন্তু এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, ইহাদের জন্য ভাণ্ডার নির্মাণ করা অর্থের অতিশয় অন্যায় অপব্যয়।

* * *

ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন কি না সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, ইংলন্ডমাতা ইঁহাদিগকে আপন বক্ষে স্থান দিবেন কি?

কারণ একদা একখানা বিরাট ইংলন্ডীয় কামান— সেই কামান এই দেশে নাকি বহু শৌর্যবীর্য দেখাইয়াছিল— কোনও এক ইংরেজ মহাপ্রভুর উৎসাহে স্বনগরে প্রেরিত হয় এবং নগরের মধ্যবর্তী উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরবাসীগণ সেই বিকটদর্শন কামান দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সে চক্ষুশূলকে অপসারণ করিবার জন্য তারস্বরে চিৎকার করে। বহু প্রকারে তাহাদিগকে বলা হইল, এই ভুবনবিখ্যাত কামান ভারতের অমুক দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিতে সহায় হইয়াছে, অমুক নগরে শত শত ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই কামানের জন্মস্থল এই নগর, অতএব এই নগর ইহাকে সম্মান না করিলে ইহার উপযুক্ত সম্মান করিবে কে?

www.pathagar.com

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নাগরিকগণ দুর্যোধনের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দানে অনিচ্ছুক এবং কতিপয় পাষণ্ড বলিল, এই কামানের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই কামান কোথায় কোন অপকর্ম করিয়াছে তাহার লুপ্ত ইতিহাস জানিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে।

অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি এই প্রতিমূর্তিগুলিকে ইংলন্ডকে সহৃদয়তার সঙ্গে দান করি তবে তাহারা সেগুলি স্বব্যয়ে লইয়া তো যাইবেই না, পরন্তু করুণকণ্ঠে বারম্বার নিবেদন করিবে, 'আপনারা না মহাত্মাজির শিষ্য; আমাদিগের গত অপরাধের জন্য কি এই প্রকারের নৃশংস প্রতিহিংসা লইতে হয়?'

অতএব সেই শর্করায়ও মৃত্তিকা।

বিশ

যাঁরা ভালো করে পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা খাঁটি খবর দিতে পারবেন, আমি সামান্য যেটুকু পড়েছি, তার থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে মহাত্মাজির মতো মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মাননি।

বুদ্ধদেবকে কোনও ব্যাপক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়নি, খ্রিস্টের সামনে যে রাজনৈতিক সমস্যা এসে পড়েছিল (ইহুদিদের পরাধীনতা) তিনি তার সম্পূর্ণ সমাধান করেননি, শ্রীকৃষ্ণ এবং মুহম্মদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই চার মহাপুরুষকেই কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে স্বীকার করে নিয়ে জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস মহাত্মাজি যে বুদ্ধ এবং খ্রিস্টের অহিংস পন্থা নিয়ে যে রাজনৈতিক সফলতা লাভ করেছিলেন এ জিনিস পৃথিবীতে পূর্বে কখনও হয়নি। প্রেম দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে হিংসার ওপর জয়ী হওয়া যায় একথা পৃথিবী বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছিল কিন্তু অস্ত্রধারণ না করে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে জয়ী হওয়া যায় সেই অবিশ্বাস্য সত্য প্রমাণ করে গিয়েছেন মহাত্মাজি। আমার ভয় হয়, একদিন হয়তো পৃথিবী বিশ্বাস করতে রাজি হবে না যে মহাত্মাজির প্রেম ইংরেজের বর্বর সৈন্যবলকে পরাজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। অবিশ্বাসী মানুষ আজ স্বীকার করে না যিশু মৃতকে প্রাণ দিয়েছিলেন; পাঁচশ বছর পরের অবিশ্বাসী দুটোকেই হয়তো এক পর্যায়ে ফেলবে।

* * *

পাঠক হয়তো জিগ্যেস করবেন, মহাত্মাজি রাজনৈতিক ছিলেন; তিনি কোনও নবীন ধর্ম প্রচার করে যাননি। তবে কেন তাঁকে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তুলনা করি।

নবীন ধর্ম কেন সৃষ্টি হয় তার সবকটা কারণ বের করা শক্ত কিন্তু একটি জিনিস আমি লক্ষ করেছি। কি বুদ্ধ কি খ্রিস্ট সকলকেই তাঁদের আপন আপন যুগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করে নিতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পিথৌরার চর্চা বড়ই অগভীর—সেকথা পাঠককে আবার জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেবের সময় উত্তর ভারতবর্ষের বনবাদাড় প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে এবং ফলে আশ্রমবাসীগণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্ঘ নির্মাণ করে তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা বুদ্ধদেবকে

www.pathagar.com

করে দিতে হয়েছিল। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'— অর্থাৎ যৌথ পদ্ধতিতে বিরাট প্রতিষ্ঠান (সঙ্ঘ) নির্মাণ ভারতে এই প্রথম। দ্বিতীয়ত তখন প্রদেশে প্রদেশে এত মারামারি হানাহানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো করে প্রসার পাচ্ছিল না। শ্রমণগণ এসব উপেক্ষা করে শান্তির বাণী নিয়ে সর্বত্র গমনাগমন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অন্তরায় দূর হয়। তাই শ্রেষ্ঠীরা সবসময়ই সঙ্ঘের সাহায্যের জন্য অকাতরে অর্থ দিয়েছেন।

খ্রিস্ট ইহুদিদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পন্থা ছিল ইহুদিদের নৈতিকবলে এতখানি বলীয়ান করে দেওয়া, যাতে করে পরাধীনতার নাগপাশ নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে যায়— অরবিন্দ ঘোষও পণ্ডিচেরিতে এই মার্গেরই অনুসন্ধান করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু কুরুপাণ্ডবের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য কূটনৈতিক দূত তাই নন, শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডববাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন।

মুহম্মদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবের যুযুধান, ছিন্নবিছিন্ন বেদুইন উপজাতিগুলোকে এক করে শক্তিশালী জাতি গঠন করা।

মহাত্মাজিকে সবাই রাজনৈতিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু পৃথিবীর মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে নিলেই ঠিক হবে।

* * *

প্রশ্ন উঠতে পারে তাই যদি হয়, তবে মহাত্মাজি কোনও নবীন ধর্ম প্রবর্তন করে গেলেন না কেন?

সে তো খ্রিস্টও করে যাননি। খ্রিস্ট তিরোধানের বহু বৎসর পর পর্যন্তও তাঁর অনুচরগণ বুঝতে পারেননি যে তাঁরা এক নবীন ধর্মের প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। রামমোহন, নানকও দেখা দিয়েছেন ধর্মসংস্কারক রূপে— তাঁরা বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন— শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হল নবীন ধর্ম পরবর্তী যুগে।

মহাত্মাজির নবীন— অথচ সনাতন— ধর্ম প্রবর্তিত হতে সময় লাগবে।

সেই 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি!'

* * *

গল্প শুনেছি এক গুরু যখন বুঝতে পারলেন তাঁর এক নতুন শিষ্য একদম গবেট তখন তাকে উপদেশ দিলেন বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করতে। শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নিল।

বহু বৎসর পরে গুরু যাচ্ছিলেন ভিন গাঁ'র ভিতর দিয়ে। একটি আধাচেনা লোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে গুরুকে আপন বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই গবেট শিষ্য। গুরু তার যত্ন-পরিচর্যায় খুশি হয়ে শুধালেন, 'তা বাবাজি আজকাল কী কর?'

শিষ্য সবিনয়ে বলল, 'টোল খুলেছি।'

গুরুর মস্তকে এটম বোমাঘাত! খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে শুধালেন, 'তা কী পড়াও?'

শিষ্য বলল, 'আজ্ঞে সবকিছুই, তবে ব্যাকরণটা পড়াইনে।'

গুরু আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কী কথা? আমার যতদূর মনে পড়ছে তুমি তো ব্যাকরণটাই একটুখানি বুঝতে।'

শিষ্য বলল, 'আজ্ঞে, তাই এটা পড়াতে একটুখানি বাধো বাধো ঠেকে।

www.pathagar.com

* * *

রায় পিথৌরা যে সর্ববাবদে এই শিষ্যটির মতো সেকথা আর লুকিয়ে রেখে লাভ কী? এই দেখুন না, দিনের পর দিন সে সম্ভব অসম্ভব কত বিষয়ে কত 'তত্ত্ব কথাই' না বেহায়া বেশরমের মতো লিখে যাচ্ছে। কারণ? কারণ আর কী? সর্ববিষয়ে যার চৌকস অজ্ঞতা তার আর ভাবনা কী?

কিন্তু প্রশ্ন গবেট শিষ্য কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জানত বলে ওই বিষয়ে পড়াতে তার বাধো বাধো ঠেকত। পিথৌরার কি সেরকম কোনও কিছু আছে?

সেই তো বেদনা, সুশীল পাঠক, সেই তো ব্যথা।

মা সরস্বতী সম্বন্ধে কোনও কিছু লিখতে বড় বাধো বাধো ঠেকে। চতুর্দিকে গণ্ডা গণ্ডা সরস্বতী পুজো হয়ে গেল। আমি গা-ঢাকা দিয়ে, কিংবা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

আর কোনও দেবতার সেবা করার মতো সুবুদ্ধি আমার হয়নি— প্রথম জীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন আর আমি হতভাগ্য তাঁর সেবাটা কায়মনোবাক্যে করিনি বলে আজ আমার সবকিছু ভণ্ডুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। এখন মা সরস্বতীর দিকে মুখ তুলে তাকাতেও ভয় করে। হায়, দেবীর দয়া পিথৌরার প্রতি হয়েছিল, কিন্তু মূর্খ তাঁকে অবহেলা করে আজ এই নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে।

হায়, আমি যদি আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারতুম,

'নিতান্ত বালক যবে পুরাণের দেব-সভাস্থলে
চুপে চুপে দেখিয়াছি ইন্দ্র যম বরুণের গলে
মন্দারের মালা আর হস্তে নানা রতন সম্পদ—
বৈভব সৌন্দর্য কত। অপরূপ নর্ম লঘুপদ
উর্বশীর সম্মোহনী ইন্দ্রজাল নৃত্যচ্ছন্দময়
শুনেছি সুরের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি আর জয় জয়।
লক্ষ্মীর বৈভব হেরি নিষ্কম্প তরুণ আঁখি মম,
মহেন্দ্র-অঞ্চলার পশ্চাতে ফিরিছে ছায়াসম।
হে পিথৌরা, আজি আমি লজ্জা নাহি মানি,
মুগ্ধ মোরে করেছিল সর্বাধিক শ্বেত বীণাপাণি।
কী মন্ত্রে সে ভানুমতী বালকের চিত্তাসনখানি
জয় করে নিয়েছিল; মর্ম তার আজও নাহি জানি।'

ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের প্রধান দার্শনিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কত যে এবং কী অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তার সন্ধান বাঙলা দেশ আজ আর রাখে না। অথচ সমসাময়িক যুগে বাঙলার জ্ঞান দর্শনশাস্ত্র চর্চার ওপর তিনি যে গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছেন তা সে সময়ের যেকোনও লেখকের রচনা থেকে বোঝা যায়।

সেই দার্শনিককে এক ব্যক্তি বলেন, 'আপনার মতো পাণ্ডিত্য বাঙলা দেশের কারও নেই— একমাত্র আপনিই বাঙলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখতে সক্ষম।'

www.pathagar.com

দ্বিজেন্দ্রনাথ আপন পাণ্ডিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে একখানি চতুষ্পদী মন্দাক্রান্তায় লেখেন।

ইচ্ছা সম্যক জগ দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিকলি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা
না রহে কোনও জ্বালা
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না
শুধু ভস্মে ঘি ঢালা।

দ্বিজেন্দ্রনাথেরই যখন এই অবস্থা তখন আর আমাদের ভাবনা কী?

জয় মা বীণাপাণি!

একুশ

স্বরাজ পাওয়ার পর একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা কেউই লক্ষ করছেন না কারণ জিনিসটা চট করে চোখে পড়ে না।

স্বরাজ লাভের পূর্বে খুব কম বিদেশি ছেলেই ভারতে পড়াশোনা করতে আসত। পাঠক হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবেন, 'সেই তো স্বাভাবিক; আমাদের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা তার থেকে তো সুস্থ মানুষ দূরে থাকতেই চাইবে। এদেশে আবার পড়াশোনা করতে আসবে কে? টাকা থাকলে আমরাই আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশোনা করতে পাঠাই।'

কথাটা খুব ঠিক। বাঘা বাঘা যে সব ন্যাশনালিস্টরা 'ভারতীয় ঐতিহ্য' 'ভারতীয় কৃষ্টি'র জিগির গেয়ে সভাস্থল গরম করে তোলেন তাঁরা পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে বিদেশি ঐতিহ্যের স্কুল-কলেজে পড়াবার জন্য তাদের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ পাঠান।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদেশি ছেলেরা ভারতে পড়তে আসে। তার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পদ্ধতি যতই খারাপ হোক না কেন, আমাদেরই মতো কু-ব্যবস্থা মেলা প্রাচ্য দেশে এখনও মজুদ এবং আমাদের চেয়েও অধম ব্যবস্থা কোনও কোনও দেশে আছে।

* * *

মিশরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় এদেশেরই মতো। তাই মিশরের লোক যদি এদেশে কালেভদ্রে আসে, তবে খুব বেশি আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই মিশরীয়রা এদেশে আরবি পড়তে আসবে না— আমরা যেরকম সংস্কৃত পড়ার জন্য মক্কা কিংবা মদিনায় যাইনে। তাই যে মিশরি ছেলেটি এসেছে সে শিখতে চায় মোগল-চিত্রকলার ইতিহাস।

উপযুক্ত গুরুর হাতে পড়েছে; কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, ইতোমধ্যেই বেশ খানিকটা উন্নতি করতে পেরেছে।

* * *

আমার বিশ্বাস আমাদের চেয়েও অনুন্নত কিংবা আমাদের মতো দুর্ভাগা দেশের ছেলেরা প্রধানত আসবে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি শিখতে— কিছুদিন পূর্বে শুনতে পাই, ইরান

www.pathagar.com

থেকে নাকি কিছু ছেলে আসবে কৃষি-বিদ্যা শিখতে। এবং তার পর আসবে আমাদের চারুকলার নিদর্শন দেখতে এবং তার ইতিহাস শিখতে। সাহিত্য বা দর্শন শিখতে যে বেশি ছেলে আসবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ কারণ সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা ভারতের বাইরে প্রাচ্য দেশে নেই বললেও চলে, তাই তারা সে বাবদে প্রাথমিক উৎসাহ পাবে না এবং দর্শনের চর্চা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই কমে আসছে।

কিন্তু চারুকলা সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে কাইরো-আনকারায় যে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলোতে বিস্তর লোক এসেছিল এবং প্রেস সেগুলোর প্রচুর সুখ্যাতি করেছে। (কাইরোতে গত বৎসর ভারতীয় নর্তক-নর্তকীরা রাজার মতো সম্মান এবং রাজ-সম্মানও পেয়েছিলেন)।

শুধু তাই নয়, ওরাও আমাদের দেখাতে চায়। কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশি চারুকলা প্রদর্শনী দিল্লিতে হয়ে গেল সেকথা সকলেই জানেন। আর রুশকে যদি আধা-প্রাচ্য জাত বলা হয়, তবে রুশ কলা-প্রদর্শনীর কথাও স্মরণ করতে হয়।

এই যে মিশরি ছেলেটি এসেছে মোগল চিত্রকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাস শিখতে, এরপর আসবে আরও ছাত্র আমাদের প্রাচীনতর চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিখতে।

কিন্তু এসব পড়াবার ব্যবস্থা আমাদের কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে? এই যেসব ছেলেরা আসছে এবং আসবে তারা যখন দেখবে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোক আমাদের চারুকলার কোনও মর্মই বোঝে না, কোনও তত্ত্ব রাখে না তখন তারা ভাববেই-বা কী?

এদিকে নিমন্ত্রিতেরা এসে পড়েছেন ওদিকে রান্নার কোনওপ্রকার আয়োজন নেই। 'আরেক ছিলিম তামাক ইচ্ছে করুন'— অর্থাৎ টালবাহানা দিয়ে— আর কতক্ষণ এদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

* * *

এই সম্পর্কে পণ্ডিতবর আবু রয়হান মুহম্মদ বিন্ আহম্মদ অল বিরুনি'র নাম মনে পড়ল।

কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় তাঁর সহস্রতম জন্মোৎসব হয়ে গেল। ইরান-আফগানিস্তান আরও নানাদেশে এ উৎসব সমাধা হচ্ছে।

অল বিরুনি ছিলেন ফিরদৌসির মতো গজনীর মাহমুদের সভাপণ্ডিত। ফিরদৌসির নাম অনেক বাঙালি শুনেছেন— যখন বাঙলা দেশে ফারসি চর্চা ছিল তখন এক বাঙালি কবি ফিরদৌসি মাহমুদকে গালাগাল দিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তার অনুবাদ পর্যন্ত করেন :

রাজা যদি হইতেন রানির কুমার
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।

অল বিরুনি সম্বন্ধে এক বাঙালি লেখক লিখেছেন :

'মাহমুদের ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল বিরুনি'র কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল বিরুনি'র নাম করতে হয়। সংস্কৃতি-আরবি অভিধান-ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনও নেই), অল বিরুনি ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনও মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কী করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার,

www.pathagar.com

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকিক-ই-হিন্দ্' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

'একাদশ শতাব্দীতে অল-বিরুনি ভারতের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন— প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় আফগানিস্তান (ইরান) সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারাশিক্হ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবি ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি।'

এতে কিছুই বলা হল না।

ভালো করে বলবার জন্য যে জায়গা প্রয়োজন তা-ও এখানে নেই। তাই শুধু অলবিরুনি যেসব সংস্কৃত বই পড়ে তাঁর কেতাব লিখেছিলেন তার কয়েকটির নাম দেওয়া হল :

সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, আদিত্য পুরাণ,পুলিসসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্যক, উত্তর খণ্ডখাদ্যক, বৃহৎ সংহিতা সিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ জাতকং, লঘু জাতকং, করণসার, করণতিলক।

অনেকের মনে হতে পারে অল-বিরুনি হয়তো ক্রিশ্চান মিশনারিদের মতো হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দুধর্মকে নিন্দা করার জন্য তাঁর বই লিখেছিলেন। তাই তাঁর ভাষাতেই বলি।

'এ বই তর্কাতর্কির বই নয়। হিন্দুদের কাছ থেকে শুধু সেসব সিদ্ধান্তই আমি তুলিনি যেগুলো যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করা যায়। বরঞ্চ বলি, আমার পুস্তকখানিতে সুদ্ধমাত্র তাদের তত্ত্ব ও তথ্যের ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হল। হিন্দুদের বিশ্বাস ও চিন্তার আমি হুবহু বর্ণনা দেব এবং পরে গ্রিকদের বিশ্বাস ও চিন্তার উল্লেখ করে দেখাব এই দুই জাতের মধ্যে মিল রয়েছে।'

আশ্চর্য! ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে লোকটি গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনের মিল দেখতে পেয়েছিলেন।

* * *

রায় পিথৌরা ভয়ঙ্কর বেরসিক লোক আমি ঠিক বুঝে গিয়েছি। 'মিস কলকাতা' অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমানকে রায় পিথৌরা চেনে তার বিয়ের পর থেকেই অথচ তার মনে কখনও সন্দেহ জাগেনি যে এঁর সৌন্দর্য এমনই মারাত্মক রকমের যে ইনি একদিন সুন্দরীদের মধ্যে কুতুব মিনার হয়ে উঠবেন।

তবে হ্যাঁ, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই লক্ষ করতুম পথচারীরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। একদিন ইন্দ্রাণীকে বললুম, 'তোমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরুনো মুশকিল। সবাই কীরকম প্যাট প্যাট করে তাকায়। অস্বস্তি বোধ হয়।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'ছোঃ! আমার দিকে তাকাবে কেন? তাকাচ্ছে তোমার দিকে।'

!!! বলে কী! তবে হ্যাঁ, ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্যের পরই কলকাতায় সে যুগে দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল রায় পিথৌরার গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী টাক।

এর থেকে বোঝা গেল, ইন্দ্রাণীর বুদ্ধি আছে। ক্যাসা কায়দায় আপন বিনয় আর ভদ্রতা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু আমার বিশ্বাস ইন্দ্রাণীর রূপের চেয়ে গুণ অনেক বেশি।

ইন্দ্রাণী বহু পরিশ্রম আর অনেক সাধনা করে উত্তম ভরত নাট্য শিখেছে। আসছে বার নাচ দেখালে 'মিস্ কলকাতাকে' মিস করবেন না।

সেদিন এক অবাঙালি পিথৌরাকে ধাঁতিয়ে গেলেন। পিথৌরা নাকি বড্ড বেশি 'বাঙালি' 'বাঙালি' বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

www.pathagar.com

আরে বাপু, রায় পিথৌরা কে এমন কেষ্ট-বিষ্টু যে তার চিৎকারে কারও কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে?

একটা গল্প মনে পড়ল।

পূর্ব বাঙলার গয়না নৌকো ঘাটে ভিড়তেই ভাড়াটেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জায়গা দখল করে নিল। একটা চাষা ধরনের লোক কিছুতেই ঢুকতে না পেরে ছইয়ের বাইরে সেই হিমে বসে রইল।

জায়গা দখলপর্ব শেষ হতে ভিতরে আলাপচারি আরম্ভ হয়েছে।

'আপনার নাম?'

'আজ্ঞে, তারাপদ হালদার। আপনার?'

'আজ্ঞে কেষ্টবিহারী পাল।'

তৃতীয় ব্যক্তিকে, 'আর আপনার?'

'আজ্ঞে শশধরচন্দ্র গুণ।'

করে করে নৌকোর ভিতরকার সকলের চেনাশোনা শেষ হল। তখন এক মুরুব্বি বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন,— 'তোমার নামটা তো জানা হল না, বাবাজীবন।'

লোকটি অতিশয় সবিনয় বলল,— আজ্ঞে আমার নাম পাঁচকড়ি বৈঠা।'

'বৈঠা! এ আবার কী বিদঘুটে পদবি রে বাবা! বাপের জন্মে শুনিনি।'

লোকটি আবার বৈষ্ণবতর বিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনারা,— হালদার, পাল, গুণ সব নৌকোর ভিতরে বসে আছেন। নৌকো চালাবে কে? তাই আমি বৈঠা একা নৌকা চালাচ্ছি।'

বাঙালি কেষ্টবিষ্টুরা নৌকোর ভিতরে বসে আপন ধান্দায় মশগুল। তাই রায় পিথৌরা বৈঠা হরবকৎ চেল্লাচেল্লি করে।

বাইশ

পিথৌরাকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তিনি কেন মাঝে মাঝে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একই মাল পরিবেশন করেন।

উত্তরে নিবেদন, আগাগোড়া একই বস্তু পিথৌরা দুই কাগজে কখনও লেখেন না। তবে মাঝে মাঝে দু একটি বিষয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, তখন সেগুলো উভয় কাগজে উল্লেখ না করে থাকা যায় না।

এই ধরুন, কাল যদি ওখলায় বেড়াতে গিয়ে দেখি, যমুনার জল উজান বইছেন— পদাবলিতে এরকম অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বচক্ষে কখনও দেখিনি— আর 'আনন্দবাজার' 'হিন্দুস্থান' দুটোই পড়েন যে, এরকম একটা ঘটনা একদলকে বিলকুল জানাব না?

যাঁরা বাঙলায় রায় পিথৌরা পড়তে পারেন, তাঁরা যে কোন দুঃখে ইংরেজিতে পড়েন, তা-ও তো বুঝতে পারিনে। রস আর আড্ডা জমাবার জন্য ইংরেজি কি একটা ভাষা!

* * *

www.pathagar.com

এই ধরুন, গেল সপ্তায় এখানে যা হল সে অভূতপূর্ব।

রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চারজন একনিষ্ঠ সাধককে স্বহস্তে চারখানা শাল গলায় পরিয়ে দিলেন। দিল্লি শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ ইহুদি মেনুহিনও আনন্দের আতিশয্যে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলেন।

'রাষ্ট্রপতি ভবন' বলাতে ঘটনার পরিবেশ ঠিক ঠিক ওৎরালো না। যদি বলতুম, 'ভাইসরিগেল লজে' কাণ্ডটা ঘটল তা হলে পাঠক খানিকটা আমেজ করতে পারতেন। কারণ বড়লাট আদরকদর করতেন, তাঁরই জাতভাই সায়েব-সুবোদের কিংবা রাজা-রাজড়াদের।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র পরনে ছিল কুর্তা আর পাজামা— মাথায়ও কাপড়ের টুপি। এ বেশ পরে 'ভাইস'দের আমলে ওস্তাদজি নিশ্চয়ই সেখানে আমল পেতেন না, সম্মান পাওয়ার কথা দূরে থাকে— সে খেয়ালি পোলাও খেতে যাবেন না।

সাদাসিধে কাপড়-জামা-পরা ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেব যখন শান্ত মুখচ্ছবি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়ালেন, আর তিনি সহাস্যবদনে ওস্তাদের কাঁধে শাল রাখলেন, তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলি, 'সাধু, সাধু, সাধু!'

'সাধু, সাধু' বলার রেওয়াজ এখনও এদেশে ফের চালু হয়নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই। সভাস্থলে যা করতালি-ধ্বনি উঠল, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, দেশের লোক ভারি খুশি আমাদের অনাদৃত অবহেলিত গুণীরা যে রাজ-সম্মান পেলেন। রাষ্ট্রপতিকে আমি বহু জায়গায় বহু সার্টিফিকেট-সনদ দিতে দেখেছি, কিন্তু এই চারজন ওস্তাদকে সম্মান দেখাবার সময় তাঁর মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল, তার থেকে বোঝা গেল, তিনিও ওস্তাদদের সম্মান দেখাতে পেরে খুশি হয়েছেন। এবং সত্যই তো, শুধু যে ওস্তাদরা সম্মানিত হলেন তাই নয়, এঁদের সম্মান দেখিয়ে রাষ্ট্রও তো সম্মানিত হল।

* * *

আলাউদ্দিন সাহেব অতিশয় নিরভিমান ও ধর্মভীরু লোক। তিনি শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কি কোনও তোলপাড় চলছিল না? প্রথম যৌবনে যেদিন তিনি মা সরস্বতীকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেদিন কি তিনি আশা করতে পেরেছিলেন যে, এমন দিনও আসবে, যখন তিনি রাষ্ট্রপতির স্বহস্তে সম্মানিত হবেন? আজীবন তো তিনি দেখলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লাঞ্ছনা অবমাননা। বরঞ্চ তাঁর বাল্যকালে সে সঙ্গীতের অনেকখানি কদর ছিল, তার পর ষাট-সত্তর বৎসর ধরে তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখলেন, কত ওস্তাদ না খেয়ে মারা গেলেন, কত মেধাবী তরুণ উৎসাহের অভাবে আপন প্রতিভার বিকাশ করতে পারল না। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সর্বস্বান্ত হওয়ার নিদারুণ বেদনা অনেক সাংসারিক লোকই জানেন, কিন্তু এখানে তাঁর চোখের সামনে যা গেল, সে তো তাঁর আপন বিত্ত নয়— যুগ-যুগ সঞ্চিত তাবৎ দেশের সঞ্চিত সঙ্গীত-সম্পদ যে তাঁর চোখের সামনে ভেসে গেল।

না, তা তো নয়। আলাউদ্দীন সাহেবের আজ বড় আনন্দ, ভারতীয় সঙ্গীত আর লোপ পাবে না। রাষ্ট্রের, দেশের, দশের সকলেরই সস্নেহ দৃষ্টি পড়েছে ওস্তাদের ওপর, অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর।

* * *

www.pathagar.com

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খানও অতিশয় বিনয়ী লোক কিন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাণবন্তও বটেন। রাজ-সম্মান পেয়ে তাঁর মুখে দম্ভ ফুটে ওঠেনি, তিনি হলেন উল্লসিত এবং অভিভূত।

তাই তিনি যখন গান গাইতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর গলা দিয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর সে কী গলা— ওঠানো-নামানোর কায়দা! উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, আকাশ-পাতাল সবদিক থেকে তিনি যেন টেনে এনে নয়া নয়া ধ্বনি নয়া নয়া সুর আপন গলার ভিতর দিয়ে বের করতে লাগলেন। কখনও গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে— সে কণ্ঠ নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলুম— আর কখনও যেন নির্ঝরিণীর গতিবেগের মতো, কখনও আবার তাঁর গলা থেকে মারবেলের গুলির মতো গোল গোল তানের সারি পিল পিল করে বেরুতে লাগল।

আর কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! ঘন ঘন শাকরেদদের দিকে তাকান, ভাবখানা এই, 'পছন্দ হচ্ছে তো'? সমের সময় তবলচির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি, ইশারা মারেন, আদর দেখিয়ে তাম্বুলাওলার কাঁধে কাঁধ রেখে স্বর যাচাই করে নেন, আর মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে কানের ডগা ছুঁয়ে আপন অশরীরী ওস্তাদের সামনে যেন নিজের অপূর্ণতার জন্য ভিক্ষা করছেন।

বহু বাঘা ওস্তাদের মজলিসে শাকরেদদের বিবর্ণমুখে বসে থাকতে দেখেছি। মেহেরবান মুশ্‌তাকের সামনে তারা আনন্দে ফেটে পড়ার উপক্রম। গুরুর দিকে তারা তাকাচ্ছিল যেন শ্রীরাধা গোপীজনবল্লভের দিকে তাকাচ্ছেন।

ওস্তাদ মুশ্‌তাকের চেয়েও ভালো ওস্তাদের গান আমি শুনেছি, কিন্তু ওরকম প্রাণবন্ত, সচল রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিমা সঙ্গীত আমি পূর্বে কখনও শুনিনি।

* * *

দাক্ষিণাত্যের আইয়ার ও আয়াঙ্গারকে দেখেই মনে হল, এঁরা দু জনই অতিশয় ধর্মভীরু সজ্জন। দক্ষিণের ব্রাহ্মণবাড়িতে থাকার সুযোগ আমার জীবনে বহুবার হয়েছে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ গৃহদেবতার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

বিশ্বাস করবেন না, দক্ষিণের এক আইয়ার ব্রাহ্মণের বাড়িতে সঙ্গীতোৎসবের শেষে পাঁচটি (একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচটি) তামিল কন্যাকে আগাগোড়া 'জনগণমন অধিনায়ক' গাইতে শুনলুম। হাতে তাদের গানের বই ছিল না; তবু 'রাত্রি প্রভাতিল' শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তারা একবার মাত্র না থেমে গড় গড় করে গেয়ে গেল— অবশ্য দক্ষিণি কায়দায়।

শুধাই, এই বাঙলা দেশেরই ক'টি ছেলেমেয়ে তাবৎ 'জনগণমন অধিনায়ক' কণ্ঠস্থ বলতে পারে?

আসল কথায় ফিরে যাই।

দক্ষিণি গুরুরা দুই সম্মান পেলেন। রাজ-সম্মান এবং উত্তর ভারতের সম্মান। উত্তর ভারত দক্ষিণি গানের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, সেকথা আপনি-আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু গুরুদের পয়লা সা আর পয়লা পিড়িঙের সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ তামাম উত্তর ভারত বে-এক্তেয়ার। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সঙ্গীত-রসজ্ঞাকে আমি এখানে চিনি। দেখি, তাঁরা চোখ বন্ধ করে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

কণ্ঠে এবং যন্ত্রে যে এত গোপনবাণী লুকানো আছে, কে জানত? রায় পিথৌরা মূর্খ এবং অরসিক— সঙ্গীতের সে কিছুই বোঝে না, তাই সব জিনিসই তার ভালো লাগে। তাই যদি নিবেদন করি, দক্ষিণি সঙ্গীতের তত্ত্ব না বুঝেও যদি তার মর্মে সাড়া জেগে উঠে, তবে কি

www.pathagar.com

স্বীকার করবেন না গুরুদেবের সঙ্গীত পশুর প্রাণেও মানবতা জাগাতে পারে। কিন্তু রায় পিথৌরা চুলোয় যাক; দেখি, উত্তর ভারতীয় উন্নাসিকেরাও মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ ভারতের কৃতিত্বকে যেন উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করছেন।

উত্তর-দক্ষিণের এরকম মিলন আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

* * *

আলাউদ্দীন সাহেব আমার দ্যাশের লোক। ভেবেছিলুম তাঁকে কত কথা বলব। গলা ভেঙে গেল, কিছুই বলতে পারলুম না। রবীন্দ্রনাথের নাতনি নন্দিতাও সঙ্গে ছিল। ওস্তাদকে সেলাম করল। ওস্তাদ বললেন, 'মা, কত দিন পরে দেখা!'

ওস্তাদ মুশ্‌তাক হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু কাশ্মিরী পণ্ডিত হাকসার। আমি লখনওয়ি কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে তাঁকে তিনবার কুর্নিশ করলুম। ওস্তাদ সদয় হাসি হেসে (এবং সবিনয়ে) আমার কুর্নিশ নিলেন দেখে আমার আর সেদিন মাটিতে পা পড়েনি।

* * *

ততক্ষণে দক্ষিণি গুরুরা চলে গিয়েছেন।

তাঁদের প্রণাম করতে পারলুম না বলে মনে আক্ষেপ নেই। ভক্তি থাকলে অদৃশ্য প্রণামও যথাস্থানে পৌঁছয়।

* * *

নিরপেক্ষ পাঠক, এইবার বল তো 'হিন্দুস্থানে' এ-বয়ানে ইংরেজিতে লিখেছি বলে বাঙলায় যদি 'আনন্দবাজারে' না লিখতুম তা হলে তোমার প্রতি অবিচার করা হত না?

তেইশ

খবর এসেছে নাগপুরে জাপানি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতি উত্তম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষ আজব দেশ। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মতো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা নেই— ওদিকে এদের তুলনায় ক্ষুদ্র নাগপুরে জাপানি পড়াবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি আজ যদি আপনি উত্তম চীনা ভাষা শিখতে চান তবে আপনাকে যেতে হয় শান্তিনিকেতন নয়, পুণায়। অন্য জায়গায় বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত নেই।

(এই দিল্লি শহরে বহুভাষা শেখাবার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।)

নাগপুরে পুণায় জাপানি চীনা শেখাবার বন্দোবস্ত, অথচ বড় বড় শহরে নেই। এ যেন সেই মাকড় সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের ধাঁধা, কোথায় জাল আর কোথায় জেলে—?

আট পা আঠারো হাটু,
জাল ফালাইতা গেল ঘাটু।
শুকনায় ফালাইয়া জাল
মাছে উঠি দিলা ফাল !

— কোথায় ভাষা শেখার ব্যবস্থা, আর কোথায় ভাষা-শিখনেওলা!

www.pathagar.com

* * *

ওদিকে আজ্জম পাশা বলছেন ভারত এবং আরব মুল্লুক এক হয়ে প্রাচ্যের প্রধান শক্তি তৈরি হবে, এদিকে আমরা ভারতবর্ষে বলছি, আলবৎ, আমরা জগৎকে জীবননীতির তৃতীয় পন্থা বাতলাব ইত্যাদি কতই না বাক্যাড়ম্বর।

যেসব ঐক্যের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা না শিখে কী করে বাস্তবে পরিণত হবে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন?

লন্ডনে প্রাচ্য এবং আফ্রিকার নানা ভাষা শেখার জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে— প্যারিসেও তাই। জর্মনির ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়েও বহুতর ভাষা শেখা যায় (এক সংস্কৃতের জন্যই জর্মনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন— সংস্কৃত শিখত মাত্র একটি ছেলে ও তা-ও এডিশনাল হিসেবে), ইটালিতে প্রাচ্য ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা বহু দিনের অথচ এই বিরাট ভূমি ভারতে যেটুকু ব্যবস্থা আর সেকথা নিজেদের ভিতর তুলতেও লজ্জা বোধ করে।

শুনেছি, আমাদের ফরেন আপিসের একদা তিন-চারশ লোকের প্রয়োজন হয়েছিল এবং ভাষা জাননেওলা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া গিয়েছিল মাত্র আট না দশজন!

তবুও ভাষা শেখাবার কোনও ব্যাপক ব্যবস্থা কোথাও হচ্ছে না।

মাদ্রাসাগুলো মরে যাচ্ছে— আরবি-ফারসির চর্চা কমে আসছে।

আর সংস্কৃত তো 'ডেড ল্যানগুইজ'। তাই টোলগুলো মরুক— আপত্তি নেই!!

কী দেশ!

* * *

দিল্লির বিখ্যাত সাধু নিজামউদ্দিন আওলিয়ার প্রখ্যাত সখা এবং শিষ্য কবি আমির খুসরৌর জন্মোৎসব কয়েক দিন হল আরম্ভ হয়েছে। আমির খুসরৌর কবর নিজামউদ্দিনের দরগার ভিতরেই— এবং সে দরগা হুমায়ুনের কবরের ঠিক সামনেই। (এ দর্গায় আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কবর আছে।)

খুসরৌর পিতা ইরানের বল্‌খ্‌ (সংস্কৃত বল্‌হিকম— ভারতীয় কোনও কোনও নৃপতি বল্‌খ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে) থেকে ভারতবর্ষে আসেন। পুত্র খুসরৌ কবিরূপে দিল্লির বাদশাহদের কাছে প্রচুর সম্মান পান।

ফারসি তখন বহু দেশের রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতবর্ষ (ফারসি এদেশের ভাষা নয়) আফগানিস্তান (সে দেশেরও দেশজ ভাষা পুশতু) তুর্কিস্থান (তারও ভাষা চুগতাই) এবং খাস ইরানে তখন ফারসির জয়-জয়কার। এমনকি বাঙলা দেশের এক স্বাধীন নৃপতি কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

খুসরৌ ফারসিতে অত্যুত্তম কাব্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ভারতের বাইরে বিশেষ করে কাবুল-কান্দাহার এবং সমরকন্দ-বোখারা খুসরৌকে এখনও মাথার মণি করে রেখেছে।

আলাউদ্দিন খিলজি, তাঁর ছেলে খিজর খান, বাদশা গিয়াসউদ্দিন তুগলুক, তাঁর ছেলে বাদশা মুহম্মদ তুগলুক (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের 'পাগলা রাজা')। এঁরা সবাই খুসরৌকে খিলাত-ইনাম দিয়ে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছেন।

গুজরাতের রাজা কর্ণের মেয়ে যখন দিল্লি এলেন তখন তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার খিজর খান তাঁকে বিয়ে করেন। ইংরেজের মুখে শুনেছি, বিয়ে নাকি প্রেমের গোরস্তান, অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার পরই নাকি সর্বপ্রকারের রোমানস্‌ হাওয়া হয়ে যায়। এখানে হল ঠিক তার

www.pathagar.com

উল্টো। এঁদের ভিতর যে প্রেম হল সে প্রেম পাঠান-মোগল হারেমের গতানুগতিক বস্তু নয়— তাই অনুপ্রাণিত হয়ে খুসরৌ তাঁদের প্রেমকাহিনী কাব্যে অজর অমর করে দিলেন। সেই কাব্যের নাম 'ইশকিয়া'— বাঙলা ভ্রমণের সময় সম্রাট আকবর সেই কাব্য শুনে বারম্বার প্রশংসা করেছিলেন। কর্ণের মেয়ের নাম দেবলা দেবী। শুনেছি, বাঙলায় নাকি 'দেবলা দেবী' নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে।

গিয়াসউদ্দিন তুগলুক নিজামউদ্দিনকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। সে কাহিনী 'দৃষ্টিপাতে' সালঙ্কার বর্ণিত হয়েছে— 'দিল্লি দূর অস্ত!' কিন্তু গিয়াস নিজামের মিত্র খুসরৌকে রাজসম্মান দিয়েছিলেন। খুসরৌ বড় বিপদে পড়েছিলেন— একদিকে সখার ওপর বাদশাহি জুলুম, অন্যদিকে তিনি পাচ্ছেন রাজসম্মান।

মুহম্মদ তুগলুক রাজা হওয়ার পর তাবৎ মুশকিল আসান হয়ে গেল। ঠিক মনে নেই (পোড়ার শহর দিল্লি— একখানা বই পাইনে যে অর্ধবিস্মৃত সামান্য জ্ঞানটুকু ঝালিয়ে নেব), বোধ হয় খুসরৌ বাদশা মুহম্মদের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

সে এক অপূর্ব যুগ গেছে। সাধক নিজামউদ্দিন, সুপণ্ডিত বাদশা মুহম্মদ তুগলুক, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী এবং সভাকবি আমির খুসরৌ।

প্রথম দেহত্যাগ করলেন শেখ-উল-মশাইখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া, তার পর তাঁর প্রিয়সখা আমির খুসরৌ, তার পর বাদশা মুহম্মদ শাহ তুগলুক এবং সর্বশেষে জিয়া বরণী।

ইংরেজ আমাদের কত ভুল শিখিয়েছে। তার-ই একটা— এসব গুণীরা ফারসিতে লিখতেন বলে এঁরা এদেশকে ভালোবাসতেন না। বটে? সরোজিনী নাইডু ইংরেজিতে লিখতেন, তাই তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন না!

খুসরৌ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন এবং সে ভূমির অশেষ গুণকীর্তন করে গিয়েছেন।

এবং দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি যেটুকু দেশজ হিন্দি জানতেন (হিন্দিরও তখন শৈশবাবস্থা) তাই দিয়ে হিন্দিতে কবিতা লিখে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ফারসি এবং হিন্দি মিলিয়ে তিনি উর্দুর গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন— জানতেন একদিন সে ভাষা রূপ নেবেই নেবে।

আবার বিপদে পড়লুম; হাতের কাছে বই নেই তাই চেক-আপ করতে পারছিনে— পণ্ডিত পাঠক অপরাধ নেবেন না— যেটুকু মনে আছে নিবেদন করছি—

'হিন্দু বাচ্চেরা ব নিগর্ আজব হুসন্ ধরত হৈ
দর্ ওক্‌তে সুখ্‌ন্ জদন মুহ ফুল ঝরত হৈ
গুফ্‌তম "কে বি আর আজ লবেৎ বোসে বিগরিম—"
গুফ্‌ৎ "আরে রাম! ধরম নষ্ট করত হৈ"!'

*

হিন্দু বাচ্চা কী অপূর্ব সৌন্দর্যই না ধারণ করে,
কথা বলার সময় মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে।
বললুম, 'আয়, তোর ঠোঁটে চুমো খাব—'
বললে, 'আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হৈ!'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত পত্রাবলি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

শান্তিনিকেতন,
২০।১।৬০

স্নেহের দীপংকর,

আমার আশ্চর্য বোধ হয়, রাজশেখরবাবু যে বাড়িতে আছেন, একদিন যে বাড়ির গদিতে তুমি বসবে, অর্থাৎ তিনি যে বেঞ্চিটায় বসেন সেটাতে বসে তুমি তাঁরই মতো অতিথি অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করবে— তখন অন্য লোকের অটোগ্রাফ সঞ্চয় করার তোমার কী প্রয়োজন? ফার্সিতে বলে 'এক বাচ্চা-ই-বাবুর বস্ অস্ত' (এর সবকটা শব্দই তোমার জানা থাকার কথা : বাবুর = সিংহ; বস্ = ব্যস = যথেষ্ট; অস্ত্ = সংস্কৃত অস্তি) 'সিংহের একটি বাচ্চাই যথেষ্ট', কুক্করীর মতো সে লিটার প্রসব করে না। আমাদের গুরুদেবও মধুরতর করে বলেছেন, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many!' (কবি হাইনে আরেক কদম এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'এবং সিংহশিশু যখন কুকুরের চেয়েও ছোট থাকে তখনও তার ক্ষুদ্র আঁচড় থেকে বোঝা যায় ওটা সিংহের আঁচড়!' এক বুড়ো রাবিশ কবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গ্যোটের ছেলেবেলার কবিতা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় এটা সিংহ-শিশুর আঁচড়, অমুকের বৃদ্ধ বয়সের কবিতা থেকেও বোঝা যায় ওটা ইঁদুরের আঁচড়।')

তাই রাজশেখরবাবুকে একখানা ডাইরি দিয়ে বলো, তাঁর মনে যখন যা কিছু আসে সেইটে যেন তোমার জন্য লিখে রাখেন। তুমি বড় হয়ে প্রতিদিন তারই মাত্র একটি করে পড়বে, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে।

আর শশিশেখরবাবুর* লেখা পড়ে আমার নিজের লেখার প্রতি ঘৃণা ধরে। এ লোকটা অত দেরিতে কলম না ধরে যদি যৌবনে আরম্ভ করতেন তবে আর সবাইকে কানা করে দিতেন। শুনেছি ওঁর পিতাও নাকি একটি খাণ্ডার ছিলেন। আমি যেদিন প্রথম রাজশেখরবাবুর নাম শুনি তখনই সন্দেহ করেছিলুম যে নামদাতা পণ্ডিত এবং রসিক লোক। তবু ভাবলুম, এটা হয়তো accident. তার পর যখন অন্যান্য ভাইদের নাম শুনলাম তখন আর মনে কোনও দ্বিধা রইল না।

---

* শশিশেখর : শশিশেখর বসু। রাজশেখর বসুর অগ্রজ। ইনি পরিণত বয়সে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সরস ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর সবরকম লেখা অত্যন্ত উপভোগ্য ও পাঠকসমাজে আদৃত হয়। তাঁর 'যা দেখেছি যা শুনেছি' গ্রন্থখানি বিপুল সমাদর লাভ করে।

www.pathagar.com

আজ এখানেই শেষ করি। তুমি যখন বেআইনিভাবে রাজশেখরবাবুকে লেখা আমার চিঠি পড়েছ, তখন, সাধু সাবধান, খেয়াল রেখো, তিনি যেন বেআইনিভাবে তোমাকে লেখা আমার চিঠি না পড়েন।

শিগগিরই কলকাতাতে টেস্‌ট্‌ আরম্ভ হবে। তার প্রস্তুতির জন্য তোমাকে একটি কবিতা বেতারের ভাষায় 'স্বরচিত কবিতা') পাঠালুম। গত মার্চ মাসে ঢাকায় দেখি আমার এক ভগ্নী (এম.এ. পড়ে বাঙলায়, তবে 'রাতারাতির' চিংড়ির মতো চটপটে নয়, লেখক মনোজবাবুর সঙ্গে তার দোস্তি) ঘড়ি ঘড়ি রেডিয়ো খুলে West Indies vs Pakistan খেলার স্কোর শুনছে। অথচ ক্রিকেটের ক অক্ষর তার কাছে গোমাংস কিংবা শূয়রের। তাকে এই কবিতাটি দিয়েছিলুম। ঢাকাতে লেখা বলে আরবি-ফার্সি শব্দের প্যাঁজ-ফোড়নটা কিঞ্চিৎ ঝাঁঝালো।!

আশীর্বাদক
সৈয়দ মু. আলী

২

শান্তিনিকেতন
১৫। ৩। ৬০

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার তাবৎ লিখনই পেয়েছি। উত্তর কেন দিতে পারিনি সেটা বলতে গেলে আসল মহাভারত না হোক, রাজশেখরীয় মহাভারত নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবে। উর্দুতে বলে,

'মুসিবৎ কা অহওয়াল্‌ হর এক্‌ এক্‌ সে কহ না—
মুসিবৎ সে হৈ য়হ্‌ মুসিবৎ জ্যাদহ্‌!'

'বিপদের কাহিনী প্রত্যেককে বয়ান করে বলার হ্যাপা আসল বিপদের চেয়েও বড় বিপদ।'

তোমার দাদুকে একটু বাজিয়ে নিয়ো তো, আমি তাঁকে একখানা বই উৎসর্গ করতে চাই। তাঁর অনুমতি আছে কি না? টাপে-টোপে ঠারে-ঠোরে শুধিয়ো। বেশ খুশিমনে যখন থাকেন। তোমাকে বলছি, বইখানা আমার সমজদার বন্ধুদের প্রশংসা পেয়েছে বলেই এ প্রগল্‌ভতা করছি।

রবীন্দ্রকাব্যের নতুন নতুন অর্থ শুধু নয়, এমন সব কঠিন প্যাসেজও আমি মোলায়েম করতে পারি যা অন্যে পারে না। আমি একটা দিগ্‌গজ নই— পারি অন্য কারণে। সেটা দেখা হলে বাতলে দেব।

ইতিমধ্যে এটার মানে কী বলো তো!

ওরে, এতক্ষণে বুঝি/তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি/গেছে সাত ভাই চম্পা। যাত্রা, "পূরবী", রচনাবলী ১৪ খণ্ড, পৃ-১৯। এখানে সবাই কাৎ।

পূর্বেই বলেছি, আমি মেলা 'মুসিবতে' আছি। আশীর্বাদ জেনো—

সৈয়দ মু. আলী

www.pathagar.com

৩

শান্তিনিকেতন,
১৯।৩।৬০

স্নেহাস্পদেষু,

আমি যখন লন্ডনে ছিলুম তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও সেখানে ছিলেন। আমাকে শুধিয়েও ছিলেন, আমার কোনও-কিছু করে দেবেন কি না। বললেই তিনি খুশি হয়ে বার্ট্রান্ড রাস্‌ল্ বার্নার্ড শ'র নামে আমাকে চিঠি দিতেন। আমি চাইনি।

হিটলার শক্তিতে আসার পূর্বে তার দলের দু একজন আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিল। হিটলার যখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির মগডালে তখন তারা চেপে ধরেছিল আমাকে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল, 'ফ্যুরারের মেলা গুণ আছে কিন্তু ভাষা বাবদে তুই জর্মন ভাষাতে যা জমাবি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যাইনি। আমি কোনও কালেই হিটলার-ভক্ত ছিলুম না।

তোমার দাদুকে কিন্তু দেখবার বাসনা আমার ছিল কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি বলে বাসনাটা ধামাচাপা দিয়ে তার উপর শিল-চাপা দিয়েছিলুম। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু বললেন, 'ওহে, রাজশেখরবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ফোন করে শুধালুম, কখন এলে দর্শন পাব।

আমার বিশ্বাস তোমার দাদু পূর্বোক্ত কোনও ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি। আমার বন্ধু আমার মনের গতি জানতে পেরে ধাপ্পা মেরে আমার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

সেদিন যতীনবাবুও তাঁর ঝোলা নিয়ে বসেছিলেন। আমি দু জনারই ন্যাটাই ভক্ত অর্থাৎ এঁদের কোনও দোষ-ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না।

আমি এমনই nervous হয়ে গিয়েছিলুম যে, সেটা ঢাকবার জন্য আপন অজানাতে জাত-ইডিয়েটের মতো বক্‌বক্ করতে আরম্ভ করেছিলুম এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝতে পারছিলুম, ভারি অন্যায় হচ্ছে, বড্ড বাচালতা হচ্ছে, বেহদ্দ পাগলামি হচ্ছে,— অথচ কিছুতেই থামতে পারছিলুম না।

হয় তোমার দাদু পয়লা নম্বরের অভিনেতা, নয় তিনি অতিশয় সহৃদয়, সহিষ্ণু শ্রীকণ্ঠবাবু। বেশ হাসিমুখে আমার বকবক শুনেছিলেন, এমনকি বললে বিশ্বাস করবে না, ভাই, আমার মনে হচ্ছিল আমার বকবকানিটা তাঁর অপছন্দ হচ্ছে না। যতীনবাবুকে আমি অতটা ডরাইনি। সেটা অবশ্য তাঁরই প্রশ্ন শুধোবার সহৃদয়তা থেকে।

তার মানে তোমার দাদু একটা কিছু কট্টর হাম-বড়া লোক? আদপেই না। কিন্তু আমার এটা অহেতুক ভয়। তাঁর কাছে তো আমি কিছুই গোপন রাখতে পারব না। তিনি ধরে ফেলবেন আমার দম্ভ, আমার আত্মস্তুতি প্রচেষ্টা, আরও সাতান্ন রকমের মানসিক এবং চরিত্রগত দুর্বলতা এবং ব্যাধি আমার যা আছে। আমি জানি তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল— একমাত্র ভণ্ডামি জিনিসটা তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। শুধু ধর্মরত ভণ্ড বিরিঞ্চি বাবা নয়, মোলায়েমির ভণ্ড পেলব রায় দোদুল দে গয়রহ বিস্তরে বিস্তর— এমনকি গণ্ডেরীর খোলাখুলি জোচ্চুরি তিনি প্রশংসার চোখেই দেখছেন, হয়তো ভাবছেন বুদ্দু বাঙালি ব্যবসায়ী এর কিছুটা পেলে বর্তে যেত।

www.pathagar.com

আমি ভণ্ড নই। বড়ফাট্টাই করার লোভ একেবারে কখনও হয় না, সে-কথা বলব না। কিন্তু সেটা রসিয়ে বলতে পারি বলে কেউ বড় গায়ে মাখে না। পাছে অপরিচিত লোক misunderstand করে তাই আমি কারও সঙ্গে দেখা করিনে, পারতপক্ষে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দিই না, মিটিঙে পার্টি-পরবে যাই না অতিশয় নিতান্ত unavoidable না হলে। কাউকে বলো না, বাজারে রটিয়েছি, আমার 'আন্‌জিনা থ্রমবসিস' (দুটো হার্ট ট্রাবলকে মিক্‌স্ করে এই ঘ্যাঁটটি তৈরি করেছি), ডাক্তারের সখৎ মানা ভিড়ে মেশা। তৎসত্ত্বেও শুনে আনন্দিত হবে— অন্তত আমি তো বটি— বাজারে আমার ভয়ঙ্কর দুর্নাম, আমি দম্ভী, বদরাগী ইত্যাদি, তাই কারুর সঙ্গে মিশিনে। যখনই খবর পাই, অমুক এসব রটাচ্ছে, অমনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানাই, সে আমার উপকার করছে বলে (অর্থাৎ এই বদনাম শুনে visitor-রা আমাকে জ্বালাতন করবে না বলে) এবং আমার বইয়ের এক খণ্ড তাকে present করি!

ঠিক তেমনি যারা আপনজন তাদের সঙ্গ পেলে আমার সব দুঃখ উপশম হয়। আমার দাদাদের সঙ্গে আমি দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটাতে পারি। আমার মেজদা অনেকটা তোমার দাদুর মতো। আমি বক্‌বক্ করলে শুধু যে শোনেন তাই নয়, চোখ দিয়ে উৎসাহও দেন।

যতীনবাবুকে* আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ো।

আমি কলকাতায় আসি অতিশয় কালে-কস্মিনে। আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি সত্যই অত্যন্ত কুনো লোক। যেটুকু ভ্রমণ করেছি সেটা নিতান্ত বিপদে পড়ে, গরজের ঠেলায়। কাবুল গিয়েছিলুম সহজে টাকা রোজগার করে সেই টাকা দিয়ে জর্মনি গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। ঠিক সেই কারণেই মিশর, প্যারিস, লন্ডন যাই— অর্থাৎ পড়াশোনা research করার জন্য। একবার মাত্র স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করেছি। ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলামের সঙ্গমভূমি প্যালেস্টাইন গিয়েছিলুম অতিশয় স্বেচ্ছায়— মিশরে যখন ছিলুম। আমার ছোট বোনেরা বলে, 'ছোড়দার longest walk হচ্ছে তার deck Chair (আমি ডেকচেয়ারে পড়াশোনা করি) থেকে বাথরুম অবধি। ব্যবস্থা থাকলে সেখানেও taxi নিতেন।' কলকাতায় এলে তোমার দাদুকে দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিরক্ত করতে বড্ড ভয় পাই। তবে এবারে ঠিক ঠিক আসব। আমি অন্তত ছটা কই মাছ খাব। দাদু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে। তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ দেবার কথা। তৎসত্ত্বে যদি বাজারে কই না পাওয়া যায় তবে চিংড়ি, season হলে তোপসে। দেখ দিকিনি, কী রকম expensive taste — বাঙালের ঘোড়া রোগ। আমাদের এখানে এর একটাও পাওয়া যায় না।

তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথ, =milky way, আর সাত ভাই চম্পা হল কৃত্তিকা নক্ষত্রের খাঁটি বাংলা নাম। ইংরেজিতে (আসলে গ্রিক) Pleiad অর্থাৎ milky way-এর পিছনে পিছনে পথের খোঁজে খোঁজে যেতে যেতে কৃত্তিকাও অস্ত গেছে। শরৎকালের প্রতি রাত্রেই হয়— বেশ কিছুদিন ধরে। আর milky way-কে 'তারা নির্ঝর' বলে রবিবাবু তাঁর physics এবং astronomy জ্ঞান দেখিয়েছেনও বটে। শুনেছি সৃষ্টির আদিতে নাকি বিস্তর তারা ঠিকরে পড়ে 'ছায়াপথ' milky way সৃষ্টি করেছে। আসলে কিন্তু সক্কলেরই Waterloo ওই 'সাত ভাই চম্পা'। ওটা

* যতীন্দ্রনাথবাবু— শিল্পী যতীনকুমার সেন। রাজশেখর বসুর দীর্ঘকালের বন্ধু ও নিয়মিত সঙ্গী।

www.pathagar.com

যে কৃত্তিকা সেটা হরিবাবুর অভিধানে আছে। আমার যে গুরুর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি তিনি ছিলেন আইরিশম্যান, নাম (ঈশ্বর) মার্ক কলিন্‌স্‌। বিশ্বাস করবে না, আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি যে, কোনও একটা text-এর সামনে এসে বললেন, 'এ ভাষা আমি জানিনে।' তা সে chinese-ই হোক, আর ওঁরাওঁ-ই হোক। আমাকে ইংরেজি ফরাসি জর্মন পড়াতেন। আর ইংরেজি শব্দতত্ত্ব শেখাবার সময় দুনিয়ার কুল্লে ভাষার সঙ্গে (কারণ 'ইংরেজি' দুনিয়ার কোন্ ভাষা থেকে শব্দ নেয়নি বলতে পারব না) পরিচয় করিয়ে দিতেন। একদিন রাত্রের অন্ধকারে মাঠে দাঁড়িয়ে কন্‌সটেলেশন চিনছি এমন সময় তিনি পিছন থেকে আমার পরীক্ষা নিতে নিতে কৃত্তিকার খাঁটি বাংলা নাম শেখালেন। সে প্রায় ৪০ বছর হল। তখন ওর ফার্সি নাম পরওয়িজও শিখিয়েছিলেন। Omar Khoyyam-এর যে ইংরেজি অনুবাদ (Fitzgerald করেছেন তাতে parwiz শব্দটি আছে। সেটি "The vine has struck a fibre" দিয়ে আরম্ভ। পার্সিদের মধ্যে এ নামে এখনও নামকরণ হয়। এই কলিনসের মতো মহাপণ্ডিত পূর্ব-পশ্চিম কোথাও আমি পাইনি। অথচ কেউই তাঁকে চেনে না। কারণ যৌবনে লিখেছিলেন ডক্টরেট থিসিস, এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাপে একখানা চটি প্যামফলেট— ব্যস্। এবং দ্বিতীয়খানা পড়ে কেউই বুঝল না, ওটা সাপ না ব্যাঙ। নাম ছিল On the Octoval System of Reckoning In India, প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে প্রাক-আর্য দ্রাবিড়রা, আর্যদের মতো decimal system অর্থাৎ দশের স্কেলে গণনা করত না— তাদের scale ছিল আটের। ৮ x ৮ = চৌষট্টিতে তাদের শ'— তাই চৌষট্টি যোগিনী ইত্যাদি (এর বাইপ্রডাক্ট— দুর্গা আর চৌষট্টি যোগিনী অনার্যা— অবশ্য এটা মূল বক্তব্য নয়)। এই গোনার স্কেল যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, এবং duodecimal-টাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ১২-র স্কেল— এটা না জানা থাকলে তোমার দাদুকে জিগ্যেস করে নিয়ো। আমি এসব জানি অতি অল্পই। দেখা হলে কলিন্‌সের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তাঁর পাণ্ডিত্য যে কী অতল অগাধ ছিল সেইটে সালঙ্কার শোনাব।

এবারে বল তো বৎস, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের— 'অন্তর মন বিকশিত করো'-তে নন্দিত করো, নন্দিত করো হে কোত্থেকে লোপাট 'চুরি' করেছেন? (উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় উল্টো করে লেখা)।

'ধর্মশিক্ষা' এখনও পাইনি। নিশ্চয়ই পড়ব। 'ধার্মিকরা চটুন, কোনও আপত্তি নেই। আর আমরাও 'মহেশ' বা 'হরিনাথ' নই। আর তোমরা তো কায়স্থ। তোমাদের মহা সুবিধে— কোনও 'ধর্মকর্ম' করার আদেশ তোমাদের ওপর নেই। কিঞ্চিৎ আতপ চাল আর দুটো কাঁচকলা বামুনকে ডেকে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। হিন্দুধর্ম বড় Specialist-দের ধর্ম। বামুনরা Specialist— (যে রকম ধর Cancer-এর স্পেশালিস্ট হয়) সেই Specialist যখন রয়েছে তখন তুমি-আমি খামকা অত তকলিফ বরদাস্ত করে আনাড়ির মতো এমেচারি করতে যাব কেন? Specialist মোটর মেরামত করে, তবে Specialist-ই স্বর্গে যাবার সিঁড়ি তৈরি করে দেবে না কেন? ভূশণ্ডীর মাঠে খামকা ক্ষীরি বামনীর ভিটেতলা থেকে সোজা যেখানে দেবদূতরা গোলাপি উড়ুনি পরে ফটাফট সোডার বোতল খুলছে, সেখানে যাবার পথ ওরা যখন জানে তখন ওদের হাতে দু পয়সা ঠেকিয়ে দিলেই হয়— বাংলা কথা! আমার অবশ্য সমূহ বিপদ। একে তো সব মুসলমানকেই পাঁচ বেকৎ নামাজ করতে হয়, তার ওপর আমি আবার সৈয়দ, মুহম্মদের বংশধর (সাবধান! চাট্টিখানি কথা নয়— তোমার দাদু এ বাবদে প্রশ্ন শুধোলে আমি বলেছিলুম, 'ক্যান মশায়, আপনারা যদি চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ হতে পারেন—

www.pathagar.com

অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের পুত্র হতে পারেন তবে আমার claim তো অনেক modest. আমি একজন মানুষ মাত্র পূর্ব-পুরুষ হিসেবে চাইছি!'), তার ওপর আমাদের বংশ গুরুবংশ (যদিও থিয়েটারে আবদালা সাজিনে— খল্বিদং দ্রষ্টব্য ওটা দিলীপ রায়— না?) Religiosity-র worst example ওই লোকটা! বাপস!), এবং finally কাইরোর ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়া দেড়টি বছর সুদ্ধমাত্র স্মৃতি (মাকড় মারলে ধোকড় হয়— নবমীতে অলাবু ভক্ষণ, পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি) নিয়ে research করেছি।

আমার মতো 'জ্ঞানপাপী' এ জগতে দুর্লভ। আমার কী গতি হবে, বল তো। জাবালি? মহেশ?

আচ্ছা, বল তো, আমি কেন অত শত ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, এবং এখনও পড়ি? আমার ডক্টরেটও History of Religion-এ। জর্মন মাল, বাবা, চালাকি নয়— ছে ছে পয়সা জাপানি মাল নয়। বলতে পারলে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম।

তোমার দাদু রসিক লোক, রসজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁর রসবোধ আছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 'রসশিল্পী' বা 'রসসাহিত্যিক' বলার কোনও অর্থ হয় না। শিল্পী রস বানাবে না, তবে কি কচুপোড়া তৈরি করবে! 'রম্যরচনা'-ও ওই একই দরের কথা। এখানকার গাড়লরাও লেখে 'বিশ্বভারতী University'। 'বিশ্বভারতী' মানেই তো University !!

তদুপরি, নিছক রস সৃষ্টির জন্যই তো রাজশেখর কলম ধরেননি। তিনি কি গোপাল ভাঁড়! তওবা, তওবা!!

আমার বইটার নাম শব্‌নম্। অর্থাৎ 'শিশিরবিন্দু', হিমিকা, গৌরী। উপন্যাস। অতি মোলায়েম। নির্ভয়ে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

আমি অবসর সময়ে আস্তে আস্তে 'পূরবী'র টীকা লিখছি। কবে শেষ হবে আল্লায় মালুম! আশীর্বাদ জেনো।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর থেকে : 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত, নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।' যার চিত্ত পরব্রহ্মে যুক্ত, তিনি নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিত হন।*

শান্তিনিকেতন
৩০।৩।৬০

৪

স্নেহাস্পদেষু,

কয়েকদিন পূর্বে তোমাকে চার পৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখি, ইতিমধ্যে তোমার দাদুর লেখাটি পাই। তিনি এত বেশি চমৎকার লেখেন যে, আমরা চমৎকৃত হয়েও চমৎকৃত হইনে। তিনি আমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন।

যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি আর কী বলব?

তবে ওই যে বলেছেন, কর্ণেজপন সেইটে যে হয়ে উঠে না। Prophet-রা সেই কর্ণেজপন নিজেরাই করে যান, Politician-রা তার হদ্দ রাখে না। হিটলার চূড়ান্তে পৌঁচেছিল। কিন্তু প্লাতো, কিংবা এ যুগের রবীন্দ্রনাথ এঁরা আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কর্ণেজপন তো কেউ করে না। বিশেষ করে প্লাতো।

* লেখক এই পত্রের উল্টোদিকে এই অংশ উল্টো করে লেখেন।

www.pathagar.com

বিশেষ করে আমরা সব blase হয়ে গিয়েছি। একটা গল্প শোন। বর্মার যুদ্ধে একটা লোকের মাথা উড়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ পর আরেকজন সেপাইয়ের আঙুলের ডগাটি উড়ে যাওয়াতে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাপ্তেন বললে, 'তুই কী কাপুরুষ রে! ওই লোকটার মাথা উড়ে গেল, আর সে একটি শব্দ না বলে চুপ করে শুয়ে পড়ল। তুই কি না একটা আঙুলের ডগা যেতেই হাউমাউ করে উঠলি!'

ট্রাম ঠিকমতো থামায়নি বলে একটা লোক চোট পেল (মনে কর, আমাদের 'চিকিৎসাসঙ্কটের হিরো যে রকম)। আমি তাই নিয়ে মৃদু কোলাহল করতে একটা লোক ভেংচি কেটে বললে, 'ও! মশাই বুঝি মফস্সলের লোক। দেখেননি কত লোক না খেয়ে মরে গেল, কত রেফুজি মর মর— আর আপনি চোটপাট লাগিয়েছেন একটা লোকের সামান্য চোট লেগেছে বলে।'

ছোট হোক, বড় হোক, তুমি কিছু একটা আপত্তি করলেই, বড় বড় পাপের ফিরিস্তি শোনানো হবে তোমাকে। অর্থাৎ পাপাচার দেখে দেখে সবাই এমনি ব্লাজে হয়ে গিয়েছে যে কারও কানে আর জল যায় না।

ভেজালের কথাটা অতিশয় খাঁটি। যে যুগে আইন করা হয়েছিল তখন ভেজাল ছিল অতি সামান্যই— ওটা নিয়ে তখনকার চাণক্যরা বিশেষ ভাবিত হননি। তাঁরা তখনকার জমিদারি প্রথার ফল জালের জন্য ফাঁসি, পরে চোদ্দ বছর জেল আইন করেন। এখন জাল খুবই কম, ভেজাল বেড়েছে— আইন সেই মান্ধাতা আমলের।

এখন উচিত খুনের বেলা যে আইন সেইটে চালানো। তিনজন লোক যদি পিস্তল নিয়ে কাউকে খুন করতে গিয়ে, মাত্র একজন গুলি চালায় এবং তার একটা গুলিতেই লোকটা মরে তবে তিনজনেরই ফাঁসি— আদালত শুধোয় না, কার গুলিতে অকু-টা ঘটল। ভেজালের বেলাও তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আদ্যন্তমধ্য— Managing Director থেকে চাপরাসি পর্যন্ত— সক্কলেরই তখন জেল-জরিমানা হওয়া উচিত।

এবং জানো, এখনও আইন— ভেজালের যে জিনিস পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল সেটা ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী না হলে ফেরত দিতে হয়!

আরও কত কী!

ক্ষিতিমোহনবাবুর শেষ রসিকতা! বর্ধমান হাসপাতালে মৃত্যুর দু দিন আগের কথা। তাঁকে দেখতে এসে এক বন্ধু শুধালে, 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ব্যবস্থা কী হচ্ছে? তিনি বললেন, 'সিলেট অঞ্চলে 'শ' অক্ষর উচ্চারণে 'হ' হয়। কাউকে 'শতায়ু হও' বলতে গেলে হয়ে যায় 'হতায়ু হওয়া'।

বাকিটা তিনি আর বলেন নি। 'হতবার্ষিকীই' হবে বলে মনে হচ্ছে।

গুরুদেব বলে গেছেন তাঁর শতবার্ষিকীতে ২৫ টাকা খরচ হবে। শত বার সিকি, চার আনা x ১০০ = ২৫ টাকা।

তোমার বয়স কত?

কী পড়?

ভাই-বোন কটি?

তাদের বয়স কত?

আশীর্বাদ জেনো। সৈ. মু. আ

কাটিঙটা ফেরত চাই?

www.pathagar.com

৫

C/o Inspectress of Schools,
P.O. Ghoramara, Rajshahi. E. Bengal.

স্নেহের দীপংকর,

হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।

যবে থেকে এখানে এসে খবর পেয়েছি, আমার নিজের মনই কিছুতেই সান্ত্বনা মানছে না। আমি যেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছিনে। এখানে রওনা হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রাজশেখরবাবুকে সভাতে দেখে কী আনন্দই-না হয়েছিল। ইনি তা হলে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন— সভাতে যখন আসতে পেরেছেন। এবারে তা হলে রাজশাহী থেকে ফিরে এসে নির্ভয়ে দেখা করতে যেতে পারব। এখানে এসে এই খবর। আমার স্ত্রী কাগজ এনে দিলেন। তিনি শ্রীযুক্তা আশা* পালিতের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছেন।

এত দিন ধরে রোজই ভাবছি, তোমাকে লিখি। কিন্তু কী লিখি? পরমাত্মীয় বাড়ির মুরুব্বি গত হলে কী হয় সে কি আমি জানিনে? তার ওপর তাঁর সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব। বাড়িখানা যেন ভরে থাকত। আর আমার চোখের সামনে তিনি অহরহ ছিলেন প্রত্যক্ষমাণ। কতবার ক্ষোভ করে ভেবেছি, যদি ওঁর মতো একটা গল্পও লিখতে পারতুম।

বাঙলা দেশের সব লেখক একজোট হলেও তাঁর মতো একটি ছত্রও লিখতে পারবে না। তিনি চলে গেলেন। এখন এই অর্বাচীনদের রাজত্বে বাস করতে হবে।

আজ থাক। আমার সত্যই কোনও কথা বেরুচ্ছে না।

কলকাতায় ফিরেই তোমার খবর নেব। তোমাকে আমার প্রাণ খুলে সব বলব। ইতিমধ্যে তোমাকে একটি কথা বলি। আমি পৃথিবীর কোনও সাহিত্য আমার পড়া থেকে বড় একটা বাদ দিইনি। রাজশেখরবাবু যে কোনও সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত। একথা বলার অধিকার আমার আছে।

আশীর্বাদ জেনো
সমশোকাতুর
সৈয়দ মুজতবা আলী

৬

C/o Mrs Rabeya Ali
Inspectress of Schools, P.O. Ghoramara
Rajshahi. East Bengal.

স্নেহাস্পদেষু,

রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে আমি অফুরন্ত কথা বলতে পারি। কারণ তাঁর লেখা আমি এত শ্রদ্ধার সঙ্গে এত অসংখ্যবার পড়েছি যে, এমন একটা লাইনও কেউ বলতে পারবে না যেটার

এই পত্রটি রাজশেখরবাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পেয়ে লেখা।

* রাজশেখর-দৌহিত্রী

www.pathagar.com

আগের এবং পরের ছত্র আমার অজানা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার একটা গভীর দুঃখ আছে যার ইতিহাস তোমাকে আমি বলি।

বছর পাঁচ পূর্বে দোল না নববর্ষ না কি যেন কিসের উপলক্ষে '...' যথারীতি আমার লেখা চায়। আমি উত্তরে জানাই— যদিও কোনও প্রয়োজন ছিল না— যে আমি রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক লেখা লিখব। তখন ওই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদক ছিল কে যেন এক গাড়লস্য গাড়ল। উত্তরে লিখলে, আমরাও জীবিত কোনও লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করিনে; কারণ অন্যেরা চাপ দেয় ইত্যাদি। আমি তো রেগে টং। আমি ব্যাটাকে তখন হাতের কাছে পেলে তার গোঁফ ধরে কোদাল দিয়ে মুণ্ডু চাঁচতুম— যদিও এটা ভীষণ মোগল যুগ নয় এবং আমিও কোফতা খান নই।

কী অদ্ভুত 'যুক্তি'! তা হলে প্রথম রবিবাবুকে— যদি আমি তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধে লিখতে চাই— ডাঙশ মেরে ঘায়েল করে তবে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে পারব।

পরে অবশ্য জানতে পারলুম, এর পিছনে কী একটা ছুঁচোমি ছিল। আমি অবশ্য ওই শ্বশুরনন্দন (রাগ কর না, শশিশেখরবাবু তালেবর লোক ছিলেন; তিনি এর সাতগুণ লিখতেন) যতদিন সম্পাদক ছিল ততদিন ওদের চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিইনি।

১৯৫৯-এর শেষের দিকে কী করে সাগর (-ময় ঘোষ— 'দেশ' সম্পাদক) তাবৎ ব্যাপার জানতে পেরে আমাকে ওই প্রবন্ধ লিখতে বলে। রাজশেখরবাবুর দু একখানা বই আমার তখন ছিল না (প্রতি বই অন্তত তিনবার কিনেছি ও 'ধার দিয়েছি'— 'যা দেখেছি—' -ও তদ্বৎ), তাই সাগর উদ্‌যোগী হয়ে কলকাতা ফিরে গিয়েই সেগুলো পাঠায়। আমি সব বই (মায় 'হিতোপদেশ') আমি যেখানটায় বসে দিনযামিনী কাটাই তারই পাশে রাখলুম। 'শবনম' লিখি আর ওগুলো পড়ে পড়ে নোট নিই, ছকে ফেলি (যেমন ভণ্ডামি, স্নাবারি, কুসংস্কার, Commonsense vs. religious bunkum, Versatility in linguistics — বিহারি, মেড়োর বাঙলা উচ্চারণ, দিলতোড়বাগ, 'কেফ্' রেভেজ্‌ভুস— (by the way আমার ছোট ছেলের নাম ভজু (৬.৫) আর বড় ফিরোজ (৮) : বড়টা প্রায়ই 'চা-রা-রা— ভজুয়াকি বহিনিয়া' গান গায়, আপন সুরে— অবশ্য দু জনার hot favourite সেই উচাটন মন্ত্র 'মারোজ্ জোয়ান হেঁইয়া'— আম্মো কোরাসে 'জোয়ান' করি) etc.etc.

ইতিমধ্যে সাগর ঘন ঘন চিঠি দেয়, আমারও উৎসাহের কমতি নেই কিন্তু কলম ধরতে গেলেই মুখ শুকিয়ে যায়।

ভাবি, আমার অন্য লেখা খুব সম্ভব তিনি পড়েন না বা অল্পই পড়েন, কিন্তু এটা তো দুশমন সাগর ওঁকে দেখাবেই, আর উনি পড়ে ভাববেন— সর্বনাশ, অন্য পাঁচজনকে ডেকে কী বলবেন— আরও সাড়ে সর্বনাশ! শশিশেখরবাবুর review লিখতে গিয়ে আমি একবার মার খেয়েছি— আবার! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই review আমার too very worst performance। রাজশেখরবাবু ওটা আমায় review করতে বলেছিলেন (আসলে কিন্তু আমি আগেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওটা কিনে পড়ে সাগরকে লিখেছিলুম ওটার review আমি লিখব, বাজে লোক যেন না লেখে, আর রাজশেখরবাবু তো লিখবেন না), আমি এত nervous হয়ে যাই যে পরীক্ষার হলে যে রকম আকবর-আওরঙ্গজেবে গুবলেট হয়ে যায়, আমার তাই হয়েছিল। এখন আবার না তাই হয়। মার্চের গোড়াতে সাগরকে লিখলুম

www.pathagar.com

১০।৩।৬০-এর ভিতরে ওটা তৈরি হবে না— ওর বাসনা ছিল ১৮।৩।৬০-এর সঙ্গে ওটা যেন সিনক্রোনাইজ করে— শুনেছি, সাগর মাথার চুল ছিঁড়েছে, নিতান্ত অগ্রজসম বলে অভিসম্পাত দেয়নি। আমায় লিখলে, 'আপনি মহা অন্যায় করেছেন; জানেন না, উনি অত্যন্ত অসুস্থ, উনি আপনার লেখাটা পড়লে জানতে পারতেন অন্তত একটা লোক তাঁর লেখার সঠিক সমঝদার, আপনার মতো ওঁর সম্বন্ধে আর কে লিখতে পারে'— আরও কী সব আবোল তাবোল লিখেছিল আমাকে আসমানে চড়িয়ে— এখন একমাত্র ভরসা আপনার যদি সুবুদ্ধি হয়, লেখাটা বিলম্বেও শেষ করেন, যাতে করে উনি অন্তত দেখে যেতে পারেন।'

ইতিমধ্যে আমি চিন্তা করলুম, এ লেখা লিখতে না পারলেও উপস্থিত আমার পুরনো বাসনাটা পূর্ণ করি। একটা বই উৎসর্গ করার বাসনা, কিন্তু প্রত্যেক বই শেষ হলে বলি, 'না, এটাও পাতে দেওয়া যায় না— next-টা যদি ভালো হয়।'

'শবনম' তখন শেষ হতে চলেছে। আমার পছন্দ হয়নি। তবু বললুম, আর তো অপেক্ষা করা যায় না। দুর্গা বলে ঝুলি। তোমাকে লিখলুম। ওই সময় ক্ষিতিবাবু চলে গেলেন। সবকিছু একেবারে তালগোলা পেকে গেল। জানো, সে শক আমার এখনও যায়নি। কঠিন কঠিন প্রশ্ন নিয়ে ওঁর কাছে তাঁর অপারেশনের দিন তিনেক পূর্বেও গিয়েছি। ওসব প্রশ্ন নিয়ে এখন কার কাছে যাই?

তার পর এই।

এখন 'শবনম' যখন পুস্তকাকারে বেরুবে তখন যতদূর পারি সংক্ষেপে উৎসর্গপত্রে বলব যে উৎসর্গটা তাঁর সদয় আশীর্বাদ পেয়েছিল। সংক্ষেপে এই কারণে, যে 'আমি ও রবীন্দ্রনাথ', 'আমি ও বাইশে শ্রাবণ' এরকম মানুষ যখন মহাপুরুষের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে চায় তখন আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়। ওদের আমি দোষ দিইনে, কিন্তু আমার করতে বাধে।

*** প্রথম ছত্রটা আমার খারাপ লেগেছে। রাজশেখরবাবু জীবনে ঈশ্বরকে কোনও importance দেননি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা এমনই মারাত্মক important হয়ে গেল যে তাই দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করতে হল! মরি, মরি! যেন রাজশেখর কলেজের ছোকরাদের মতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভগবানকে dare করে বেড়াতেন। তাঁর attitude (লেখা থেকে যা জানি— ভগবান নিয়ে আমাদের কখনও আলোচনা হয়নি, ভূত নিয়েও হয়নি, স্বর্গের দেবদূত ছোকরারা ১১ মাঘের বেক্ষোৎসবের মতো বাসন্তী না বেগুনি রঙের উড়ুনি গায়ে দেয় তা নিয়েও হয়নি— এক শো বার দেখা হলেও হয়তো হত না) ছিল completed indifference to things & concepts যেগুলো rationality-র বাইরে। The rational par excellence ভগবানকে অতখানি importance দিতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করবে।

আর শেষ sentence রীতিমতো defamatory of course তিনি ঈশ্বরকে মানেননি। এবং বেশ করেছেন! কী যুক্তির বহর! 'শ্রী'কে মানলে ভগবানকে মানা হয়। বটে! আর কুশ্রীকে মানলে? তখনও ভগবানকে মানা হয়, কারণ কুশ্রীও ভগবানের তৈরি (তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি বিচিত্র 'ছলনা জালে' which is কুশ্রী, ছলনা=অমঙ্গল=কুশ্রী = ভগবান— মহেশের মতো to= দিয়ে ইকোয়েট করতে পারলুম না বলে অপরাধ নিয়ো না)। আর যদি বল কুশ্রী ভগবানের তৈরি নয়, তবে তার independent seperate per se existence আছে। তা হলে তারও ভগবানের মতো প্রধান essence আছে— সেটা

www.pathagar.com

existence, অতএব কুশ্রীও ভগবান। এবং A forteriori এ সংসারে কুশ্রীই বেশি, মানুষের আচরণ কুশ্রী, মানুষের চিন্তা কুশ্রী, কুশ্রী বই বেশি বিক্রি হয়,— ad infinitum! Q. E. D, a la Mahesh !...

* * *

বুজরুকি, বুজরুকি, বুজরুকি। কোনও জিনিস যদি রাজশেখর সত্যই ঘেন্না (ঘৃণা নয় ঘেন্না) করে থাকেন তবে সেটা ওই বুজরুকি। Be simple, be honest, কী ভয়? যা আছ তা স্বীকার করতে লজ্জা কী? For Heavens sake (রাজশেখর হয়তো বলতেন For man's sake) do not pretend ! এই তো রাজশেখরের message যদিও তিনি স্যাকরার বানি ছাড়া অন্য কোনও বাণী দেওয়াটা রীতিমতো insolence বলে মনে করতেন— আমি যতটুকু বুঝেছি। আর আমি তো ভুল বুঝিনি। He was too great to be mistaken.

এ বছরে নববর্ষ সংখ্যা 'বসুমতী' দেখেছ? ওতে মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে আমার একটি লেখা বেরিয়েছে। ওটা রাজশেখরবাবুর নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগত— কারণ ওই বাবদে তাঁর মতামত তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ('যষ্টিমধু' না কী জানি একখানা কাগজে) একটি চিঠিতে প্রকাশ করেন। মডার্ন আর্টের প্রধান লক্ষণ, তার Obscurantism এবং রাজশেখর সর্বক্ষেত্রেই Obscurantism অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। ফরাসিরা যে রকম বলে, Ce qui n'est pas claire, n'est pas Franqais— whatever is not clear is not French ... আমার এ প্রবন্ধে অবশ্য বুজরুকির দিকটাই বেশি বিকাশ পেয়েছে।

'শবনম' পড়ে তোমার ভালো না লাগলেও তার একটা জিনিস তোমার ভালো লাগার কথা। বিস্তর খেটেখুটে অনেক সুন্দর সুন্দর ফার্সি দোহা চৌপায়ী জোগাড় করে বাঙলায় তার অনুবাদ করে এ উপন্যাসে লাগিয়েছি। অনুবাদে একটিমাত্র শব্দ বাড়াই-কমাইনি, শুধু বাঙলায় দীর্ঘহ্রস্ব নেই বলে ফার্সি ছন্দ বজায় রাখা অসম্ভব।

আমার চিঠি ছাপাবে, তার আর কী? কিন্তু তোমাকে আত্মজনরূপে মেনে নিয়ে হয়তো নিজের কথা, নিজের দম্ভ প্রকাশ করে বসে আছি। সেটা ছাপানো কি যুক্তিযুক্ত হবে? অবশ্য কলকাতার সাহিত্যিকবৃন্দের ভিতর আমি এমনিতেই মারাত্মক রকমের popular নই— কাজেই 'মড়ার উপর এক মনও মাটি একশ মনও মাটি' (এটা খাস মুসলমানি-প্রবাদ— কারণ মুসলমানেরই গোর হয়)। তবে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিয়ে তুমি edit করে ছাপিয়ে দিতে পার। আমার কণামাত্র আপত্তি নেই।

ছেলেবেলায় যখন কোনও কৃতী পুরুষের মৃত্যু হত তখন সেটা মনের ওপর কোনও দাগ কাটত না— কারণ তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে ছেলেমানুষ অচেতন। এখন যখন বিধুশেখর, হরিচরণ, ক্ষিতিমোহন, রাজশেখর চলে যান তখন এঁদের মূল্য বুঝি বলে বড় বাজে। বিধুশেখর নেই— বেদ এবং আবেস্তা তথা বীজধর্ম সম্বন্ধে কাকে প্রশ্ন শুধাই? হরিচরণ নেই— ছাতাটা বগলে নিয়ে চটিটা টানতে টানতে 'মাস্টারমশাই, বলুন তো—?'

সাগর = সাগরময় ঘোষ, 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। ক্ষিতি = ক্ষিতিমোহন সেন। বিধুশেখর = 'বিধুশেখর শাস্ত্রী। হরিচরণ = হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাবেয়া = রাবেয়া আলী, লেখকের পত্নী। ফিরোজ = সৈয়দ মুশাররফ আলী, ফিরোজ ডাকনাম, লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভজু = সৈয়দ জগলুল আলী, ভজু ডাকনাম, আর এক প্রচলিত ডাকনাম কবীর, লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র।

www.pathagar.com

'এই যে সৈয়দ, এস এস। এক্ষুণি তোমার কথা ভাবছিলাম। কাল সন্ধেয় তোমার বউ এসেছিল তোমার দুই ছেলে নিয়ে। বউমা আমায় বললে, "আশীর্বাদ করুন, আমার ছেলে যেন আপনার মতো পণ্ডিত হয়"। 'হাঃ, হাঃ। আমি কী বললুম, জানো—'

'সে কথা থাক্। বলুন তো, 'জলপাই' শব্দটা— ' ইত্যাদি।

তাঁর বয়স তখন নব্বুই। সম্পূর্ণ অন্ধ। Head—crystal clear.

রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে লিখব। লিখব বইকি, লিখব। কিন্তু কী কঠিন তুমি জান না। তাঁর, ক্ষিতিমোহনবাবুর যেখানে পাণ্ডিত্য সেটা বরঞ্চ চৌহদ্দিতে ফেলা যায়, কিন্তু রাজশেখর যেখানে বুজরুক, effeminiate (কচি সংসদ) অর্থগৃধ্নু (সিদ্ধেশ্বরীর অগা রায় বাহাদুর), corrupt politician (দক্ষিণ রায়) ইত্যাদিকে আর্টের পর্যায়ে তোলেন তাঁকে sum up করা বড় কঠিন। তাছাড়া পদে পদে bizarrerie— যত্রতত্র ছড়ানো— যে রকম-সায়েব মেম নাচছে, চাটুয্যে ধরলেন রামপ্রসাদী। Bizarrie জিনিস বাঙলায় অতি কম। Grotesque আছে, anachronistic humour-ও আছে, এমনকি weird-ও আছে (ফ্রেমে কেন বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?)। আরও বহু বহু বিদকুটে রস। বড় কঠিন, বড় কঠিন। তুমি বুঝবে না।

তোমাকে প্রথম চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভেবেছিলুম যতীনবাবুকে লিখব (ওঁকে আমার বড় ভালো লেগেছিল) কিন্তু ঠিকানা জানতুম না। এখন লেখা যায়? আমার দ্বিতীয় চিঠি পেয়েছিলে?

এখানে আরও দিন পনেরো তো থাকতে হবে। এখানে আমি মালিক নই। (রাবেয়া তোমার মায়ের সহপাঠিনী) বিবি আমাকে প্রায় 'সূ সূ সূ' (রাতারাতি) করে ডাকেন।

সৈ. মু. আ.

৭

শান্তিনিকেতন

স্নেহাস্পদেষু,

আমি অতিশয় দুরাবস্থার* ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। অবর্ণনীয়। আমি দু মাস বাইরে থাকার সময় আমার উঠতি এবং উড়ুক্কু বয়সের ছোকরা পাচক cum ভৃত্যটি রসাতলে গেছেন। এমনই চরমে পৌঁচেছে যে একাধিক প্রতিবেশী আমার কাছে ফরিয়াদ করে গেছেন। সে-ও না হয় সামলাতে পারি— কিন্তু রাত দুটোয় বেলেল্লাপনা করে ফিরলে পরের দিন কাজ কী রকম হয় সে তো বুঝতেই পারছ। আগে রান্নাটা অন্তত মন দিয়ে করত— এখন সে ইয়ারদের সঙ্গে দোকানে চপ-কাটলিস খেয়ে বাড়ির খাবার অবহেলায় রাঁধে। অসহ্য সে খাদ্য। সবচেয়ে বিপদ ওকে বিশ্বাস করে কলকাতা যাওয়া অসম্ভব। সে সঙ্গে সঙ্গে অষ্টপ্রহর বাইরে কাটাবে। রেডিয়ো, টাইপকল, সাইক্ল চুরি যাবে। ব্যস্।

দুরাবস্থা— 'দুরবস্থা' শব্দের অশুভ রূপ। জনৈক ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলেন, তিনি খুব দুরাবস্থায় আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরে বলেন, তা আকারেই (অর্থাৎ া-কারের অশুদ্ধ প্রয়োগে) বুঝতে পারছেন। এই রসিকতাটি লেখকের প্রিয় ছিল।

মাস্টার— লেখকের পোষা কুকুর

www.pathagar.com

মাস্টার অযত্নে থেকে সর্বাঙ্গে পোকা নিয়ে বসে আছে। অষ্টপ্রহর তার খেদমত করছি। বাড়িময় পোকা— flit, gemaxin D.D.T. তিন বস্তু Spray powder করছি অবিরাম।

তুমি মেয়েছেলে হলে তোমাকে স্বয়ংবরী করে এই বৃদ্ধ বয়সে বলতুম, 'ভাই, দুটো ভাত সেদ্ধ করে দে।'

চরমে চরমে!

তোমার কাছে বিশ্বাসী cook আছে? পাঠিয়ে দাও না। আমি তা হলে অন্তত কিছুদিনের জন্য হাজরা রোড যাই। সে খাবে দাবে, বাড়ি আগলাবে, আর মাস্টারকে দেখবে। রান্নাঘর আলাদা। আমি সেখানে ঢুকি না। তার জাত যাবে না। আর 'মসলা' হলে তো কথাই নেই। জাতভাই।

'শবনমে'র শেষ কিস্তি বেরুবে ২০ আগস্ট। সঙ্গে সঙ্গে বই। ত্রিবেণী প্রকাশনী— শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট। তোমার মাকে যেটা পাঠাব সেটা একটু দেরিতে পৌঁছবে। কলকাতা থেকে আসবে— তা-ও প্রকাশক বই দেয় author-কে প্রথম বিক্রির ধাক্কা সামলে নেওয়ার পর— আবার এখান থেকে যাবে।

তোমার sentence ব্যাকরণের দৃষ্টিবিন্দু থেকে জখ্‌মি। কিন্তু শরৎবাবু এ রকম বিস্তর sentence লিখেছেন। অর্থ পরিষ্কার। উহ্যটাও প্রাঞ্জল, কিন্তু—

বড় তাড়াতাড়িতে লিখছি।

আশীর্বাদ জেনো
সৈ. মু. আ.

৮

Santiniketan
১৬।৫।৬১

স্নেহের দীপংকর,

এবারে কলকাতায় মাত্র ২।৩ দিন ছিলুম বলে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

তুমি বুঝলে না ১০০০্ টাকা নিয়ে আমি কোথায় যাব? গ্র্যান্ডে বার্ নেই? সেখানে অনেকক্ষণ ছিলুম।

রঞ্জন*, তুমি আমি একমত। সম্পূর্ণ একমত।

তার সঙ্গে যোগ দিই। এই দিল্লিওয়ালাদের ন্যাজ মোটা করে দিল কে?

তোমরা সাহিত্যিকেরাই। তবে এখন কেন?

এবং দিল্লি তো শুনলুম, বাঙলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদ্বয়ের (কারা জানিনে) উপদেশেই তাঁরা পুরস্কার না দেবার মীমাংসায় পৌঁছন।

এখানে যা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে কেউ স্মরণ করেনি। করেছে পোয়েট টেগোরকে। প্রধান পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতজি ও রাধাকৃষ্ণ। এঁরা তো 'সোনার

রঞ্জন— কথাসাহিত্যিক নিরঞ্জন মজুমদার, রঞ্জন ছদ্মনাম। এঁর 'শীতে উপেক্ষিতা' গ্রন্থটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দিল্লির পুরস্কার— আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার কমিটির বিচারে বাংলায় কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ না থাকায় পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

বাংলার' কবি রবিঠাকুরকে চেনেন না; এঁরা চেনেন গিট্যানজলি, চিট্রা, স্যাড্নার (সাধনা) লেখক মিস্টার টেগোরকে। আর তাবৎ কার্যক্রম ইংরেজিতে! আমি অবশ্য কোনও পরবে যাইনি— বেতারে যা শুনেছি তার থেকে বলছি।

অনেক কাজ, অনেক লেখা বাকি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি আর ভাবি শান্তি কোথায়? কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাই কী কৌশলে!

কলকাতা আসার আশু সম্ভাবনা তো দেখছিনে।

তুমি একবার শান্তিনিকেতন হয়ে যাও না? Weekend-এ নয়! শনি রবি সোম আমি ব্যস্ত থাকি। অন্য যে কোনও দিন তিনেক। সঙ্গে শুধু toothbrush এনো। আর সব এখানে আছে।

আ—

৯

শান্তিনিকেতন

৩।৮।৬১

বাবাজি,

তেতো দিয়ে ভোজন আরম্ভ করতে হয়; তাই শুরু কেচ্ছা আরম্ভ করি, চিঠি লিখি না কেন? যার যেটা পেটের ধান্দায় করতে হয়, সেটা তার Hobby হয় না। যেমন মনে কর জজ সাহেব মাটি কুপিয়ে বাগান করেন, কিন্তু চাষা শখের বাগানের জন্য মাটি কোপাতে একদম নারাজ। তদুপরি আমি আবার অনিচ্ছুক, পয়লা generation-এর চাষা। বাপঠাকুর্দা কেউই 'সাহিত্য রচনা' করে পয়সা কামাননি। তার অর্থ, পেটের জন্যও যেটুকু মাটি কোপাই সেটাও অতিশয় অনিচ্ছায়। আমি 'সাহিত্য রচনা' করে কোনও আনন্দ পাইনে। সেই অপ্রিয় কাজ সমাধান হওয়া মাত্রই, আবার পড়ি খ্রি, মুহম্মদ, বুদ্ধকে নিয়ে। ধর্ম এবং তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়। এঁরা যে ঘোরতর সাংসারিক ছিলেন সেইটে সপ্রমাণ করার জন্য।

শুনেছি, সাঁওতাল ছোকরা সকালবেলা কাঁথার নিচের থেকে হাত বাড়িয়ে হাঁড়িতে হাত দিয়ে দেখে, চাল আছে কি না। থাকলে পাশ ফিরে ফের কাঁথামুড়ি দেয়। আম্মো সকালবেলা চা খেতে খেতে চিন্তা করি, মানিব্যাগে যা আছে তাতে চলবে কি না। বাকিটা বুঝতেই পারছ।

পত্রোত্তর না দিয়ে আমি পৃথিবীতে যত শত্রু সৃষ্টি করেছি, দুর্ব্যবহার, গালমন্দ করেও অত সৃষ্টি করিনি। অমিশন যে কমিশনের চেয়েও মারাত্মক হতে পারে, এটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঠিক সেই রকম আমি ভ্রমণ জিনিসটা যে কী রকম cordially detest করি সেটা শুধু আমিই জানি। গৃহিণী পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। তাই গেছোদাদাকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করতে চাইনে— লিটারিলি ও মেটাফরিক্লি। জীবনে মাত্র একবার স্বেচ্ছায়, ব-হাল-ব-খুশ তবিয়তে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম— কাইরো থাকাকালীন প্যালেস্টাইন বেড়াতে গিয়েছিলুম। (সেই কারণেই বোধহয়, ওই নিয়ে কোনও ব্যাপক ভ্রমণ-কাহিনী লিখিনি।) তারই খোঁয়ারি এখনও চলছে— খোঁয়ারিটা, by the way মাতাল অনিচ্ছায় করে, স্বেচ্ছায় নয়। সেই যে অমর খৈয়াম বলেছিলেন, 'মদ তো খেয়েছি বাবা, জীবনে কুল্লে একবার, বাকি জীবন তো খোঁয়ারি ভাঙতে ভাঙতেই গেল।'

www.pathagar.com

আমি ভ্রমণের খোঁয়ারি ভাঙ্গি মদ্যপান করে। সাদা চোখে পাটনা, কলকাতা, হেথাহোথা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অবশ্য স্পেশাল সলুনে যদি আমার কেতাবপত্র কেউ গুছিয়ে দেয় তবে অন্য কথা। কিংবা/এবং যদি অসাধারণ কোনও গুণীর সঙ্গ পাই। তিনি তখন এমন সব কথা বলবেন যে আমার জ্ঞানবুদ্ধি-অভিজ্ঞতা তখন furiously তার সঙ্গে fight দেবে। অর্থাৎ আমার মনটা ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কাজ না দিলে সে আমার ঘাড় মটকাতে চায়। তখন তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দিই।

তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বলি, তখন হয় কোনও কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি করি, কিংবা কোনও ঘটনা বা বস্তুর সরেস বর্ণনা দেবার চেষ্টা করি। তাতে আমার চৈতন্য-ভূত কাজ পায়। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ চালানো যায় না, পক্ষান্তরে বুদ্ধ চৈতন্য বলে যাচ্ছেন, আমি শুনছি, মনে মনে ঘুষোঘুষি হচ্ছে— আকছারই আমিই মারটা খাই— সেইটেই আমার কাছে পরম আনন্দদায়ক। এটা আমার বিশেষত্ব নয়। আমার দুই দাদা ওই নিয়ে সমস্ত দিনরাত কাটায়। বড়দা তো আদপেই লেখে না— যদিও অতি সরল, সুন্দর, ছোট ছোট কাটা কাটা sentence-এ, প্রায় naive বলতে পার, বাঙলা লিখতে পারে। মেজদা লেখে প্রায় যখন সত্যই কোনও অন্ধকার জিনিসের উপর আলোক ফেলতে পারে, কিংবা মেলা লোক যেখানে ভালো-মন্দ গুচ্ছের কথা বলছে সেখানে ওগুলো sum up করে পতঞ্জলির মতো সূত্রাকার standardize করে দেয়।

তুমি একবার এখানে এলেই পার, বাপধন! যা বলার বলে দেব, যা শোনার শুনে নেবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কার প্রভাব আছে, কার নেই সে নিয়ে বুদ্ধদেব* মাথা ফাটাফাটি করেছে। তার কতটা যুক্তিযুক্ত প্রাসঙ্গিক সে-কথা বাদ দিচ্ছি, কারণ it is all barking up the wrong tree. রবীন্দ্রনাথ অজরামর হয়ে থাকবেন তাঁর গানের জন্য (সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে বলছি, তিনিও সেটা জানতেন ও বহুবার দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন) তাই আলোচনা করতেই যদি হয়, তবে কর না তার গান নিয়ে। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ বাঙলা গান কোন্ জায়গায় পেলেন, কোন্ জায়গায় পৌঁছালেন, দ্বিতীয় কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ১৮৬০-৬১ সালের ব্রহ্মসঙ্গীত, তখনকার দিনের প্রচলিত অন্যান্য বাঙলা গান (ওস্তাদি এবং শব্দপ্রধান উভয়) থেকে তিনি কী নিলেন, তৃতীয়ত কোন্ কোন্ অনুভূতি প্রকাশ করলেন (লক্ষ করেছ কি, প্রেমের সবচেয়ে বড় বেদনা যে Jilted love — 'জোয়ান জিল্টার' মনে আছে?) সেটাই সর্বপ্রধান স্থান পেয়েছে আমাদের হাজার হাজার পদাবলী কীর্তনে, মাথুর পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুভূতি নিয়ে একটি গানও রচনা করেননি। তাঁর মূল সুর, 'আমি তোমাকে ভালোবাসলুম, তুমিও আমাকে ভালোবাসলে। তার পর তুমি মরে গেলে। এখন আমি কী করে এই বিরহ বেদনা সই?' মাথুরের সুর, 'হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে ভালোবাসলে, আমিও তোমাকে ভালোবাসলুম। আমি কী দোষ করলুম, আমার প্রেমে এমন কী অসম্পূর্ণতা ছিল যে তুমি তাকে অপমান করে, পদদলিত করে চলে গেলে?' আমার মনে হয়, jilted love সম্বন্ধে যে রবীন্দ্রনাথ লেখেননি তার একমাত্র কারণ— আমরা খুব ভালো করেই জানি,— তিনি কখনও jilted হননি, সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সুদ্ধমাত্র কল্পনা দিয়ে এরকম একটা most eternally tragic অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। 'প্রেম নিবেদন করলুম, অথচ আমার দয়িত সেটা গ্রহণ করল না', এ অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের নেই— একমাত্র 'গৃহপ্রবেশ' ('শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ

www.pathagar.com

'চিত্রাঙ্গদা'য় সামান্য) ছাড়া। 'ভালোবেসেছিলুম— কিন্তু প্রকাশ করতে পারলুম না, সমস্ত জীবন দগ্ধে মরলুম', এটাও নেই। কিন্তু এগুলো jilted love-এর কাছেই আসে না। অবশ্য এগুলো প্রকাশ করেননি বলে তিনি মহান কবি নন্, এ বলাটা পাগলামি। তবু অনুসন্ধান করাটা Quite interesting! চতুর্থত, শেলি-কিটস থেকে তিনি যে অনুপ্রেরণা পেলেন সেটা তাঁর গানে কতখানি সঞ্চারিত হল? এবং পঞ্চমত, এমন ধারা বিস্তরতঃ প্রশ্ন আছে।

কিন্তু গান নিয়ে আলোচনা কর, গান নিয়ে। বেড়াল উঠেছে গাব গাছে, আর কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে উপরের দিকে তাকিয়ে জামগাছ তলায়।

সুপার ট্র্যাম্পকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। তার প্রধান কাজ ছিল, নিছক পরোপকারার্থে সে জনপদবাসিনীদের দেহরঞ্জন করতে করতে এগোত,— সেটা লিখি কী প্রকারে!

তুমি যে আমার লেখা 'অতুলনীয়', 'অপূর্ব' এইসব বল,— আর তো কেউ বলে না। আমি রোক্কা পয়সা ঢেলে একখানা 'দেশ' কিনে 'নিরালা'য় ফিরলুম। পুটপুটি সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ।— 'পঞ্চতন্ত্র'টার দিকে তাকালেই না।

আমার বঁধুয়া আন-বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।

যদি রাগ না কর তো বলি। আমার প্রায়ই মনে হয়, তুমি (এবং হয়তো মিত্তির, অংশত) আমার ভালোবাসা পেয়েছ বলেই হয়তো আমার লেখার প্রশংসা কর। অচিন্ত্য বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাদেরও হয়তো ওই কথাই বলতে। আবার মাঝে মাঝে ভাবি, আজকের দিনে রাজশেখরবাবুর nearest approach তো আমিই, অবশ্য diluted to .00000001-এর thinness-এ! তাই হয়তো লেখার প্রশংসা কর। তা হলে অবশ্য এর খানিকটে আমার প্রাপ্য।

Instalment-এর চাপ আছে বলেই তো আমার সব লেখা বেরোয়। একমাত্র 'দেশে-বিদেশে' (তা-ও শেষের চাপটারগুলো তাই) এবং 'শবনম' (অংশত) একনাগাড়ে লেখা। তাতেই লেখা ভালো হয়, কিন্তু আমার হাড়-আলসেমি ওরকম sustained effort করতে দিল কই।

৮ তারিখ পাটনা যাচ্ছি। ফিরে আসব এখানে। তার পর কলকাতা হয়ে রাজশাহী। কলকাতায় ক-ঘণ্টা থাকব, জানিনে। তবে খবর দেবার চেষ্টা করব। ফেরার মুখে দীর্ঘতর।

এখানেই উপস্থিত থাক। পুজোর লেখা এখনও একটাও আরম্ভ করিনি। ওদিকে পাওনাদারের ঠ্যালায় প্রাণ যায় যায়।

মিত্তির কুটিল অতি, না কি যেন, সে আমায় লিখবে কেন?

আশীর্বাদ জেনো।
মুজতবা

অচিন্ত্য = কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বুদ্ধদেব = কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু।
পেঁচি রায় = Dr. P. C. Roy (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)
'নিরালা' = দক্ষিণ কলকাতায় লেখকের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।
পুটপুটি = প্যারিমোহনের এক কন্যা। পুটপুটি ডাকনাম।

www.pathagar.com

পেঁচি রায়ের (P.C.Roy-কে আমরা তাই বলতুম) cover-এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। ওটা আমার এক সুইস্ বান্ধবীর কাজে লাগবে। পেঁচি রায় আমার autograph-এ লিখেছেন— Islam, the most perfect equalizer of men. ভারি মাইডিয়র লোক ছিলেন। এখানে এসেছিলেন। যেই শুনলেন, আমি মুসলমান অমনি জাবড়ে ধরে যা পিঠ চাপড়াতে আরম্ভ করলেন। এবং বিরাশি সিক্কা মাপে।

১০

২। ১০।৬১

স্নেহের দীপংকর,

আশা করি আমার দু খানা পি. সি.-ই পেয়েছ।

চোঁ করে এক চুমুকে নিশ্বাসে বই পড়া কাকে বলে জান? তাই হল কাল আমার। মোড়ক খুলে এবং নিশ্বাসে পড়লুম, পরশুরামের কবিতা। কী চমৎকার অদ্ভুত বই। কবিতাগুলো এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। তুমি যদি আমায় বেরসিক না ভাব, তবে বলব, 'সতী'র মতো কবিতা হয় না। মাইকেলের গাম্ভীর্য এবং রবীন্দ্রনাথের মাধুর্যের পিছনে অতি গোপন পরশুরামের দুষ্টু হাসি। সে হাসিটা কোন্ জায়গায় লুকনো আছে ধরতে পেরেছ, ভয় করি। তোমাকে লেখা কবিতাটির উপদেশ মেনে চলছ তো? তবে হ্যাঁ, সে-রকম গুণীজ্ঞানী কলকাতায় কোথায়? আর আশ্চর্য ১৮৯৯— তখনও তিনি 'টীনে'— কী বাহারে কবিতাই না লিখেছেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে শালি-বাহন নাম সপ্রমাণ করতে! দুলাল, গৌতম, গোরাচাঁদ এরা সব কোথায়?

বাঙলায় বলে, 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে'। আমার বিবিজান আসি আসি করে, আসার বেলাতেই আমাকে লবেজান করে ছাড়ছেন। এখনও পাকা খবর পাইনি।

আঃ আঃ

এইমাত্র তোমার পি.সি. পেলুম। বিবি না এলে আমাকে যে রাজশাহী যেতে হবে সেটা ওই কলকাতা হয়েই যেতে হবে। কিন্তু নানাবিধ কঠিন কারণে ১৪।১০-এ তোমাদের বাড়ির প্রোগ্রামটা হবে না। তার আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। সেটা তোমাকে যথাসময়ে জানাব। নিশ্চিত থাকো।

সৈ. মু. আ.

১১

৩০।১১।৬১

ভ্রাতঃ,

তোমার পাঠানো কভার ঠিক সময়েই পেয়েছি। এটা আমার বান্ধবীর জানটা নিশ্চয়ই তর্-র্-র্ করে দেবে। আগেরটা ফিরোজ মেরে দিয়েছে। বান্ধবীর দেওয়া জিনিস ব্যাটা মেরে দিলে এর রাজসিক উদাহরণ কাব্যলোকে আছে। ভিক্টোরিয়া (বিজয়া) ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া একখানা চেয়ার যখন বুয়েনোস আইরেস থেকে শান্তিনিকেতন পৌঁছল তখন রথীন্দ্রনাথ সেটি গ্যাঁড়া মেরে দেন— ১৯২৬ খ্রি.-তে। তার ঝাড়া পনেরো বছর পরে

www.pathagar.com

১৯৪১ খ্রি.-র মার্চ মাসে বাপ সেটা ব্যাটার কাছ থেকে চেয়ে নেন। 'শেষ লেখা' পুস্তিকার চার এবং পাঁচ নম্বর কবিতা পশ্য। পাঁচ নম্বর কবিতার দোসরা লাইনে আছে 'খুঁজে দেব'; কিন্তু হওয়া উচিত 'খুঁজে নেব'। ওই সময়ে কবি আর লিখতে পারতেন না— ডিক্‌টেট করতেন।। তাই বোধ হয় গুবলেট হয়েছে। চেয়ারখানার ছবি পাবে (বৃহৎ) রবীন্দ্র রচনাবলীর 'পূরবী' পুস্তকে। ফটোতে তিনি সেই চেয়ারে বসে, ভিক্টোরিয়া (বিজয়া) মাটিতে। বইখানা ওকেই উৎসর্গ করা হয়েছে, 'বিজয়া' নামে।

'আর্চ-ভবঘুরে' আরও একটু পরে বেরুবে। দুটো চারটে উটকো লিখে নিই। একবার ওই দ'য়ে মজলে লবেজান। আসলে উচিত 'ভবঘুরে' দেশে ও 'পঞ্চতন্ত্র' আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে লেখা।

চাকরি নিয়ে ন্যাজেগোবরে। 'প্যোঁজপয়জার' কথাটা জান? আমার হয়েছে তাই। অন্য কোনও প্রশ্ন মনে পড়ছে না, তোমার চিঠিতে।

আশা করি কুশলে আছ। আশীর্বাদ জেনো।

সৈয়দ মু. আলী

১২

শ্মশান, শান্তিনিকেতন
২৩।৪।৬৩

ভাই সাহেব,

সেন পিসিটি কে বটেন?

আমাদের গরমের ছুটি। ১।৫ থেকে ৩০।৬। আমি ৪ তারিখ নাগাদ কলকাতা আসব। আজকাল উঠি মনোজ বসু, P. 560 Lake Road, Tel. 461054-এ, কিংবা Great Eastern-এ কিংবা যততত্র। অর্থাৎ এখন আর কিছু ঠিক নেই। খবর দেব। তার পর রাজশাহী যাব।

ইতিমধ্যে আসতে পারবে কি? তা হলে রইল মাত্র ২৭।২৮ এপ্রিল। কিন্তু না এলেই ভালো। ভীষণ গরম! বরঞ্চ বর্ষায় এস। জায়গাটি বর্ষায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ধরে।

Oscar Wild বলেছিলেন, 'আমাদের এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা অবজ্ঞায় রাস্তায় ফেলে দিতুম, কিন্তু ফেলি না, পাছে অন্য কেউ কুড়িয়ে নেয়।' তোমার দেখি তারই উল্টো পিঠ। 'অনেকেরই আছে, তাই এটা আমি রাখি কেন, ফেলে দিই।' অর্থাৎ যদি ধরা পড়ে, আমি ডজন খানেক নববর্ষ শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাই, তা হলে তুমি তোমারটা ফেলে দেবে। এই তো? না, ভুল বুঝলুম?

মোদ্দা কথা, তোমার কাছে আছে শুধু scarcity value. জল বাতাসা তোমার কাছে মূল্যহীন। কিংবা বলি, আল্লা যদি দুনিয়ার সর্ব বাতাস বন্ধ করে শুধু তোমাকেই দম নিতে দেন তবেই তুমি খুশি হবে।

আমি অন্য পন্থায়। একবার কুরান-পুরাণ ঘেঁটে দেখি, কাল গঙ্গাজল দুষ্ট হয়ে যাবে। খেলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। চাষাদের বারণ করলুম। তারা আবার শোনে নাকি। জানে,

---

মনোজ বসু = কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু

www.pathagar.com

আমি পণ্ডিত বটি, কিন্তু আস্ত গবেট। পরদিন খেল সবাই জল। হয়ে গেল বদ্ধ পাগল।

আমি আর কী করি? ছুটে গিয়ে এক আঁজলা খেয়ে নিলুম। কারণ it is mad to be same in a mad world!

অতএব সঞ্চয় করবে শুধু তাই, যা অন্য সব্বায়ের আছে। তা হলে তোমাকে কেউ হিংসে করবে না। পছন্দ করবে ফিল্মি গানা, খাবে পাইস-হোটেলের খানা, বিয়ে করবে কানা।

ব্যস! Safe as the Bank of England.

কী সব আপ্তবাক্য বলে গেলুম। আরেকবার বললে নিজেই বিশ্বাস করে ফেলব।

এক বন্ধু জানালেন, 'শনিবারের চিঠি' আমাকে impotent বলেছে। মনে পড়ল, Von Platter নামক জনৈক লেখক একবার Heine-কে আক্রমণ করেন। উত্তরে Heine লেখেন—

It is good so, that Von Platter is an open enemy of mine in front of me. I would be genuinely alarmed if I were to know that he is a friend of mine behind my back.

Von Platter— বলা উচিত— homosexual ছিলেন।

কী অশ্লীল! তোবা তোবা বলেও তৃপ্তি হয় না।

সৈয়দ মুজতবা

১৩

P.O. Santiniketan
Birbhum
৯।৮।৬৩

ভদ্র,

ধর্মগ্রন্থ-- বিশেষ করে মূল text — মাত্রই oceans of salt water. পানীয়-জল বের করতে হলে জানটা পানি হয়ে যায়। কাজেই জরথুস্ত্রি বাবদ অত খাটনি কি সইবে? তবু বলি, প্রথম পড়বে Encyclopaedea of Religion & Ethics-এ Zoroastrianism সম্বন্ধে প্রবন্ধ। তাতে যে biblography আছে সেটা তখন follow up করতে হবে। কিন্তু ERE মোটামুটি ১ম যুদ্ধপূর্ব। পরে ভালো বেরিয়েছে, E. Herzfeld, Zoroaster & his world, Punceton 1947 (USIS-কে বললে এনে দিতে পারে)।

আর ধর্মচর্চায় যেদিন interest হবে সেদিন কর। ধর্ম আচরণ অন্য জিনিস। সেটাতে যেদিন interest হবে সেদিন করবে। অযথা, তেষ্টা না থাকলে, জল খাবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। প্রায় সমস্ত দিন বিছানায় কাটাই। চোখেও ব্যামো। না থাকলেও পড়তুম না। অর্থাৎ চাকরি বজায় রাখার জন্য নিতান্ত যেটুকু কাজ করতে হয় তাই করি। In plain Bengali, আমি এখন দ্বিজেন্দ্রনাথকে অনুকরণ করছি। ভয় শেষটায় না হনুকরণ (aping) হয়ে দাঁড়ায়। শুয়ে থাকি, ক্লাস করি,— (rickshaw যোগে)— ব্যস্!

দ্বিজেন্দ্রনাথ = দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

www.pathagar.com

কবে আসছ? এখন এখানে ভারি সুন্দর। ফিরোজ ভালো আছে।

আশীর্বাদ জেনো।

আ

১৪

১৪।৮।৬৩

স্নেহাস্পদেষু,

ধর্মবাবদে সদাই সর্বপ্রথম পড়বে, Encyclopaedea of Religion and Ethics-এ যা জানতে চাও, তা। তখনও তেষ্টা না মিটলে ERE-এ যে bibliography দেবে সেটা follow up করা। তবে দুঃখের বিষয় ইনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত হন— তার পরের খবর দিতে পারেন না। যদিও এ রকম একখানা Encyclopaedea ত্রিসংসারে নেই। অতি অতি অত্যুত্তম।

অতএব সর্বপ্রথম ওই কেতাবে Zoroastrianism প্রবন্ধটি পড়ে নেবে। বেলভেডেরেতে আছে।

শ-ছয় বোধ হয় দাম। Instalment-এ কেনা যায়। Standard Literature, Esplanade-এ এদের দোকান। বছর পাঁচেক পূর্বে, নতুন কী এক কায়দায় reprint বেরিয়েছে— প্রায় ৩০ বৎসর out of print থাকার পর।

নিট্‌শের Zorathustra তাঁর আপন সৃষ্টি। তার সঙ্গে জরথুস্ত্রের কতখানি মিল সেটা আল্লায় মালুম।

তুমি বোধহয় পাকিস্তান থেকে লেখা— জুন মাসে— আমার একখানা চিঠি পাওনি। ফিরোজ এখানে ইস্কুলে পড়ে। মিত্তির এখানে অন্তত দশবার এসে আমার খবর নেয়নি। I have been cut, ওকে আর খুঁচিয়ো না। মাস আড়াই ধরে আমি অসুস্থ। ২২ ঘণ্টা— দিনের— বিছানায় কাটাই। হপ্তায় তিন দিন ক্লাস নিই— নান্যপন্থা বিদ্যতে বলে। Organic কোনও trouble নয়। Rest, worst physical weakness, আহারে সম্পূর্ণ অরুচি বলে খেতে পারি না। Weakness-ও যায় না।

আশীর্বাদক

আ

১৫

শান্তি

৭।৯।৬৩

স্নেহের দীপংকর,

আমার শরীর ও মন ভালো নয় তাই দীর্ঘ আলোচনাতে কী করে ঢুকি। সত্য বলতে কি পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লিখতে কষ্ট হয়। না হলে 'পঞ্চতন্ত্র' বন্ধ কেন?

দুই মতই correct যারা তোমার দাদুর শেষদিকের লেখা পছন্দ করতেন না, তারা কোনও রকম serious জিনিস পছন্দ করেন না। অর্থাৎ আমাদের কুসংস্কার, ধর্মের নামে

www.pathagar.com

ভণ্ডামি, সামাজিক অনাচার, শাস্ত্রের প্রতি মূঢ় বিশ্বাস, ইত্যাদি বহুবিধ জিনিস নিয়ে তাঁরা আদৌ আলোচনা করতে চান না। দাদু আসর জমিয়ে নিয়ে সেগুলোর hollowness দেখানো, অন্তত তাই নিয়ে একবার চিন্তা করতে প্রলোভিত করার চেষ্টা দেন এবং সেটা pure humour, কভু সামান্য satire, কভু বা reduction ad absurdum পদ্ধতিতে। কাজেই তারা সেগুলো পড়ে সুখ পায়নি।

আর যারা এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে তাদের sense of humour নেই। কাজেই এসব জিনিস আদৌ পড়ে না।

অন্য লেখকদের কপালেও দুর্ভোগ হয়েছে অন্যান্য দেশে। এদেশে, মনে কর, বিদ্যাসাগরের serious বই এখনও প্রচুর লোকে পড়ে, কিন্তু যেসব লেখা তিনি 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' বেনামিতে লিখেছিলেন সেটা ক-জন পড়ে? সেখানে তিনি ওই রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (দাদুর চেয়ে অনেক রূঢ়, heartless; বস্তুত রাজশেখরকে কখনও আমি সামান্যতম রূঢ় বা বেদরদী হতে দেখিনি) করে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেছেন; সে-মতবাদীদের যেন সমাজের সামনে উলঙ্গ করে নাচিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তোমার দাদুর মতোই অতিশয় দয়াশীল ছিলেন কিন্তু যেখানে তিনি missionary সেখানে তিনি surgeon-এর মতোই মহেশ ন্যায়রত্নের (বিধবাবিবাহের দুশমন) পা দু খানা কপাকপ্ এম্পুটেট্ করেন। দাদু তো মিশনারি নন। তাঁর তো কোনও বিশেষ মতবাদ নেই। তিনি চান মানুষকে liberal হতে, মনের জানালাগুলো খুলে দিতে, একটু re-evaluate করতে, একটুখানি চিন্তা করতে।

Conan Doyle -এরও প্রায় তাই হয়েছিল— অন্য ভাবে।

Tolstoy -এরও " " " —। এবং দাঁড়াও না, নিতান্ত unexpected কিছু একটা ঘটলে এদেশে aesthetic sense যে রকম নেমে যাচ্ছে তার ফলে humour সম্পূর্ণ উপে যাবে। *গড্ডলিকা, কজ্জলীও* আর কেউ পড়বে না। Blunt লোকের পক্ষে humour serious, serious in humour, humour in serious, কোনওটাই পড়া হয়ে ওঠে না। এমনকি শার্লক হোমস না পড়ে পড়বে মোহন সিরিজ!

এবং শেষ পর্যন্ত লোকে হয়তো বা ব্যবহার করবে একমাত্র চলন্তিকা!

আমি মোর কেটে আশা করতে পারি আমার *দেশেবিদেশে* হয়তো-বা লোকে পড়বে।

তবে East bengal এখনও খানিকটে পদে আছে। সেখানে আরও বেশ কিছুকাল অন্তত *গড্ডলিকা, কজ্জলী* পড়বে। কিন্তু লোক এখনও তাঁর পরের লেখাগুলো পড়ে, যদিও বহু বিষয় typically হিন্দু problems বলে তার perspective পায় না।

Shakespearean dramatist-রা India-তে show দেখিয়ে বলেছিল, 'এখানে বিলেতের চেয়েও আদর পেলুম।' সেটা ইংরেজির বেলা। সেটাও লোপ পাচ্ছে। রাজশেখর কলকাতার চেয়ে বেশি খাতির পাবেন ঢাকায়।

আরও কত কী বলার আছে। প্রচুর, এন্তের, কিন্তু আমার ইতিমধ্যেই প্রাণবায়ু নিঃশেষ।

অত্যন্ত জরুরি চিঠি যেমন 'ফিরোজের ভিসা' renewal, আমার royalty-র reminder বিবিকে ফিরোজের নিতে আসার জন্য এদেশে আসার programme ঠিক

www.pathagar.com

করে দেওয়া,— in the light of পুজোর liquid timing, সেপ্টেম্বর না অক্টোবর— কোনও correspondence-ই করতে পারছি না।

১৬

শান্তিনিকেতন, ১৫।১১ কালীপূজা

ভদ্র,

চিত্ত চুলবুল করছে (পরশুরাম পশ্য!) যে আমি বৃদ্ধ, তায় মফস্বলের লোক, — তুমি চ্যাংড়া, অপ্‌টুডেট শহুরে— তুমি কি না জানতে চাইলে, আমার কাছে, কালো বল্‌পইন্ট কোথায় পাওয়া যায়!!!

গত বছর যখন জর্মনি যাই তখন আমার এক প্রাচীন দিনের বান্ধবী— তাঁর বয়স ৫৬— আমাকে একটি বল্‌পইন্ট কলম দেন। চার রঙের কালি। এবং মেকানিজমটি এমনই চমৎকার যে একটা movement-এই রঙবদলাবদলি হয়। যেমন নীল দিয়ে লিখেছিলে— লালের দরকার হল, সেটা underline করার জন্য— অমনি লালে পুশ্ করলে; সঙ্গে সঙ্গে নীল সুরুত করে উপরে চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে লাল বেরিয়ে এল!! — কিন্তু বিধি বাম, এদেশের শুকনো গরমেই হোক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, সবুজ বাদে তিনটি রঙই গেল শুকিয়ে। বান্ধবীকে বাধ্য হয়ে জানাতে হল, নইলে তিনি ভাববেন, আমি কোনও চিংড়িকে Present করে বসে আছি। বান্ধবী refill পাঠালেন এবং আমার কী বরাত— খামে ছিল কিন্তু পোস্টাপিস সিল মেরে জখম করতে পারেনি, জর্মন ভাষার হিজিবিজি Customs বুঝতে না পেরে চারডবল মাশুলও চায়নি!!

স্টেটসমেনে বিজ্ঞাপনে দেখেছিলুম মাস দুই আগে যে কলকাতায় জর্মন বল্‌পইন্ট এসেছে। খুব সম্ভব Canning Street— মুর্গিহাটা? — না কোথায় যেন। কিন্তু alas! ঠিকানাটা লিখে রাখিনি। এখন কী করি, কও। তদুপরি এ refill এদেশে যে standard ball point বিক্রি হয় তাতে fit করে না।

স্ট্যাম্পের প্রতীক্ষায় রইলুম— বড়দিনের পরে হলেও চলবে।

তুমি কি ভেবেছিলে আমি চারটে কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলুম! হা ধর্ম! ভালোবাসা জেনো। আর জান, কালো রঙটাই চারটের সর্বোত্তম।

আ

১৭

শান্তিনিকেতন,
২৭।১২।৬৩

স্নেহাস্পদেষু,

এখনও কি বড়দিন? আমার দিন তো কেটে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে। এখন আর ফুর্তি নয়— শান্তি। সোম রস এখন 'মঙ্গল' লোকে।

তোমার পরীক্ষা কী রকম গেল? প্রায়ই সে কথা ভেবেছি। লিখি লিখি করে লিখে উঠতে পারিনি।

www.pathagar.com

পরে সবিস্তর—

আ

1) তুমি লিখলে, তোমার কালিটা (ball-point-এর) দিশি। এ-দেশে ও-মাল হচ্ছে কি? আমার মনে হয়, তোমার কালির (কালো) shade-টা lighter. Else it is same staff.

2) এর কালি বন্ধ হলে সেটাকে পুনরায় flow করবার কোনও কল জান কি? স্টাম্প একসঙ্গে এবারণ পাঠাবে? কিস্তিতে ২ কি দোষ?

মদ্যবাদে X'mas হয় না। সেটা ছেড়েছি সেপ্টেম্বর finally.

১৮

১৭।৬।৬৪

ভদ্র,

তুমি যে আমার ওপর অপ্রসন্ন সেটা জলবত্তরলং।[১] কিন্তু কারণটা হয় অতিশয় স্থূল, নয় আমার বুদ্ধি স্থূল— অথবা উভয়ই।

এবারে আমরা ১০৫° থেকে ১১৫°-র কী গেণ্ডেরিই না খেললুম। মাত্র পরশুদিন থেকে খেলা বন্ধ— মন্তিকার্লোতে যে রকম বলে rien ne va plus. আমি রোজই ভাবতুম, এমন মারাত্মক গরমেও আকাশ একটুখানি ঘামে না কেন?

রাজশাহী যাইনি। ফিরোজ গেছে। ১ জুলাই নাগাদ ফিরবে। এইবারে শান্তিনিকেতনে তার Sunday best পরবে। তুমি একবার এসো না।

আমি মাস কয়েক খুব ভুগলুম। অনিদ্রা। এখন আগের চেয়ে ভালো।

আশা করি কুশলে আছ।

আঃ

আঃ

১৯

4, Andrews Palli,
৪ দীনবন্ধু পল্লী,
ঠিকানায় লিখতে হবে না—
যদি কখনও আসো তার জন্য;
৩০।৬।৬৪

ভদ্র,

অপরাধ নিয়ো না। আমি গত পুজো থেকে অসুস্থ। ফলে আমি এখানে নানাবিধ পুস্তক, ডাইরি ইত্যাদির মধ্যিখানে বিরাজ করতুম সেটা ত্যাগ করে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছি ও রাধাকৃষ্ণের (কৃষ্ণণের) উপদেশমতো তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছি— অর্থাৎ গোটা চারেক বালিশে ভর করে সামান্যতম লেখাপড়া করি। তাই ডাইরিটি কাছে ছিল না বলে তোমার জন্মদিন— alas!— miss করি।

১. বোধহয় অনেকদিন চিঠি লিখিনি বলে।

www.pathagar.com

তোমার দু খানা খামই পেয়েছি। ফিরোজ ফিরে এলে তাকে দেব। সে দমদমায় নামছে ৫।৭।৬৪ সকালের দিকে। Her Majesty's Service থেকে কট্টর-কঠিন ফরমান এসেছে, আমি কলকাতা গিয়ে যেন তাকে ইস্তিক্‌বাল্ (receive) করি। অতএব আমি তিন কিংবা চার কলকাতায়। তুমি চারের সাঁঝে (কিংবা তিনের) যদি ফোন কর, নিরালা, Tel 473419 or/and 26/1 Dover Rd, Tel 475969 (দুটো বাড়িই কাছাকাছি) তবে খবর পাবে। ইস্কুল খুলছে ২।৭।৬৪ অতএব ফিরোজকে নিয়ে ৫।৭।৬৪ই রওনা হতে হবে।

বাদবাকি কলকাতা এলে।

প্রীতি জেনো।
(সৈ মু আলী)

২০

শান্তিনিকেতন
১২।৭।৬৪

স্নেহের দীপংকর,

আমার তো পাঁচ কলম ভোঁতা। তুমি কোন্ কালো কালিটা ব্যবহার কর জানিয়ো তো? সেটাও তো খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না। আমি যে ball point কালো ব্যবহার করতুম, সেটা ভি ফুরিয়ে গিয়েছে— refill এদেশে পাওয়া যায় না— কাজেই তুমি আর শোক করো না। Joneses donot have it either— যে কত বড় সান্ত্বনা সেটা বিঘ্নসন্তোষী হলে পরে জানাব।

আমি তোমাকে শুধিয়েছিলুম— এবং তুমি আমার প্রশ্নটি বুঝতে পারনি— যে, কোন ball point কলমের barrel-এর কালি হাফ ভরা থাকা সত্ত্বেও যদি সেটা শুকিয়ে যায়, অর্থাৎ flow বন্ধ হয়ে যায় তবে কি এমন কোনও substance আছে যেটা তার 'পশ্চাদ্দিকে' ভরে দিলে তারই চাপে, কিংবা glycerine জাতীয় কোনও solvent কিংবা/এবং অন্য কোনও-কিছু জান কি, যার ফলে ফের flowটা সজীব হয়। Refill-এর প্রশ্নই ওঠেনি। অর্থাৎ সেই 1/10np-র barrl-টা যদি খালিই হয়ে যায়, তবে সেটা refill করতে যাবে কে?— অবশ্য সেই measure-এর refill size যদি এদেশে না থাকে তবে অন্য কথা।

আমার হয়েছে কী, কোনও জিনিস মনে থাকে না— লেখা-পড়ার কথা হচ্ছে না। এই তো, কিছুতেই মনে পড়ছে না, তোমার পত্রের উত্তরে পূর্বেই বলেছি কি না, আগে আমি একটা আরাম চেয়ারে দিনের ১৫।১৬ ঘণ্টাটাক কাটাতুম। চতুর্দিকে হরেক রকম শেল্‌ফ্ ছিল। তারই উপর একখানা বইয়ে তোমার জন্মদিন— inter alia — অর্থাৎ ফিরোজ ভজু etc টোকা ছিল। সেটা মাঝে মাঝে দেখে নিতুম। গত ব্যামো থেকে এখন দিনের ২৩ ঘণ্টা কাটে বিছানায়। সে শেলফগুলো দূরে পড়ে আছে। তাই তোমারটা miss করেছি; যেমন ভজুরটা।

এবার ভাবছি ফিরোজকে তোমার বাড়িতে ২/৩ দিনের জন্যে পাঠাব। বড় হয়ে সে যখন কখনও সখনও-কলকাতায় আসবে, যেন তোমার খোঁজ নিতে পারে।

আমি মে মাসে ১৯ দিন কলকাতায় ছিলুম— চিকিৎসাধীনে। পাষণ্ড ডাক্তার কারওর সঙ্গে দেখাটি পর্যন্ত করতে দেয়নি— বাড়ির লোক ছাড়া। তার অবশ্যি ইচ্ছা ছিল আমি যেন হোটেলে উঠি। Bar-এর ভয় ছিল না। সে কথা ডাক্তার জানত। কিন্তু তা হলে ১৫০০

www.pathagar.com

নাগাদ খর্চা হত। সেটা যে সওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু Great Eastern-এর খাওয়া দিন পাঁচেক পরেই আর রুচে না। তদুপরি, আমি ছিলুম— অন্তত কিছুটা পথ্যিতে।

— রবীন্দ্রনাথের গুটিকয়েক কবিতা পেয়েছি, jilt[১]-ঠিকানা তবে তারই কাছাকাছি। শুনেছি বৈজ্ঞানিকরা বলেন একেবারে 'নাস্তি' থেকে 'অস্তি' হয় না— ভারতীয় দর্শন তো বলেই, এবং commonsense তো বলেই। তা হলে প্রশ্ন, সেটা রবীন্দ্রনাথ দেখলেন কোথায়? পদ্যে? তা হলে অত vivid হয় কী করে? skill ছিল বলে? মন সাড়া দেয় না। তিনি তো চিরকাল থাকতেন ivory tower-এ। আমরা যে অর্থে অন্তরঙ্গ সখা বুঝি তাঁর তা কখনও ছিল না। জমিদারি করার সময় অতখানি tower-এ থাকা যায় না বলে জীবনের কিছুটা দেখেছেন। কিন্তু মোটামুটি যে-সময় থেকে এখানে বাসা বাঁধলেন? ছোট মেয়ে রাণীকে আলমোড়া নিয়ে যাওয়া আসা— ওই ধরনের ছিটোফোঁটা পথের বিপদ চতুর্দিকে— একে ওকে ধরাধরি।....

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যার চতুর্দিকে তখন ধুন্দুমার। বেহ্মজ্ঞানী ফেহ্মজ্ঞানীতে ছয়লাপ। ওদিকে হেঁদুরাও রয়েছে। রামানন্দ আসছেন (অবশ্য তিনিও বৃদ্ধবয়সে 'হিন্দুমহাসভার' প্রেসিডেন্ট হয়ে 'পূর্ব পাপ' ক্ষয় করছেন) বেহ্মমন্তর পড়াতে ওদিকে হেঁদুরা এনেছে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে। আমি থাকলে নিশ্চয়ই তসবি হাতে কলমা শুনিয়ে দিতুম। যাকগে! এসব বলো না। দু জাতে মিলে আমার মুণ্ডুটি চিবোবে।

আলী—

২১

২৪/৫।৭।৬৪

স্নেহের দীপংকর,

তোমার মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না, এ তো ভালো কথা নয়। তাঁর বয়েস কীই-বা হয়েছে! ফিরোজের মায়ের চেয়েও ছোট; অর্থাৎ ৪৫। তারও কম হতে পারে। দেখায় আরও কম। আমি কী বলি, শোনো। মনটাকে তাঁর কী প্রকারে প্রফুল্ল রাখতে পার তার জন্য deliberate throughout well-planned চেষ্টা দাও। বিলাতের বড় ২ হাসপাতালে এখন প্রত্যেক ward-এ একজনের ডাক্তার থাকে, specially to relieve pain & generate cheerfulness— সে রোগের treatment আদৌ করে না। এদেশের সর্বশাস্ত্র আছে, 'অপ্রসন্ন জনের কোনও সফল সিদ্ধি হয় না।' এই যে যোগীদের (modern) photo দেখ, পুঁইডাটার মতো কাষ্ঠকঠিন শুষ্কমুখ— এটা হতেই পারে না। তার মুখ থেকে প্রসন্নতা ঠিকরে পড়ার কথা। মার্কিন জাতের প্রধান গুণ তাদের চিরপ্রসন্নতা : হার মানে না, বলে ' Gee let's try again.'

কই, তোমার সেই সস্তায় inserted letter — অর্থাৎ bearing post-এর চিঠি তো এল না? সেটাতে বুঝি ঠিকানা দিয়েছে, "Ali, Heaven knows where." Sender-এর

১. জানতে চেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথ কখনও jilt হয়েছিলেন কি না। না হলে কী করে ও রকম প্রাণের ছোঁয়া মাখানো বিরহ বেদনার কাব্যসৃষ্টি সম্ভব।

www.pathagar.com

ঠিকানা না থাকলে পুরো ঠিকানায়ও চিঠি আসে না, থাকলে স্বল্প ঠিকানায়ও আসে— বেয়ারিং চিঠির বেলা।

... ...

জর্মনে বলে good nerves কারে কয়? যে যত বেশি disorderliness সইতে পারে। তোমার ঠাকুর্দা[১] disorderliness সইতে পারতেন না। তাই ভুগেছেন। তুমি এই বয়সেই সেটা এত বেশি রপ্ত করে বসে আছ যে, তোমাকে অনেক দুঃখ সইতে হবে। আমিও সয়েছি। এখন অনেকখানি চেপে যাই।

২২

4 Andrews, Santiniketan,
July, 29th, 64.

ভদ্র

আমার মতো বুড়ো-হাবড়াদের সঙ্গে লেখালেখি করার ওই তো বিপদ। যাই বল না কেন, বুড়ো বলে 'ওসব জানা কথা।'

রাজার প্লট্‌টা জাতক থেকে নেওয়া। কিন্তু ঠাকুর এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। রাজা= God, কেউ তাকে দেখতে পায় না। শুধু যে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে— নাস্তিকদের নিন্দাবাদ না শুনে— এস্থলে রানি অর্থাৎ ভগবদভক্ত (খ্রিস্টও বলেছেন বোধহয় মোটামুটি Blessed are those who donot see, but believe!) তার কাছে রাজা = আল্লা অন্ধকারে— হৃদয়ে হৃদয়ে, হৃদয়ের অন্তস্তলে দেখা দেন। আরও মেলা রূপক আছে, আমার মনে নেই। আসলে acting-এর সময় double meaning, অর্থাৎ face meaning and allegorical meaning দুটো সকলে বের করতে পারেন না। অলঙ্কারশাস্ত্র বলেন, নাট্য এমন হবে যে কেউ যদি allegory-টা আদৌ ধরতে না পারে, তার কাছেও যেন নাট্যটি charming মনে হয়। আবার ভক্তজন হয়তো শুধু allegory-টাই দেখল— পার্থিব দিকটা আদৌ লক্ষ করল না— তার কাছেও যেন নাট্যটি equall charming মনে হয়। এবং প্রকৃত গুণীজন দুটোই চাখবে। তবে সার্থক acting very much, therefore, depends on how the actors express, pronounce their speech. তোমার মতো, avarage, normal সুবুদ্ধিমান যখন গোপন অর্থের কিছুটা আমেজ পেয়ে হাতড়ে মরেছ, তখন বুঝতে হবে ড্রামাটি দুই অর্থের মাঝখানে লিক্‌লিক করে মাঠে মারা গ্যাছেন। তুমি যদি allegory-র কোনও গন্ধটুকুন পর্যন্ত না পেয়ে শুধু face value-টুকুতেই আনন্দ পেয়ে বাড়ি ফিরতে, তবু বলতুম নাট্যটি সার্থক অভিনীত হয়েছে।

কীর্তনের বেলাও হুবহু তাই। রাধার বিরহ-বেদনা যদি যুবক-যুবতীর প্রেম অর্থে নাও তবে কিস্‌স্যুটি আপত্তি নেই। যদি বল, 'আহা, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কদম্ববন-বিহারিণী বিরহিনী শ্রীমতীকে'— বিলকুল দুরস্ত। পক্ষান্তরে যদি বল, 'এমন প্রেম,

১. 'ঠাকুর্দা' ভুলে লিখেছেন। বলতে চেয়েছেন 'দাদু' (আসলে আমার মায়ের মাতামহ, রাজশেখর বসু)।

www.pathagar.com

এমন ব্যাকুলতা, এমন একাগ্রতা তো মানুষের তরে মানুষের হতে পারে না— এ তো আমার কাছে অন্য ভুবনের রূপরসগন্ধস্পর্শ এনে দিচ্ছে— ' সে-ও অত্যুত্তম। আর দুটোই যদি পাও, simultenously তবে তুমি সুরসিক,— কীর্তনিয়া সার্থক। এ দুনিয়াটাতে এখন আর কীর্তনিয়া নেই। ব্যাটারা শুধু 'আখর' সারে, টেকনিকল skill দেখায়, মৃদঙ্গের খচখচানি শোনায়। আমি কেত্তন শুনতে যাইনে। ওই একটা জিনিস বড্ডই miss করি।

আ—

২৩

১০/৮/৬৪

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার insured letters এখনও পাইনি। তবে এই ভেজাল insurance-এর অপর একটা দোষ, দেরিতে আসে। তবে tempo ওদের bookpost-এর পিছনে। Bearing এবং Express দিলে কী হয়, জানিনে। তবে সেটা হবে ছাগলকে insure করা হাতির দাম দিয়ে। ভুল বললুম, সেটা হবে, ছাগল হারিয়ে গেলে হাতি মানত করা!

Bearing ছিঁড়ে ফেলা গ্রামাঞ্চলে প্রযোজ্য। তিন মাইল ঠেঙিয়ে ওটার জন্য কয়েক পয়সা রোজগার করতে পিয়ন নারাজ। সচরাচর তারা হাটবারে ওই গাঁয়ের কাউকে (paid) চিঠিটা দিয়ে দেয়। সে লোক ও bearing-এর পয়সা দিয়ে নেবে কেন?

Express চিঠির বেলাও তাই। বিশেষ করে কলকাতায়। গোটা দশেক চিঠি নিয়ে পিয়ন বেরুল। একটা পড়েছে ধরো একটু বেশি দূরে। সেটা সে ছিঁড়ে ফেলে। Ordinary letter-এর বেলা তা হয় না। কারণ তার beat-এর শেষ পর্যন্ত দু একখানা চিঠি থাকেই। তাই আমার কলকাতার বন্ধুরা পই পই করে বলেছেন, express যেন না লিখি। যদি লিখি তবে সঙ্গে যেন আরেকখানা plain লিখি। যেরকম Voltaire বলেছিলেন, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় বইকি! তবে to make sure, আগে ঠেসে arsenic খাইয়ে দেওয়াই ভালো।'

তোমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। 'Disorderliness সইতে পারার ক্ষমতাকে good news বলে' — এটা একটা general principal. আমার চিঠি disorderly ছিল বলে বলিনি।

A propos আমার চিঠি, সেই general principal-টা বাতলে ছিলুম।

তোমার মাতা 100% না হলেও 99% wrong![১] আমি নিজে 'দেহলী বাড়ির' নিচের পাশের 'নূতন বাড়িতে' ঝাড়া একটি বছর ছিলুম। রাত্রের অন্ধকারে কবিকে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে (সুর এবং কথা একসঙ্গে) এবং মাঝে মাঝে থেমে থেমে গিয়ে সেটা ওই অন্ধকারেই কাগজে টুকে নিতে (এটা inference— কারণ অন্ধকারে তাঁর গলা শুনতুম, কিছু দেখা যেত না) দেখেছি; rather শুনেছি। পরের দিন সকালেই (সম্ভব না হলে বিকেলে) তিনি দিনুবাবুর সঙ্গে সেইটি গুনগুন করে গেয়ে তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের ডজন

১. আমার মা হঠাৎ একদিন বলেছিলেন সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর আসলে দিনু ঠাকুরের দেওয়া। চমকে গিয়ে এর সত্যতা জানতে চেয়েছিলুম।

www.pathagar.com

ডজন গান একই সুরে আছে। বিশেষত বাউলে। কিন্তু প্রায় প্রতি গানেই কিছু না কিছু আচমকা twist থাকে; কিংবা তালে আড়ি থাকে (আপাত 'দৃষ্টিতে' বেতালা— যার জন্য তাঁর বদনাম, তিনি বেতালা) তাই দিনুবাবুকে সেটা রপ্ত করতে হত। দিনুবাবু না থাকলে প্রাচীন কালে অজিত চক্রবর্তী। একদিন তিনিও ছিলেন না, তখন বারো বছরের সুধীরঞ্জন দাশ (তস্য পুস্তক পশ্য)। শুনেছি very very rarely indeed, দিনুবাবু change in a very minor point suggest করতেন। ব্যস। দিনুবাবু এখানে আসেন about 1907. তার পূর্বে কে ছিল? জ্যোতিবাবু ২০/২৫ বৎসর রবিকে 'চরে খা' বলে ছুটি দিলেন। মধ্যিখানে, কে, কারা? বিশেষত এই ভারতের tradition— যে কথা রচে সে-ই সুর দেয়। রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, জ্যোতিঠাকুর, নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, হাসন রাজা, সত্যেন ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, ব্রাহ্মসঙ্গীতে গণ্ডাগণ্ডায়— কত বলব? মাথা ঘামিয়েও exception খুঁজে পাচ্ছিনে। এবং যেখানে অন্যে সুর দিয়েছে— গোটা দুত্তিন by পঙ্কজ, শান্তি ঘোষ, পূর্ব যুগে জ্যোতিঠাকুর। সে তো পষ্টই mention করা আছে। জানো, তেজেশচন্দ্র সেন নামক একটি লোক এখানে ৫০ বৎসর বাস করেন। এঁর নাম কেউ করে না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে শেষ রোগশয্যায় ইনিই তাঁর সেবা এখানে করতেন। আমি অন্তত হলপ খেতে রাজি আছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেবা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। যদিও কেউ তাঁর নাম করে না। ইনিই আমার মতে রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন। কক্‌খনও কাছে যেতেন না, না ডেকে পাঠালে। তাই নিয়ে কবি বিস্তর অভিমান করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল অচল। আমার সামনে বছর চারেক পূর্বে, কে যেন এই প্রশ্নটি (!) তোলে। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে যা বলেন, তার সঙ্গে আমার বক্তব্য মেলে। আমি supplementary শুধোই, তিনি কি কখনও দিনুবাবুর কোনও suggestion accept করেন নি? পরিষ্কার বললেন, না। উনি করেননি। দিনুবাবুর চলে যাওয়ার পর এখানে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়। যাদের হাতে দিনুবাবুর কাজ পড়ে তাঁরা ছিলেন most thoroughly incompetent। ওই finer twistগুলো miss করে যেতেন। যার কথা পূর্বে বলেছি। তার পর আরম্ভ হয় regular জোচ্চুরি। শার্ঙ্গদেব জানে।

আমি এখন কিছুদিন চিঠি লেখার পাট তুলে দিচ্ছি। তুমি তোমার মনে প্রশ্নের উদয় হলে টুকে রেখো। দেখা হলে উত্তর দেব। বলা সোজা; লেখা কঠিন। যে কারণে আমি controversy-তে ঢুকি না। Love & bliss!

আ

২৪

C/o Inspectress of Schools
P.O. Ghoramara. 22. 10. 64

স্নেহের দীপংকর,

বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ কর ও আশীর্বাদ জেনো। তোমার মাসীরও আশীর্বাদ জেনো। ফিরোজ ভজু ব্যাপারটা এখনও কী ঠিক বুঝতে পারেনি। তোমার চিঠি পেলুম। ওরা স্ট্যাম্প নিল।

www.pathagar.com

এ বাড়িটার দশ হাত পরেই বিরাট পদ্মা। পাড়াটা উঁচু নয় বলে শহরের সবকটি প্রতিমা বিসর্জন হয় এখানে, মেলা বসে, তেলেভাজার গন্ধে আমার ঘরটা ম-ম করে। এ বাড়ির বারান্দায় বসে পদ্মার যে দৃশ্য দেখা যায় সেটি দেব-দুর্লভ। এর বর্ণনা আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পদ্মাপারে, পদ্মার বুকে বহু বৎসর কাটিয়ে পারেননি। এর এমন একটা bewildering grandeur আছে যেটা মানুষের চৈতন্যকে মোহাচ্ছন্ন করে দেয়। এর সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা যায়, শুধু এই বিরাট grandeurটা কিছুতেই impart করা যায় না। আর পাণা যায় না,— যখন রাতদুপুরে নিরন্ধ্র নৈস্তব্ধ্যের মাঝখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবে চাঁদের আলোয় মাখা পদ্মার জল, অনেকদূরের চড়া, তারও অনেক দূরে চরবাসীদের দু একটি ক্ষীণ আলো— অন্ধকার রাত্রে সেগুলো তারা না প্রদীপ ঠাহর করা যায় না— এবং তার পর যেন কুয়াশার যবনিকা। দিনের বেলা সেখানে দেখা যায় একটি আসমানি রঙের খেলা-- যার নাম india; এপার পাকিস্তান। আর সমস্তটা সামনে বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অর্ধ-চন্দ্রাকার-- দুপুররাত্রে সাহারায় যে রকম দেখেছি। কী যে গভীর রহস্য, কেমন যেন আতঙ্কে ভরা। এই রহস্য, এই আতঙ্ক কিছুতেই কলমের ডগার একফোঁটা কালিতে প্রতিবিম্বিত হতে চায় না। গোষ্পদ যে-রকম without effort অনন্ত আকাশ বিম্বিত করে, কলমের কালির ফোঁটা তেমনি পারে না কেন?

তুমি তোমার পরীক্ষা নিয়ে যেরকম fuss করছ, সেরকম প্রথম গর্ভবতী সন্তান প্রসবের সময়ও করে না। আমার হাসি পায়, তার পরের কথা ভেবে। ধর তুমি 1st class-ই পেলে। তার পর প্রফেসরি পেলে। তার পর— যে কোনও কারণ বা কারণ সমন্বয়ে— হলে thoroughly disgusted তখন বললে, দুত্তোচ্ছাই, কেনই-বা মরতে 1st হলুম। IInd class পেলে এদ্দিনে অন্য কোনও ধান্দায় ডুবে গিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি আরাম পেতুম।

জীবনের big gambling battle-এর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছ, এই M.Sc. পাসটা যেন one mighty big stake! Alas! It is one of the smallest. হাতের সামনে আপন হাতের বন্ধ মুষ্টি বিরাট হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।

আসল বোনা পরীক্ষা পাশের পর আরম্ভ হয়। এতদিন সামনে ছিল একটা সুনির্দিষ্ট aim— এর পর সামনে বিরাট ব্লাঙ্কো void! ওই সামনের পদ্মাটার মতো। ওপারের নীলাঞ্জন রেখাটিও দেখা যায় না। কিংবা তার পরে ঢোকো জাঁতিকলের ভিতর along with millions & millions— loossing completely all your indentity! স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের ভিতরও যেটুকু individuality ছিল— for good or bad— সে-ও তখন কদ্দুর!

And perhaps it is good so. লাওৎসে বলেছেন, আর পাঁচজনের যেটা নেই সে রকম কোনও বৈশিষ্ট্য যদি তোমার থাকে, তবে তোমার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য সেটাকে প্রাণপণে লুকিয়ে রাখা। নইলে সবাই মিলে তোমাকে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!

আমি বুঝি একটি কথা : a steady income from ancestors আর ঘরের এক কোণে বসে পুতুল সাজিয়ে, খেলনা গড়ে জীবনটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। সেটা পছন্দ না হলে, আর কাঁড়া কাঁড়া foreign exchange থাকলে round the world trip-এর কোনও একটা জাহাজে বাকি জীবনের জন্য টিকিট কাটা। A bigger merry-go-round, round the world.

www.pathagar.com

আশা করি এর থেকে খাঁটি তত্ত্বটি বুঝে যাবে।
পরিবারস্থগণকে সেলাম— বিজয়ার— জানিয়ো।*

আ

২৫

25.3.65

45. Quarters, Andrews Palli.
দীনবন্ধু পল্লী। আমি ইংরেজিতে লিখি Andrews Shire,
বাংলায় দীনবন্ধু বস্তি। এটা ঠিকানায় লেখবার দরকার নেই। যদি কখনও আসো তার জন্য। ঠিকানা পূর্বের মতো;
Plain শান্তিনিকেতন।

স্নেহের দীপংকর,

কোনও খবর নেই। বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতই কম যে তোমার শেষ পরীক্ষা কবে হল, তার পর কী হল কিছুই জানিনে। আমাদের common enemy-ও কেউ নেই যে অন্তত দুঃসংবাদটাও জানায়। আর friends সংসারে কম; common friend-এর কথাই ওঠে না। তবু mood-এ থাকলে খবর দিয়ো। পরীক্ষাতে ভালো ফল করে থাকলে ভালো, না করে থাকলে আরও ভালো। কেন, দেখা হলে বুঝিয়ে বলব। এত বড় gamble পৃথিবীতে মাত্র আর একটি আছে। বিয়ে। It is the only gamble which humanity has discovered where both parties can loose.

তুমি এতদিন ফিরোজকে স্ট্যাম্প দিয়েছ; এবারে আমি তোমাকে মোক্ষম এক সেট পাঠাচ্ছি। আশা করি পছন্দ হবে। যাদের ছবি তারা Hitler-কে মারবার চেষ্টা করেছিল, কিংবা ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে Sophill Scholl অতি অদ্ভুত মেয়ে ছিল। তার আন্দোলনের নাম ছিল White Rose। মেয়েটিকে জেলে এমনই অত্যাচার করেছিল যে ক্রাচেস-এর উপর ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফাঁসির দিকে এগোয়। সমস্ত জর্মনি যখন ভয়ে স্তব্ধ তখন মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বেআইনি পত্রিকা নির্ভয়ে বিতরণ করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কতই-বা বয়েস ছিল তার। জর্মনরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তার জীবনী লিখেছে, এবং এখনও তার জীবন নিয়ে special research-এর ব্যবস্থা আছে।

---

* এই চিঠির প্রথমাংশ এক অকল্পনীয় কাব্য।
পরের অংশে হঠাৎ প্রখর বাস্তবে এসে তার পর্যালোচনা করেছেন তাঁর আকাশ-ছোঁয়া পণ্ডিত্যের দর্পণে।
এবং সমাপ্তি এমনই anti-climax-এ, যার একমাত্র পরিচয়, Logo— মুজতবা আলী।

www.pathagar.com

আর যে বোমাতে হিটলারের Conference room went sky high killing outright nearly 1/2 dozen সেটা টেবিলের নিচে রেখেছিলেন Stenffenberg. যুদ্ধে ইতিপূর্বেই তাঁর একখানা হাত ও একটি চোখ গিয়েছিল। বোমার পিন খোলার জন্য— এক হাতে— তাঁকে একটা বিশেষ opener যোগাড় করতে হয়েছিল।

Dem deuponer etc অর্থে :

On the anniversary on 20th July of German Resistance.

আমি এদের শ্রদ্ধা করি কিন্তু antinazi— ইরেজের মতো— নই বলে মাতামাতি করিনে।

ফিরোজ তার album-খানা ছোট ভাই ভজুয়াকে দান করেছে। এখন তাবৎ ইষ্টাম্বো একটা থামে ভরে রাখছে। কলকাতায় নাকি album পাওয়া যাচ্ছে না। আমি Newman-কে একটা চিঠি লিখেছিলুম। সস্‌রেলোগ (হিন্দিতে কটুবাক্য বলতে হলে 'শ্বশুরেরা' বলে) উত্তরই দিলে না। তুমি কোথাও পেলে তাদের ডাক খরচাটা (only on this condition) দিয়ে আমাকে V.P.P করে পাঠিয়ে দিতে বলো। নইলে হয়তো ফেরত যাবার ভয়ে পাঠাবে না। কিন্তু এই স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে ও চিঠি লিখতে বসিনি। কথায় কথায় এসে গেল যখন তখন সঙ্কোচ আর করলুম না।

তোমার পিতৃদের মাতাঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার জানিয়ো।

একশো বছর আগে সোনারবেনেরা যখন গঙ্গার পারে বাগানবাড়ি করতে যেত তখন সেখানকার পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে 'কাট্যা ফালাইলেও' কথা বলত না, পাছে কীর্তিকলাপ শহরে পৌঁছে যায়। মিত্তির সেই তোপা ঐতিহ্যটি বেড়ে বজায় রেখেছে। আমার সন্ধান করে না। ওকে বলো, আমি ভর্সা দিচ্ছি।

আশীর্বাদ জেনো: আ

উল্টোপিঠের ছবিটা Fusiang Island-এর Sylt নামক জায়গায়— Danish-German বর্ডারের কাছে। এদের ভাষা bridge between English & German. Philologist-দের চোখের মণি ভাষা।

২৬

শান্তিনিকেতন
৬।৪।৬৫

বাবাজী,

চেখফের রুশ থেকে অনুবাদ করতে কোনও বাধা নেই; কারণ তিনি গত হয়েছেন ১৯০৪। কিন্তু যে লোকটি ইংরেজি অনুবাদ করল, তার ইংরেজি থেকে ফরাসি বা বাংলা অনুবাদ করলে তার Copyright transgress করা হয়। অবশ্য আদালতে তার পক্ষে সেটা প্রমাণ করা সুকঠিন। কিন্তু তার অন্য Protection-ও আছে— অর্থাৎ তুমি তার ওই ইংরেজি অনুবাদ তোমার কোনও anthology-তে ছাপাতে পারবে না, ড্রামা হলে act করতে পারবে না, কিংবা এমনি ছাপিয়ে (বড় বই হলে) বেচতে পারবে না।

www.pathagar.com

Copyright 1914 অর্থ, বই ওই সময়ে বেরোয়, কিংবা Scribner অন্য প্রকাশকের কাছ থেকে যদি ওই বছরে copyright কিনে থাকে তবে সে-সময় থেকে তার copyright. কিন্তু তোমার খুঁজে বের করা উচিত এ-দেশে কোনও লেখকের বই ক-বছর পরে অনুবাদ করা যায়। আমার যতদূর জানা, বই প্রকাশের ২০ বছর পরে (এটা maximum. কোনও কোনও দেশে ১০ বছর) অনুবাদ করা যায় even if the author is alive at that time. এদেশে বিদেশি কোনও প্রকাশক যদি মোকদ্দমা করে তবে তাকে এদেশের আইন মানতে হবে— তার দেশের নয়। অতএব, তুমি নির্ভয়ে অনুবাদ করতে পার। কারণ এদের সক্কলেরই বই, বা তার ইংরেজি অনুবাদের পর ২০ বছর কেটে গেছে।

পার যদি Encyclopaedea Br.-তে copyright প্রবন্ধটি পড়ে নিয়ো।

তুমি দেখছি এসব চিন্তা করে করে মেঘে মেঘে বেলা ঘনিয়ে আনবে। নিতান্ত মাসিক সাপ্তাহিকের মাল বাদ দিয়ে মোটামুটি যে-কোনও মাল অনুবাদ কর। অত ভাবনা কিসের!

U.S.A-এর সঙ্গে আমাদের বোধহয় কোনও চুক্তি নেই। অন্তত এক কালে ছিল না। Russia-র সঙ্গে এখনও নেই।

আশীর্বাদ জেনো। আ

"ভারতকোষ" নতুন যে 'বিশ্বকোষ' বেরিয়েছে তাতে খুব সম্ভব 'কপিরাইট' covered হয়েছে। থাকলে তাতে ভারতীয় copyright-এর আইন থাকার কথা।

পুরনোটাও কাজে লাগতে পারে।

২৭

C/o Dr. Samar Chowdhury
"Merryland" Nursing Home
P 46 C.I.T. Road Scheme L 11
Calcutta-14
April 14/15-4-66

ভদ্র,

সব মালই[১] পেয়েছি। কিন্তু যবে থেকে আমরা যে "দিল্লি দূর অস্ত্"— সেই দিল্লিতে থানা গেড়ে হুঙ্কারিয়া বেরোলুম, "লাহোর দূর নিস্ত্"— তবে থেকে ফিরোজ-ভজুকে এ-সব অমূল্য সরেস চিজ পাঠাই কী প্রকারে? বস্তুত মাসদুই পরিপূর্ণ নীরবতার পর বাবাজিদ্বয়ের পত্র পেলুম, জর্মনিতে প্রতিষ্ঠিত এক চেলা মারফৎ! What a short cut![২] কে বলে নাক ঘুরিয়ে দেখানো একুশে আইনে মানা? আর জর্মনরাই বলে, "Warum einfach machen wenn es kompleizierd geho?" Why make it simple, if it can be made complicated?

১. ছেলেদের জন্যে ডাকটিকিট।

২. ১৯৬৬-র যুদ্ধের ফলে রাজশাহী থেকে শান্তিনিকেতনে চিঠি বন্ধের জন্যে তা ঘুরে আসতে হয়েছিল জর্মনি হয়ে।

www.pathagar.com

উপরের ঠিকানায় আছি সাতিশয় acute তথা chronic অনিদ্রা ম্যারামতীর তরে। But alas, no visitors, no phones, not even mails without censoring! Voita—lala, say the Franc, ais!

মিত্তিরকে[৩] 'বলো, এটা তো সরল। প্রথম করে এল 'বাখ্-এর etc etc...' তখন শব্দটা যে Bach, Bache ('বাখে') নয় সেইটে বোঝাবার জন্য লিখলুম 'বাখ-এর'। তার পর প্রতিবার 'বাখ-এর' লেখার কী প্রয়োজন? 'বাখের' লেখাতে বাধা কি?

এতসব সরল বস্তু যদি মিত্রাদি মিত্রের মতো সুবুদ্ধিমানরা না বোঝেন তবে লেখা চালু রাখি কোন্ ভর্সায়?

আজ থাক্ 'নারদে'[৪] সঙ্গে ভেট হলে আমার বোহৎ বোহৎ সালাম— তসলিমাৎ জানিয়ো।

শুনতে পেলুম পূর্ব পক্কে প্রতিষ্ঠিত নব Harrow-Eton-এ ফিরোজভজৌ পুরোপাক্কা residential রূপে প্রবেশ করেছেন— দুজনাই test-এ প্রথম হবার পর। তোমার মায়ের দোস্তনীটি বড্ডই একা পড়ে গেল। কিন্তু মেয়েটার সর্ববিশ্ব ওই দুটো মর্কটকে নিয়ে।

Love & blessings
সৈয়দ

২৮

১

C/o Mrs. R. Ali,
Inspectres of Schools
ফুটকি পাড়া
Po. Ghoramara, Rajshahi
East Pak, Dec. 25th 66

স্নেহের ভদ্র দীপংকর,

অনেক কাল তোমার কোনও খবর নিতে পারিনি।

এ বছরটা আমার আদৌ ভালো কাটেনি। দু দুবার নার্সিং হোমে ঢুকেছি। তবে সিংহের বিবর হতে দিনি সেই 'হোম'-কে— যদ্যপি একথা অতীব সত্য যে সেখানে বড় নিশ্চিন্দি কাটিয়েছি। ডাক, ফোন, ভিজিটর তিনই ছিল সখ্ৎ বারণ।

এক মাসের ম্যাদে হেথায় এসেছি— ডাক্তারেরই আদেশে।

তোমার মাতৃর সখী পুত্রদ্বয়সহ সানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। তারা উভয়েই থাকে হস্টেলে। রোজার পাঁচ সপ্তাহের ছুটিতে দ্যাশে ফিরেছে। যদিও তাদের residential school (ইটন হ্যারোর হনুকরণে নির্মিত) মাত্র ১৫ মাইল দূরে।

কী জানি কী হয়েছে— বোধহয় nerves-এর ব্যাপার— একটি হরফ তক্ লিখতে ইচ্ছে করে না। প্রবন্ধাদি তো ন-সিকে শূকর-গো মাংস। তথাপি যখন আমার-আনা, তোমার-দেওয়া

৩. মিত্তির— আমার পিসতুতো ভাই, দর্জিপাড়ার অনিল মিত্র।
৪. যতীন্দ্রকুমার সেন।

www.pathagar.com

first day cover-গুলো বাবাজি ভজুরামকে দিলুম, সে সোল্লাসে একখানা অত্যুত্তম stamp তোমার তরে দিলে।

বু আলী সিনা, আবু সিনা Advicenna (লাতিনে আভিচেন্না; আভিসেনা উচ্চারণ) ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত বাগদাদে। তিনি তাঁর গ্রন্থে চরক সুশ্রুত ইত্যাদি উত্তমরূপে ব্যবহার করেছিলেন— on the foundation of Greek medicine which the Arabs learnt from the Jews. দু শো বচ্ছর আগেও এঁর বই ইয়োরোপীয় Medical College মাত্রেই পড়ানো হত। গজনির মাহমুদ এবং তাঁর সভাপণ্ডিত অলবিরুনি ছিলেন তাঁর সমসাময়িক।

তোমার মাতাকে ফিরোজ-ভজুর মা'র ভালোবাসা দিয়ো, তোমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি আমরা উভয়ে।

সৈ. মু. আলী

২

বিবর সম্বন্ধে।

বিভারলি নিকলস, মিস মেয়ো ইত্যাদির পলিসি ছিল মার্কিনি খবর-কাগজদের :— Kick up Hell, & Sell!

ভয়ঙ্কর কুৎসিত বীভৎস লেখো, কিংবা অথবা কোনও গাড়লস্য গাড়ল দেশ বা জাতিকে গালাগাল দাও। গাড়ল ক্রিটিকরা ভায়োলেন্টলি রিঅ্যাক্ট করবে, ফলে গাড়লতররা বইটা কিনবে; তোমার দু পোসা হবে। আমি এ পলিসির নিন্দা করিনে, কারণ টাকাই যদি কামাতে হয় তবে সেখানে মরালিটির প্রশ্ন ওঠে না— মেজর বারবারা (বার্নার্ড শ) ও চার্লির মসিয়ো ভের্দু পশ্য। তবে এর ভিক্‌টিম্ হতে আমি রাজি নই; তথা এ পলিসির হিস্যেদার হতেও আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। তাই যখন প্রকাশক তারাপুরওলা আমাকে নিকল্‌সের বইয়ের তুখোড় উত্তর লেখবার জন্য মোটা টাকা অফার করেছিল আমি রাজি হইনি।

তুমি লিখেছিলে 'এবং যদি বা লেখার মধ্যে 'সার' কিছু থাকে তা হলেও সাহিত্যে নোংরা মিডিয়মের প্রয়োজনীয়তা কী? সার্থকতা কী?'

"ওইখানেই তো মামীর ব্যামো" গল্পটা জানো কি? মারাত্মক অশ্লীল but with a point, তবু লিখলুম না।

তা হলে যে কার্যসিদ্ধি হয় না।

এ সুবাদে বলি :

সন্তোষ ঘোষকে একদা আমরা প্রায়-শিষ্যরূপে কাছে পেয়েছিলুম। সেই সময় সে একটা বীভৎস তথা অশ্লীল গল্প লেখে। আমি 'অবিশ্বাস্য' শুদ্ধমাত্র ওর এবং ওই সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনরূপে লিখি। ওতে খুন ব্যভিচার তাবৎ বাৎ আছে— শুধু বোধহয় bestiality নেই। কিন্তু মিডিয়মটি পশ্য।

আশীর্বাদ জেনো

সৈ. মু. আ

১. তারই বর্ণনা

www.pathagar.com

টেলিফোন : ৪৮-৩৫৯১
৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫

ডা. শ্রীযুক্ত সৈয়দ মুজতবা আলী
শান্তিনিকেতন
প্রীতিভাজনেষু

আপনার ১৪।১-এর চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। আগামী ১৮ মার্চ আমার ৮০-তম জন্মদিন। আপনার শুভেচ্ছা ২ মাস আগে পেয়েছি তা ভালোই, কারণ এর মধ্যে কী ঘটে বলা যায় না।

দৃষ্টি অতি ক্ষীণ, সেজন্যে পড়া খুব কমাতে হয়েছে, কিন্তু আপনার রচনা পেলে চক্ষুপীড়ন করেও পড়ি। আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিচিত্র ভাষায় আপনি আরও লিখুন, এই প্রার্থনা করি।

আমার বয়স এমন ভয়ঙ্কররূপে বেড়ে যাচ্ছে তা সবসময় মনে থাকে না। শতায়ু হবার ইচ্ছা নেই। অন্ধ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকা জীবন্ত নরকভোগ। এর আগেই যাতে নিষ্কৃতি পাই সেই শুভেচ্ছা করুন।

আপনার একান্ত অনুরক্ত
রাজশেখর বসু

এটাই— যতদূর মনে পড়ছে— সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠি।

তবে আগের আরও কিছু ছিল। হারিয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে একটাই বিশেষ করে মনে আছে, পুরস্কারের 'ভূষণ পাল' গল্প সম্বন্ধে লিখেছিলেন, '... আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর লেখা সমস্ত গল্পের মধ্যে এই একটিই, এবং একমাত্র একটিই করুণ রসের গল্প কী করে ছিটকে বেরোল। ও রস তিনি আর কখনও আনেননি।...'

মুজতবা আলীর জীবনের শেষ ৭।৮ বছর আর আমার সঙ্গে কোনও পত্রালাপ বা দেখা হয়নি। কী করে যে— কোনও ঝগড়া না করেও— এতদিনের অন্তরঙ্গতা হারিয়ে গেল... এটাই বোধহয় জাগ্রত বাস্তব।

॥ দীপংকর বসু ॥

রাজশেখর বসুকে লেখা

১

শান্তিনিকেতন,
৪।১।৫৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জন্মদিনে আপনাকে আমার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। আপনি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদের আনন্দ বর্ধন করুন। আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, আপনি শতায়ু হোন, সহস্রায়ু হোন।

গুণমুগ্ধ
সৈয়দ মুজতবা আলী

[এই পত্রটি সৈয়দ মুজতবা আলী রাজশেখর বসুকে লেখেন। পরের পত্রটি রাজশেখর বসুর উত্তর। এই দুটিও শ্রীযুক্ত দীপংকর বসুর সৌজন্যে পাওয়া গেছে।]

www.pathagar.com

২

শান্তিনিকেতন,
১২।১।৬০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন, শুনে শঙ্কিত হলুম, আপনি অসুস্থ। তবু 'বসুধারা' পত্রিকায় যখন আপনার লেখা বেরুচ্ছে তখন বিবেচনা করি, আপনার বাড়ির অগণিত[১] বাচ্চা-কাচ্চাদের কেউ না কেউ হয়তো আপনাকে এ চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারে। একদা আপনারই আদেশ অনুযায়ী এদের গল্প শুনিয়েছিলুম— এ উপকারটা করে দিতে তারা হয়তো নারাজ হবে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মনে আরেকটা শঙ্কার উদয় হল। তুলনা দিয়ে নিবেদন করি। রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই 'সেবা' করতে চাইতেন। ইয়া ধুমসো কামারের মতো কঠিন হাত দিয়ে হঠাৎ তাঁর পা টিপতে আরম্ভ করতেন— যে পদযুগল ইন্দুমতীদের করস্পর্শ ছাড়া অন্য কোনও উৎ'পীড়ন' কখনও সয়নি। কবি নাকি তখন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সয়ে যেতেন— সঙ্কোচবশত কিছু বলতে পারতেন না। আমার ভয় হচ্ছে, আমার চিঠি হয়তো সেইরকম বেদনাই দেবে। বিশেষত আমার ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনার কানকে পীড়া যখন দেবে তখন সেই পুরনো 'বাধতি' 'বাধতে' আবার মামদো হয়ে দেখা দেবে। ('মামদো' কথাটা আপনার অভিধানে পেলুম না— শুনেছি, কথাটা 'মুহম্মদ' 'মুহম্মদী' থেকে এসেছে, অর্থাৎ খাস মুসলমানি ভূত)। অথচ আমি ভাবছি রোগশয্যায় চিঠি পেতে অনেকেই ভালোবাসেন। আপনিও হয়তো অপছন্দ করবেন না।

আমি কোনও স্বার্থ নিয়ে এ চিঠি লিখছি না। খল্বিদং, বিরিঞ্চি বাবাদের আশীর্বাদ না থাকা সত্ত্বেও আমার অভাব-অনটন বিশেষ নেই। এমনকি কবি হাইনের মতো আমার নিম্নলিখিত প্রার্থনাও নেই— O, God, you know, I am a Poet and have few needs indeed. All I want is a cottage and home-made bread and butter. Being a Poet, however, I should love to have a row of poplar trees in front of my cottage so that I may look at the trees and derive inspiration from them, and shouldst thou, O Lord, in the glory, want to make may happiness complete so that my cup runneth over, I should, like some of my enemies to be hanged to their loftiest branches, so that I could look at their dangline legs and contemplate over the glory! Of course Christ has ordered us to forgive our enemies and I shall, in the fulness of my heart, certainly forgive them— but only after they are hanged! (এ স্থলে বলা আবশ্যক মনে করি যে বেচারা হাইনে বহুদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অযথা প্রচারিত নিন্দাবাদ চুপ করে শুনেছিলেন; শেষটায় যখন তাঁর জাত তুলে, অর্থাৎ তাঁর ইহুদিত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ হল

১. দাদুকে লেখা এই চিঠিটা পড়েই সৈয়দ মুজতবা আলীকে প্রথম চিঠি লিখি। (তাতে অবশ্য জানিয়েছিলুম 'অগণিত কাচ্চাবাচ্চার' মধ্যে আমিই বাড়িতে একলা। বাকি সব রবাহূত।)
পত্রপাঠ দু পাতার উত্তর পেয়েছিলুম— আমার চিঠির '১' নং দ্রঃ। তারপর ছ বছর ধরে পত্রালাপ। অবশ্য তার ফাঁকে অসংখ্যবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখি বসে কথাও হয়েছে।

www.pathagar.com

তখন তিনি অস্ত্রধারণ করলেন এবং যে কী অস্ত্র! হাইনে নিজেই জানতেন না তিনি এরকম ব্যঙ্গ— satire লিখবার ক্ষমতা ধরেন এবং গোড়ার দিকে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতো মোলায়েম প্রেমের কবিতা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকই লিখেছেন। তাঁর মায়ের উদ্দেশে লেখা কবিতাগুলো যে কী সুন্দর সে মূলে না পড়লে বোঝা যায় না। এই যে আমরা professional 'মা মা' করনেওলা বাঙালি, আমরাও এরকম কবিতা লিখতে পারিনি— ইয়োরোপীয়রা তো পারেইনি। ইয়োরোপে মা-এর প্রতি ভালোবাসা বিরল— অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছে। হাইনে আসলে oriental— ইহুদি।)

আপনি আমার লেখা পড়বেন এ আশা আমি করিনে, আবার, আমার একটি লেখাও আপনার সামনে পড়ছে না এটা ভাবতেও ভালো লাগে না। আপনি মুরুব্বির মতো আছেন, হয়তো কখনও হুঙ্কার[২] দিয়ে বললেন, 'মুজতবা আলীর কোনও বইটই বেরুল? কেউ এক পাতা পড়ে শোনাতে না শোনাতেই আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন,— এই বা মন্দ কী? আমি জানি, আমি আপনার জন্য লিখি না। আমি লিখি টাঙা-ওলা বিড়িওলাদের জন্য— অন্তত আমার ইচ্ছে, আমি যেন এমন সরল করে লিখতে পারি যে তারা আমার লেখা বুঝতে পারে। তা কিন্তু হয়ে উঠবে না। আপনি এত সরল সহজ লেখেন যে তার অর্থ বের করা এবং রসগ্রহণ কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়, তবু প্রত্যয় যাবেন না, আমার একজন সমঝদার বন্ধু জনৈক বাঙলাতে এম.এ. পাস যুবককে আপনার লেখা বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ালেন। আপনার আর সুকুমার রায়ের একই অবস্থা। এ tragedy কেন হয় আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আপনি কি চিন্তা করেছেন? আমি সূক্ষ্ম কাজের কথা ভাবছিনে— জোয়ান জিল্টার বা বিলাতের সায়েবের[৩] কেন কোল্ড্ হ্যাম্— নাম হয়, এসব নয় মাথার উপর দিয়ে গেল কিন্তু অন্যান্য জিনিস? 'আপনার 'কৃষ্ণকলির'[৪] ভবতোষ ঠাকুর কেন উড়লেন না, সে বাবদে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ল। এমিল জোলার নাম যখন ফ্রান্সের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তখন রুচিবাগীশ তাঁর কয়েকজন বন্ধু অনুরোধ করলেন একখানা clean বই লেখার জন্য। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যেটি 'নির্ভয়ে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায়।' জোলা লিখলেন। আনাতোল ফ্রাঁস তার সমালোচনা লিখতে গিয়ে বললেন, 'জোলা শূয়রের মতো কাদা-ময়লার ভিতর চমৎকার wallow করতে পারেন। ফিরিস্তার মতো উড়তে গেলে শূয়রের যে হাস্যকর অবস্থা হয় এই clean বইয়েতে জোলার তাই হয়েছে। We prefer to see Zola wallow in the dirt.'

এই গুরুবাদের ব্যাপারে আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছি। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত আমি যা-ই শিখতে যাই না কেন, গুরুর চেষ্টা থাকে, কত শীঘ্র আমাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পারেন, অর্থাৎ নিজেকে useless করে তুলতে পারেন, আমাকে বলতে পারেন, 'বৎস, এইবারে তুমি চরে খাও।' শুধু ধর্মের গুরু একেবারে 'মাথার রতন ন্যাপ্টে থাকেন

---

২. এখানটায় একটু বেশি আলঙ্কারিক প্রয়োগ হয়ে গেছে। দাদু কখনও 'হুঙ্কার' দিয়ে কথা বলেননি। অন্য কাউকে কখনও কিছু পড়ে শোনাতেও বলেননি। নিজেই পড়তেন। এবং পড়তে পড়তে ঘুম কল্পনাতীত।

৩. পুরশুরামের 'স্বয়ম্বরা' ও 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের দুটি চরিত্র।

৪. 'কৃষ্ণকলি' গ্রন্থের 'ভবতোষ ঠাকুর' গল্পের শেষ লাইন : '... সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের একটা লেখায় পড়েছি— পীর কখনও ওড়েন না, তাঁর চেলারাই তাঁকে ওড়ান।...' এটা পড়েই এই বিস্তীর্ণ 'আলোচনা।

www.pathagar.com

আঠার মতন।' সেই কোথায় গৌহাটি থেকে শিষ্য গুরুকে চিঠি লিখবেন পিণ্ড-দাদন-খানে এটাতে কী করব, ওটার কী হবে? আর গুরুও শেষ দিন পর্যন্ত উপদেশ-হুকুম ঝাড়তে থাকেন। তাই বোধহয় দক্ষিণের রমন মহর্ষি কোনও শিষ্য নিতেন না, পারতপক্ষে কাউকে কোনও উপদেশ দিতেন না, হুকুম তো শিকেয়। তাঁর চতুর্দিকে যে আশ্রম গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে যে-সব কর্ম-কীর্তি হত তা দেখে ভদ্রলোক মর্মাহত হতেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। আশ্রম থেকে পালিয়ে গিয়ে যেখানেই যান না কেন, সেখানে গড়ে উঠবে বিরাটতম আশ্রম, সেখানে exploitation হবে নিদারুণতর। ওদিকে তিনি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। গভীর অরণ্যে একা থাকা অসম্ভব। এবং মানুষকে বিপদ-আপদে সাহায্য করার প্রবৃত্তিটিও তাঁর বিলক্ষণ ছিল। আরেকজন লোক দেখেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাকে বলে ঋষিতুল্য। Learning, Wisdom, Art,— এর কী অদ্ভুত সমন্বয় এবং সর্বোপরি আচার-ব্যবহারে শিশুটির মতো কী সরলতা। তাঁর কপাল ভালো। রবির দিকে সকলের দৃষ্টি— তাঁকে অল্প লোকেই লক্ষ করত। তাঁকে গুরু হতে বললে তিনি হয়তো ঠা ঠা করে হেসে উঠতেন। (তাঁর হাসি হেসেখেলে ফার্লঙ খানিক ডিঙোতে পারত)। গাঁধী-ব্রজেন্দ্র শীল এঁকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। শুনেছি, কে নাকি একবার বক্রোক্তি করে অরবিন্দ ঘোষকে শুধিয়েছিল, 'ব্রাহ্মসমাজের কেউ কি ভগবানকে পেয়েছেন' And Pat came the reply, why? To begin with Dwijendranath Tagore? অবশ্য ভগবানকে পাওয়া-না-পাওয়া দূরের কথা। গর্কি যা বলেছিলেন তাই যথেষ্ট। টলস্টয়ের সঙ্গে একদিন দীর্ঘ আলাপচারির পর গর্কি লিখেছিলেন, And looking at him I, who am an atheist, said to myself, "This man is God-like!"

আপনাকে আর বিরক্ত করব না।[৫] আপনার কাছ থেকে চিঠির উত্তরও প্রত্যাশা করি না। আপনার কাছ থেকে আমার একটি মধ্যাহ্ন কিংবা নিশিভোজন পাওনা আছে। এবারে কলকাতায় এসে সেটি ছাড়ব না। ২৪ ঘণ্টা আগেই কী কী খাব, তা জানিয়ে দেব। এবং এ কথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করিনে যে খাওয়ার ব্যাপারে— আমার এক ভাগ্নীর ভাষায়— 'মামুর শুধু মুখে মুখেই হাইজাম্প লঙজাম্প'। তবে আমি পাতিপুরের রাজাবাহাদুরের[৬] মতো পাতিনেবু দিয়ে বার্লিও খাইনে। যদিও এই পোড়ার শান্তিনিকেতনে আমার সাতিশয় প্রিয় কইমাছ আদপেই পাওয়া যায় না। কলকাতায়ও এত মাগ্যি যে এ জমানার মেয়েরা ও-জিনিসটে রান্না করার সুযোগও পায়নি। এখন দু মুঠো অন্ন ভালো করে খেতে হলে ঢাকা যেতে হয়। সেখানে এখনও সবকিছু পাওয়া যায়। নবাব-বাড়ির কল্যাণে রান্নার standardও উঁচু— কি হিন্দু কি মুসলমান, উভয় হেঁসেলেই। ভালো ভালো কবরেজও সেখানে আছে। শুধু বাছাই বাছাই পথ্যি করিয়ে বিস্তর ব্যামো সারিয়ে দেয়। আপনার সেই ভাইজী দুর্গাদেবী[৭] তো আমাকে তাঁর কোনও লেখার খবর দিলেন না? আপনি শীঘ্র সেরে উঠুন এই প্রার্থনা করি।

গুণমুগ্ধ
সৈয়দ মুজতবা আলী

---

৫. চিঠির উত্তর কিন্তু পেয়েছিলেন। কপি নেই। আর আমি লিখেছিলুম 'আজই কইমাছ এসেছে।' তার পর অনেকদিন ধরে এসে খাওয়ার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোনও দিনই হয়নি।

৬. পরশুরামের 'রাজভোগ' গল্প থেকে উদ্ধৃতি।

৭. গিরীন্দ্রশেখর-কন্যা দুর্গাবতী ঘোষ।

www.pathagar.com

৩

শান্তিনিকেতন
১৫।৩।৬০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার জন্মদিনে আমার মনে কী আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে বলার মতো ভাষা আমার নেই। আমার অজানা নেই যে আপনার শরীর সুস্থ নয় এবং এই জন্মদিন আপনার কাছে অল্প আনন্দই বহন করে আনছে, কিন্তু আপনি যিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমাদের আনন্দ দিয়ে আসছেন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আপনি যে আমাদের মাঝখানে আছেন তাতেই আমাদের গভীর আনন্দ। আমরা স্বার্থপরের মতো কথা বলছি, একথা সত্য। কিন্তু আমি স্বার্থপরতায় বিশ্বাসী। 'দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কর', 'সমাজের জন্য স্বার্থপরতা ছাড়' এসব বড় বুলি আমার কখনও ভালো লাগেনি। আমি বরঞ্চ বলেছি, 'একটুখানি স্বার্থপর হও, তা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগবে, ফলে দেশের কমপিটেন্‌স্‌ বেড়ে যাবে।' আপনাকে বলছি এই যে চূর্ণ-বিচূর্ণ জর্মনি পাঁচ বছরের ভিতর ফের আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল, পনেরো বছরের পর এক আমেরিকা ছাড়া সবাইকে টাকা ধার দিতে চায় ('কুলোকে' বলে ফ্রান্সের এটম বমের রেস্ত যুগিয়েছে জর্মনি!), সে তো 'আত্মত্যাগ' 'স্বার্থত্যাগের' বুলি একবারও কপচায়নি। এ বিষয় দীর্ঘ লেকচার শোনার মতো আপনার মনের অবস্থা নয় কিন্তু ভবিষ্যতে যখন দেখা হবে তখন আমার কথাটা যে ঠিক সেই আমি উত্তম উত্তম ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করে দেব। ধর্মগ্রন্থ এই কারণে বললুম, সচরাচর লোকের বিশ্বাস ধর্ম বুঝি বেপরোয়া স্বার্থত্যাগ করতে উপদেশ দেয়, দ্বিতীয়ত আমার জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে— তবে আপনাকে ভরসা দিচ্ছি, ধর্ম আচরণ করে নয়।

আমি জানি এ-সব প্রগল্‌ভতা। কিন্তু আপনিই বিবেচনা করে বলুন, আপনার মতো গুণী লোকের সামনে না করে কার সামনে করব? অন্যে ভুল বুঝবে, নিন্দা করবে। আপনি সস্নেহে মাফ করে দেবেন। তুলসীও বলেছেন, 'শিশুর আধো-আধো বুলি বাপ-মা গদ্‌গদ হয়ে শোনে। ক্রূর কুটিল কুবিচারী কিন্তু হাসে।'

"জো বালক কহে তোতরী বাতা
শুনত মুহিত নেন দিনু অছ মাতা
হাসি হাসে ক্রূর কুটিল কুবিচারী
জে পরফুল মুখশধারী—"

www.pathagar.com

তাই নিতান্ত স্বার্থপরের মতো বলছি, আপনি শতায়ু হন, সহস্রায়ু হন। আমাদের অক্ষম লেখার 'তোতরী বাতা' একমাত্র আপনিই 'মুদিত নয়নে' প্রসন্ন বয়ানে আশীর্বাদ করতে পারেন।

গুণমুগ্ধ বশংবদ
সৈয়দ মুজতবা আলী

এটাই রাজশেখর বসুকে লেখা মুজতবা আলীর শেষ চিঠি। উত্তর বোধহয় পাননি— কারণ তাহলে চিঠির ওপর 'উঃ...' লেখা থাকত।

এর মাসখানেক পরে রাজশেখরের মৃত্যু হয় (২৭-৪-১৯৬০)।

www.pathagar.com

সংযোজন— অপ্রকাশিত গল্প

নেড়ে

পুজোর ছুটির পর কল্‌কাতায় ফিরছিলুম। চাঁদপুর স্টেশনে আসবার একটু আগেই জিনিসপত্র গোছাতে লাগলুম। সঙ্গে ছিল শুধু একটি বেতের বাক্স আর সতরঞ্চি জড়ান বিছানা। যাদের সচল অচল অনেক লাটবহর থাকে, তাদের ট্রেন ছেড়ে জাহাজে উঠতে দেরি হয়। কাজেই আমার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তি মাত্রেই ছুটে গিয়ে জাহাজ দখল করে বসে। এ অবশ্য আমি গান্ধি-ক্লাসের যাত্রীদের কথা বলছি।

চাঁদপুরে গাড়ি থাম্‌ল। তাড়াতাড়ি নেবে পড়লুম। কুলি না ডেকে মোট ঘাড়ে করে ছুটে চললুম। বিস্তর যুদ্ধের পর জাহাজে উঠলুম। ভেবেছিলুম বেশ খালি পাব; কিন্তু দেখলুম পৃথিবীতে একমাত্র হুঁশিয়ার লোক আমিই নই। অনেকেই আমার ঢের আগে এসে ভালো জায়গাগুলো দখল করে বসে আছেন। আরও দেখলুম আমার অপেক্ষাও অল্প লাটবহর বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান। তাদের সম্পত্তির মধ্যে একখানা খবরের কাগজ— খানা বিছিয়ে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

থাক্, অনুতাপ করে লাভ নেই। বেশ কসরত করে সিঁড়ির পাশে জায়গা দখল করে বিছানা বিছিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। তার পর জামার বোতাম খুলে, ডান পা-খানা সোজা করে, বাঁ পা তার উপর তুলে নাচাতে শুরু করে বিজয়গর্বে চারিদিকে তাকাতে লাগলুম। হঠাৎ মনে হল ব্যূহ তো তৈরি করা হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে বিছানার একপাশে জুতা আর একপাশে বাক্স ও মাথার দিক্‌টা রেলিংয়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলুম। এইবার ঠিক হল। আর কোনও সামন্ত-যাত্রী-রাজা আক্রমণ করতে পারবেন না। চৌহদ্দি ঠিক করে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ে বিজয়গর্বে আবার ঠেঙ নাচাতে শুরু করলুম। চারিদিকে তখন হৈ হৈ কাণ্ড। জায়গা দখল নিয়ে ঝগড়া, কুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। নানা প্রকারের চিৎকারে চারিদিক তখন বেশ সরগরম।

জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে— ভাবলুম যাক একটু কবিত্ব করা যাক্— অম্‌নি।

"হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা—

বাকিটা আর আওড়ানো হল না। দেখি একটা ভদ্রলোক মরিয়া হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠ্‌তে চেষ্টা কর্ছেন। পেছনে তাঁর আবরু-অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী— কিছুতেই তাল সামলে তাঁর সঙ্গে চল্‌তে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোকের সে-দিকে দৃষ্টি নেই।

www.pathagar.com

"এগিয়ে চলার" আনন্দে তিনি তখন মশগুল। আনন্দ বললুম বটে— কিন্তু থাড্ডো কেলাসের যাত্রী মাত্রেরই এ আনন্দের ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

যাক্। শেষ পর্যন্ত তিনি উপরে উঠলেনই। বাঙালির ধৈর্য নেই, যুদ্ধ করতে পারে না— একথা ডাহা মিথ্যে। সেই ভদ্রলোককে দেখলে উপরোক্ত কুসংস্কার কারুরই থাক্‌বে না। উপরে উঠেই তিনি চারিদিকে তাকাতে লাগলেন।

কিন্তু—

"স্থান নেই স্থান নেই ক্ষুদ্র সে তরী
মেড়ো, খোট্টা, বাঙালিতে সব গেছে ভরি।"

ততক্ষণে তাঁর স্ত্রী এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বাবু তখন পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন। বুঝতে পারলুম 'কুলি চম্পট'— বললুম "কী মশাই, কী হয়েছে"?

ভদ্রলোকটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "কুলি— কুলি, কোথায় গেল, এই—"

আমি বললুম, "নম্বর মনে আছে?"

আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ, তাই তো, কুলি কোথায় গেল— বাক্স-টাক্স সব নিয়ে— গয়নার বাক্স— হায় হায়।"

গয়নার বাক্স'র কথা মনে হতেই তার শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠল, আমি বিরক্ত হয়ে বললুম,— "নম্বর কত ছাই বলুন না?"

'এ্যাঁ, তাই তো নম্বর, হ্যাঁ নম্বর! নম্বর এই— তাই তো! ভুলে গিয়েছি।"

'বেশ কোরেছেন!" এইবার তাঁর স্ত্রীর গলা থেকে গড়গড় কোরে একটা আওয়াজ বেরুল। কিন্তু, সেটা কি কোনও ভাষা না শুধু আওয়াজ মাত্র তো বোঝা গেল না।

ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি সেই দিকে ঝুঁকে বললেন।

"কী, কী, মনে আছে?"

আবার একটু গড়গড়। তার পর শুনতে পেলুম" "এগারো।"

আমি আর অপেক্ষা না করে একপাটি জুতো পায়ে ঢুকিয়ে অন্যটা ঢুকাতে ঢুকাতে ছুটে চললুম। ফিতে বাঁধা ছিল না বলে ডান পায়ের জুতোর নিচে ফিতে আট্‌কে যাওয়ায় দড়াম করে সিঁড়ির উপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়লুম। জুতোর ওপর ভীষণ চটে গেলুম। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিলুম "পরোপকার কি বিনা মেহনতে হয়।" যা হোক আবার উঠে ভিড় ঠেলে "গ্যার্‌হ নম্বর" কুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চললুম। কিন্তু কোথায় "গ্যার্‌হ নম্বর কুলি"। প্রত্যেক কুলির নম্বর যদি খুঁজতে যাই তবে সে কাজটি আর সেদিন শেষ হবে না। কাজেই শুধু চেঁচিয়ে চললুম।

নদীর পারে উঠে চেঁচাতেই কুলি বললে— "ক্যা বাবু। ক্যোঁও চিল্লাতে হো?" আমি বললুম "তুমি গ্যার্‌হ নম্বর কুলি?" সে বলল, "হ্যাঁ, ক্যা চাইতে হো?"

আমি বললুম,— জলদি চলো— বাবুকা মাল লেকর ক্যোঁও ইতনা দেরি করতা হ্যায়?"

সে বলল, "ক্যা চিল্লাতে হো, মেরা পাস্ তো ইন্ সাহেবকা মাল হ্যায়। বাবুকা মাল্ ওঁহা রাখ ছোড়া।" দেখলুম আগে একটি সাহেব যাচ্ছে। আর বাবুর বাক্স নদীর পারে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমি বললুম, "চলো য়্যহ মাল লেকর— জেয়াদা পয়সা দেগা।"

কুলি কোনও কথা না বলে চলে গেল। ভারি মুশকিলে পড়লুম, কী করা যায়? পাশে কোনও কুলিও নেই। জাহাজও তখন ছাড়বার জন্য ফোঁস ফোঁস কোরছে। কী আর করি!

www.pathagar.com

নিজেই বিছানা ট্রাঙ্ক ঘাড়ে ও গয়নার বাক্স হাতে করে চললুম। খানিকটা যেতেই ঘাড় টন্‌টন্ কোরতে লাগল। মনে হল কেন এই কুবুদ্ধি চেপেছিল।

সিঁড়ির সামনে আসতেই বাবু তাড়াতাড়ি বাক্স ধরে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, করেন কী। আপনি কেন কষ্ট কোরছেন? কুলি বেটারা— আমি এক্ষুনি স্টেশনমাস্টারের কাছে যাচ্ছি। পাজি ব্যাটারা মাল নিয়ে শেষকালে ফেলে দেয়! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, বলে তক্ষুনি ঝুপ করে আমার বিছানায় বসে পড়লেন। আমি শুধু— "না, না" বলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি ততক্ষণে ভদ্রলোক তাঁর গিন্নি সমেত আমার বিছানায় জাঁকিয়ে বসেছেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, "বসুন, বসুন।"

এই তো একটুক্ষণ থাকতে হবে, কোনও রকমে চলে যাবে। বিছানার একপাশে বসে পড়লুম।

বাবুটি বললেন— "কোথায় যাওয়া হবে।"

"কোলকাতা।"

"সেখানে পড়েন বুঝি?"

প্রশ্ন এড়াবার জন্য শুধু মাথা নাড়লুম। তাতে হ্যাঁ-না দুই-ই বোঝাল। বাবু বললেন— না, আমার একটি ভাইপোও কলকাতায় পড়ে। ছেলেমানুষ— গেল বছর মেট্রিক পাস্ করে গিয়েছে। পড়াশুনায় বেশ ভালো। আপনার বাবা কী করেন?

"চাকরি।"

"বেশ বেশ। আমিও সরকারি চাকরি করি। মাইনে নেহাত কম। কোনও রকম কায়-ক্লেশে চলে যায়। আমার যে ভাইপোটির কথা বললুম তার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ছ শো টাকা পায়। তার বিয়ে হয়েছে ফেনীতে। তার শ্বশুর... ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা জ্বালায় পড়লুম! কী করা যায়! ফেরিওলা যাচ্ছিল। একটা কাগজ নিয়ে মুখ ঢেকে পড়তে লাগলুম।

বাবু বোললেন— "কী পড়ছেন?" আমি শুধু মাথা নাড়লুম।

তিনি বললেন "আনন্দবাজার?" বলেই— "দেখি কাগজখানা।" ভাবলুম— বাঁচা গেল। বাবু কাগজ পড়বেন। কিন্তু ভদ্রলোক প্রথম লাইন চেঁচিয়ে পড়েই আবার বক্তৃতা জুড়ে দিলেন।

"জগৎগুরু মহাত্মা গান্ধীর কারাবাস— আজ ২২৫ দিন। তাঁহার বিদায়বাণী, খদ্দর পরিধান— ছুঁৎমার্গ পরিহার।"

দেখলেন মশাই, দেখলেন। এই দুটো জিনিস বলে গেছেন— তাও হতভাগা দেশে কেউ কোরবে না। খদ্দর পরলে কী দোষ রে বাবা! টেকেও তো বেশি; দামও কম।

আমাকে তাঁর কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জিত হয়ে বললেন, "কী কোরব! ছাপোষা মানুষ। খদ্দর কিনে কুলিয়ে উঠতে পারিনে, আবার অফিসের সাহেব দেখলে চটে। বেটা যেন কসাই। সে কথা যাক্। কিন্তু আমি ছোঁয়াছুঁয়ি মানিনে। ওতে তো আর কোনও খরচ নেই। কেনই বা মানব? কেন মুচি-মুসলমান কি মানুষ নয়? ওদের সঙ্গে বসে কেন খাব না? খুব খাব— আলবৎ খাব।"

তার পর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন— "তা হলে জলখাবার—"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাক্স খুলতে লাগলেন। ততক্ষণ তাঁর ঘোমটা প্রায়ই আড়াই ইঞ্চি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। একখানা প্লেটে হাঁড়ি থেকে বের করে সন্দেশ রাখতে লাগলেন। আমি তখন উঠবার

www.pathagar.com

বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছি। বাবু তা দেখে বললেন, "বসুন, বসুন, জলখাবারটা এখানেই সেরে নিন।"

আমি মাথা চুলকাতে লাগলুম। তিনি থালাখানি গিন্নির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার দিকে একটু এগিয়ে 'খান' বলে টপ্ করে একটি রসগোল্লা আমার মুখে ফেললেন। আমিও আস্তে আস্তে খেতে লাগলুম। তিনি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ হলে বললেন, "আমাদের তো এসে পড়ল— নেক্সট্ স্টেশন— তারপাশা। আপনার তো কোল্‌কাতা পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে— তা আপনি কোথায় উঠবেন? সোজা মেসে যাবেন বুঝি?"

আমি "হুঁ" বলে উঠে পড়লুম। প্রতিজ্ঞা করলুম তারপাশা স্টেশনে না আসা পর্যন্ত আর ও-মুখো হবো না।

দূর থেকে দেখলুম বাবু গিন্নির সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তারপাশা দূরে দেখা গেল। ভাবলুম এইবার বাবুর খোঁজ নিই। গিয়ে দেখি তিনি তখন কাগজ পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন— "এই যে তারপাশা।" তার পর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'ওগো' সব গুছিয়ে নাও।"

জাহাজ থামল। তিনি পারের দিকে আধঘণ্টা ধরে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটি লোককে দেখে— যুগপৎ হাত-পা নেড়ে চেঁচাতে শুরু করলেন। লোকটি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বাবু দুই হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুলি ডেকে মালগুলো তুলে দিয়ে আমিও সঙ্গে সঙ্গে নাবলুম। পারের লোকটি তখন জাহাজে উঠেছে। বাবুটি পারে নাবতে যাবেন এমন সময় ফিরে বললেন— "চিঠিপত্র লিখ্‌বেন— আপনার ঠিকানা?— তাই তো নামই জানা হল না। "আপনার নাম?"

"আব্‌দুল রসুল।"

থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন— "কী?"

"আব্‌দুল রসুল।"

"তুমি মুসলমান?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, কেন?"

ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "কেন?"— কেন জাতটা মারলে? খাবার সময় বললে না কেন তুমি মুসলমান? উল্লুক!"

আমি অবাক্ হয়ে বললুম, "আপনি যে বললেন, জাত মানেন না!"

তিনি তেড়ে এসে আমার নাকের কাছে হাত নেড়ে বললেন, "মানিনে, খুব মানি। আলবৎ মানি। সাত পুরুষ মেনে এসেছেন আর আমি মানিনে। আবার প্রাচ্চিত্তির ফেরে ফেললে! হতভাগা— নেড়ে!"

www.pathagar.com

॥ পরিশিষ্ট ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর বংশপরিচয় ও তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জি

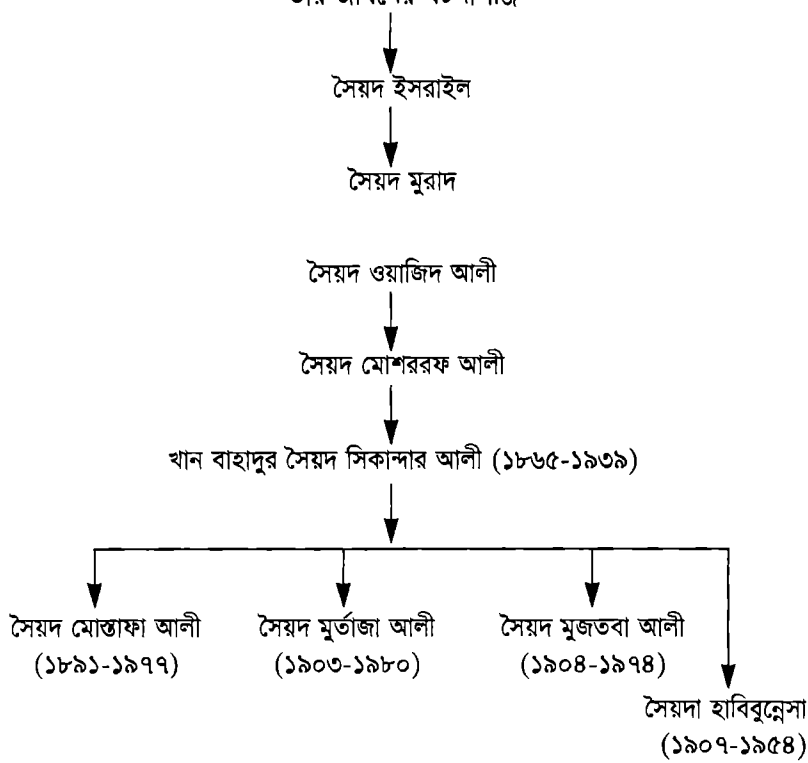

মুজতবা আলীর মাতা— আয়তুল মান্নান খাতুন। (১৮৭৯-১৯৪২) ছিলেন বাহাদুরপুর পরগণার রাগ প্রচণ্ড খাঁ গ্রামের জমিদার মোহ্‌সেন চৌধুরীর কন্যা।

১৯০৪— ১৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন (সূর্যাস্তে), করিমগঞ্জ শহরে মুজতবা আলীর জন্ম।

১৯০৮— সুনামগঞ্জ শহরের পাঠশালাতে ভর্তি।

১৯১৫— মৌলবীবাজার সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি।

১৯১৮— সিলেট সরকারি হাইস্কুলে ক্লাস VI-এ ভর্তি।

১৯২১— শান্তিনিকেতন যাত্রা।

১৯২১-১৯২৬— বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন।

www.pathagar.com

১৯২৭— আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

১৯২৭-১৯২৯— কাবুলে অধ্যাপনা।

১৯২৯-১৯৩২— বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। মাঝখানে ১৯৩০— প্যারিস ও লন্ডনে অধ্যয়ন।

১৯৩৩-১৯৩৪— কলিকাতায় ও মৌলবীবাজারে পিতামাতার সঙ্গে বসবাস।

১৯৩৪— দশ মাস ইউরোপ ভ্রমণ করেন, প্রথম চার মাস জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় অবস্থান। পরবর্তী ছয় মাস ডেসড্রেন, ভেনিস, লজান, মন্ত্রো, লুৎসেন, ইন্টার লেকেন, জুরিখ ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ।

১৯৩৪-১৯৩৫— কায়রোয় আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

১৯৩৬— তাঁর থিসিস— The origin of the Khojalis and their religious life today— ২০০ পৃষ্ঠার এই থিসিস গ্রন্থটি জার্মানি থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি তিনি পিতাকে উৎসর্গ করেন। এই গবেষণা কাজে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন ড. সি. ক্লিমেন।

১৯৩৮— ১৯৪৪— বরোদায় অধ্যাপনা।

১৯৩৮— ইউরোপ ভ্রমণ প্রধানত জার্মানিতে। এ ছাড়া ভেনিস, মিলান, জেনোয়া, জেনেভা, লেজা, বন, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হ্যানোভার, বার্লিন ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ।

১৯৩৯— সিলেট গমন। এইবারেই পিতার সঙ্গে শেষ দেখা হয়।

১৯৪৪— বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে বহুদিন কলকাতায় ৫নং পার্ল রোডের বাড়িতে বন্ধু আবু সায়ীদ আইউবের সঙ্গে বাস করেন। পরে বন্ধুর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের মদনাপল্লীতে যান। এই সময়েই মুজতবা আলী বাঙ্গালোরে রমন মহর্ষির অরুণাচল আশ্রমে আনাগোনা করেন। বাঙ্গালোরে থাকাকালেই তিনি 'দেশে-বিদেশে' লেখা শুরু করেন। ১৯৪৮-এর মার্চ মাস থেকে 'দেশ' পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়।

১৯৪৯— বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ হন।

১৯৫০— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন।

১৯৫১— ১১ মার্চ ঢাকা শহরে রাবেয়া আলীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯৫০-১৯৫২— দিল্লিতে Secretary Indian Council For Cultural Relations সাকায়তুল হিন্দ্ (ভারতীয় সংস্কৃতি) নামক একটি আরবি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯৫২-১৯৫৪— দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন।

১৯৫৪-১৯৫৫— A I R কটকের স্টেশন ডাইরেক্টর হন।

১৯৫৫-১৯৫৬— A I R পাটনার স্টেশন ডাইরেক্টর হন।

১৯৫৬-১৯৬৪— বিশ্বভারতীতে প্রথমে জার্মান ও পরে ইসলামি সংস্কৃতির অধ্যাপক হন।

১৯৫৮— ইংল্যান্ড ভ্রমণ। B. B. C-তে ভাষণ।

১৯৬২— জার্মানি ভ্রমণ।

১৯৬৪-৬৭— বোলপুরে বাস করেন।

১৯৬৭-৭২— কলকাতায় বাস করেন। কলিকাতায় বসবাস করার সময়ই ১৯৭০ সালে শেষবারের মতো জার্মানি ভ্রমণ করেন।

১৯৭২— ১৫ জানুয়ারি বহুদিন পর ঢাকা যান।

১৯৭৩— ২১ অক্টোবর কলকাতায় আগমন ও পরে ডিসেম্বরে ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

১৯৭৪— ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যু। মৃত্যুর সময় দুই পুত্র ও স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।*

---

* সমগ্র রচনাটি সৈয়দ মুর্তাজা আলীর রচনা হইতে সংগৃহীত।

www.pathagar.com